ডঃ অতুল সুর

# ৩০০ বছরের কলকাতা: পটভূমি ও ইতিকথা

# কলকাতা ঃ প্রতিষ্ঠার পটভূমিকা

কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠা ও সেই শহরকে কেন্দ্র করে পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন, এই দুই ঘটনার মূলে ছিল দুই যুদ্ধ। এই দুই যুদ্ধের মধ্যে, পলাশীর যুদ্ধ সুপরিচিত। অপর যুদ্ধ হচ্ছে হিজলির যুদ্ধ। যাঁরা কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে লেখাপড়া করেন বা টুকিটাকি লেখেন, তাঁরা কোনদিনই হিজলির যুদ্ধের গুরুত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন নি। অথচ হিজলির যুদ্ধে ইংরেজরা যদি পরাজিত হত, তাহলে ইংরেজদের পক্ষে কলকাতা শহর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হত না বা তার ৬৭ বছর পরে পলাশীর যুদ্ধও ঘটত না। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন করা তো দূরের কথা!

কি ঘটনাচক্রে হিজলির যুদ্ধ হয়েছিল, তা এখানে বলা দরকার। বাণিজ্য করবার উদ্দেশ্যে ইংরেজরা প্রথম বাঙলা দেশে আসে ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ। দিল্লীর বাদশাহকে উপঢৌকন, আর বাঙলার নাববকে ইনাম দিয়ে ইংরেজরা নিজেদের বাণিজ্যের অনেক সুযোগ সুবিধা সংগ্রহ করে। কিন্তু ইনাম পেয়ে পেয়ে বাঙলার নবাবের লোভ ক্রমশ বেড়ে যায়। তার ফলে নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ ঘটে। ইংরেজরা পাটনার কুঠি থেকে জোব চার্ণককে কাশিমবাজারের কুঠিতে ডেকে পাঠায়। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ চার্ণকের বিরুদ্ধে দেশীয় ব্যবসাদাররা এক মামলা দায়ের করে। হুগলির কাজি ইংরেজদের বিরুদ্ধে ৪৩,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবার রায় দেয়। চার্ণক এই টাকা দিতে অস্বীকার করে। নবাবের সৈন্য তখন কাশিমবাজার অবরোধ করে। চার্ণক কৌশল অবলম্বন করে, কাশিমবাজার থেকে পালিয়ে একেবারে হুগলিতে এসে হাজির হয়। চার্ণক দেখে যে ইংরেজদের যদি বাঙলায় কায়েমী ব্যবসা-বাণিজ্য স্থাপন করতে হয়, তাহলে তাদের মাত্র ব্যবসায়ীর তুলাদণ্ড হাতে নিয়ে থাকলে চলবে না। তাদের অসি ধারণ করতে হবে। চার্ণক বুঝে নেয় যে ক্রমাগত উৎকোচ প্রদান ও তোষামোদ দ্বারা মোগলকে বাধ্য রাখা অসম্ভব। মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। এই সময় গভর্ণর হেজেসও বিলাতের ডিরেকটরদের কাছে লিখে পাঠান যে মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণাই সমীচীন এবং আত্মরক্ষার জন্য স্থানে স্থানে দুর্গ নির্মাণ একান্ত প্রয়োজন।

শীঘ্রই ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ লাগে। দুপক্ষেরই সৈন্যসামন্ত ও নৌবহর হুগলিতে এসে হাজির হয়। ইংরেজরা নবাবপক্ষকে পরাজিত করে হুগলি তছনছ করে দেয়। হুগলির শাসক আবদুল গনি ছদ্মবেশে জলপথে হুগলি থেকে পালিয়ে যায়। তারপর ওলন্দাজদের মধ্যস্থতায় গনি ইংরেজদের কাছে এক সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠায়। চার্ণকও তাই চাইছিলেন। কেননা, তিনি বুঝে নিয়েছিলেন যে এরকমভাবে ঝগড়া করে, হুগলিতে ইংরেজদের পক্ষে আর বেশীদিন ব্যবসা করা সম্ভবপর হবে না। তিনি ইংরেজদের ব্যবসার সুবিধার জন্য অন্যত্র একটি শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেন।

১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর তারিখে চার্ণক বেরিয়ে পড়েন, ইংরেজদের জন্য এক

## এক নজরে কলকাতা

| | |
|---|---|
| আয়তন | ৮৫২ বর্গ কিলোমিটার |
| লোকসংখ্যা | ৯১,৯৪,০০০ জন |
| পুরুষ | ৫১,৬২,০০০ ,, |
| স্ত্রীলোক | ৪০,৩২,০০০ ,, |
| পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা | ৭৮১ হাজার প্রতি |
| প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা | ১০,৮০০ জন |
| শিক্ষিত মানুষ | ৬০,২০,০০০ জন |
| পুরুষ | ৩৬,৬১,০০০ জন |
| স্ত্রীলোক | ২৩,৫৯,০০০ জন |
| শিক্ষিতের হার | ৬৫.৫ শতাংশ |
| পুরুষ | ৭০.৯ ,, |
| স্ত্রীলোক | ৫৮.৫ ,, |
| কর্মরত মানুষ | ২৮,০০,০০০ জন |
| পুরুষ | ২৬,১৬,০০০ ,, |
| স্ত্রীলোক | ১,৮৪,০০০ ,, |
| কর্মরত মানুষের অনুপাত | ৩০.৫ শতাংশ |
| পুরুষ | ৫০.৭ শতাংশ |
| স্ত্রীলোক | ৪.৫ ,, |
| বাসিন্দাসহ বাড়ি | ১৭,২১,০০০ |
| গৃহস্থালী | ১৭,৪৭,০০০ |
| গৃহহীন জনসংখ্যা | ৬৪,০০০ |
| বস্তির বাসিন্দা | ৩০,২৮,০০০ |
| মোটর যান | ৩,৫১,০০০ |
| দুর্ঘটনা ( মোটর দ্বারা ) | ১,৯৪ প্রতি দশ হাজারে |
| ,, নিহত | ১২ |
| ,, আহত | ৭৬ |
| গাড়ি | ১,৫৫,০০০ |
| ট্যাকসী | ১৩,৯০০ |
| টেলিফোন | ৩,০৪,০০০ |
| হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা | ৪.১ প্রতি হাজারে |
| খাবার জল ( মাথাপিছু ) | ২৫৯ লিটার প্রতিদিনে |

# ৩৩ কলকাতা ঃ প্রতিষ্ঠার পটভূমিকা

কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠা ও সেই শহরকে কেন্দ্র করে পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন, এই দুই ঘটনার মূলে ছিল দুই যুদ্ধ। এই দুই যুদ্ধের মধ্যে, পলাশীর যুদ্ধ সুপরিচিত। অপর যুদ্ধ হচ্ছে হিজলির যুদ্ধ। যাঁরা কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে লেখাপড়া করেন বা টুকিটাকি লেখেন, তাঁরা কোনদিনই হিজলির যুদ্ধের গুরুত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন নি। অথচ হিজলির যুদ্ধে ইংরেজরা যদি পরাজিত হত, তাহলে ইংরেজদের পক্ষে কলকাতা শহর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হত না বা তার ৬৭ বছর পরে পলাশীর যুদ্ধও ঘটত না। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন করা তো দূরের কথা!

কি ঘটনাচক্রে হিজলির যুদ্ধ হয়েছিল, তা এখানে বলা দরকার। বাণিজ্য করবার উদ্দেশ্যে ইংরেজরা প্রথম বাঙলা দেশে আসে ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ। দিল্লীর বাদশাহকে উপঢৌকন, আর বাঙলার নাববকে ইনাম দিয়ে ইংরেজরা নিজেদের বাণিজ্যের অনেক সুযোগ সুবিধা সংগ্রহ করে। কিন্তু ইনাম পেয়ে পেয়ে বাঙলার নবাবের লোভ ক্রমশ বেড়ে যায়। তার ফলে নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ ঘটে। ইংরেজরা পাটনার কুঠি থেকে জোব চার্ণককে কাশিমবাজারের কুঠিতে ডেকে পাঠায়। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ চার্ণকের বিরুদ্ধে দেশীয় ব্যবসাদাররা এক মামলা দায়ের করে। হুগলির কাজি ইংরেজদের বিরুদ্ধে ৪৩,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবার রায় দেয়। চার্ণক এই টাকা দিতে অস্বীকার করে। নবাবের সৈন্য তখন কাশিমবাজার অবরোধ করে। চার্ণক কৌশল অবলম্বন করে, কাশিমবাজার থেকে পালিয়ে একেবারে হুগলিতে এসে হাজির হয়। চার্ণক দেখে যে ইংরেজদের যদি বাঙলায় কায়েমী ব্যবসা-বাণিজ্য স্থাপন করতে হয়, তাহলে তাদের মাত্র ব্যবসায়ীর তুলাদণ্ড হাতে নিয়ে থাকলে চলবে না। তাদের অসি ধারণ করতে হবে। চার্ণক বুঝে নেয় যে ক্রমাগত উৎকোচ প্রদান ও তোষামোদ দ্বারা মোগলকে বাধ্য রাখা অসম্ভব। মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। এই সময় গভর্ণর হেজেসও বিলাতের ডিরেকটরদের কাছে লিখে পাঠান যে মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণাই সমীচীন এবং আত্মরক্ষার জন্য স্থানে স্থানে দুর্গ নির্মাণ একান্ত প্রয়োজন।

শীঘ্রই ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ লাগে। দুপক্ষেরই সৈন্যসামন্ত ও নৌবহর হুগলিতে এসে হাজির হয়। ইংরেজরা নবাবপক্ষকে পরাজিত করে হুগলি তছনছ করে দেয়। হুগলির শাসক আবদুল গনি ছদ্মবেশে জলপথে হুগলি থেকে পালিয়ে যায়। তারপর ওলন্দাজদের মধ্যস্থতায় গনি ইংরেজদের কাছে এক সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠায়। চার্ণকও তাই চাইছিলেন। কেননা, তিনি বুঝে নিয়েছিলেন যে এরকমভাবে ঝগড়া করে, হুগলিতে ইংরেজদের পক্ষে আর বেশীদিন ব্যবসা করা সম্ভবপর হবে না। তিনি ইংরেজদের ব্যবসার সুবিধার জন্য অন্যত্র একটি শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেন।

১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর তারিখে চার্ণক বেরিয়ে পড়েন, ইংরেজদের জন্য এক

শক্তিকেন্দ্র স্থাপনের জায়গা খুঁজতে। ভাগীরথী ধরে নেমে এসে তিনি সুতানটি গ্রামে পৌছান। এটাকেই তিনি ইংরেজদের শক্তিকেন্দ্র স্থাপনের উপযুক্ত স্থান বলে মনে করেন। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসেই চার্ণক তাঁর প্রতিভূ ওয়াটস্ ও বরামলকে (বনমালীকে?) ঢাকায় পাঠিয়ে দেন, নবাব শায়েস্তা খানের কাছে এক আরজি-পত্র পেশ করার জন্য। ওই আরজি-পত্রে বারো দফা প্রার্থনা ছিল। তার মধ্যে দু-দফা ছিল কলকাতায় এক দুর্গ ও একটা টাঁকশাল নির্মাণ। ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারী তারিখে শায়েস্তা খান চার্ণককে জানান যে তিনি তাঁর আরজি অনুমোদন করেছেন ও ওটা বাদশাহের কাছে সই-সাবুদের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আসলে শায়েস্তা খান কিছুই করেন নি। তিনি যুদ্ধ করে ইংরেজদের বাঙলা থেকে তাড়িয়ে দেবার মতলব ভাঁজছিলেন মাত্র। চার্ণকও বুঝে নিয়েছিলেন যে যুদ্ধ ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় পন্থা নেই। ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইংরেজদের সঙ্গে মোগলদের যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধটা প্রথম লাগে বালেশ্বরে এবং পরে হিজলিতে। চার্ণক বাদশাহী নিমক মহল পুড়িয়ে দেয়, মোগলদের থানা দুর্গ অধিকার করে, এবং হিজলির যুদ্ধ পরিচালনা করবার জন্য সেখানে যায়।

ইতিমধ্যে বালেশ্বর ধ্বংস করে, ইংরেজরা হিজলি দখল করে নিয়েছিল। বাদশাহ ঔরঙ্গজেব তখন হায়দারাবাদের যুদ্ধে লিপ্ত। তাঁর কাছে যখন এসব দুঃসংবাদ গিয়ে পৌছায় তখন তিনি বুঝতেই পারলেন না, হুগলি, বালেশ্বর, হিজলি প্রভৃতি জায়গা কোথায়! একখানা মানচিত্র এনে তাঁকে জায়গাগুলো দেখানো হল। সেনাপতি মালিক কাসিমকে তিনি আদেশ দিলেন, সৈন্যসামন্ত নিয়ে গিয়ে বেয়াদব বিদেশীদের ভারত থেকে তাড়িয়ে দেবার। এদিকে বাঙলার নবাব শায়েস্তা খানও সেনাপতি আবদাস সামাদের অধীনে হিজলিতে সৈন্যসামন্ত পাঠিয়ে দিলেন। চার্ণক শীঘ্রই এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন। হিজলীর প্রাকৃতিক পরিবেশটা ছিল খুবই খারাপ। কাউকালি নদী, কুঞ্জপুরের খাল ও রসুলপুরের নদী দ্বারা বেষ্টিত হয়ে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ এই জায়গাটা একটা দ্বীপবিশেষ ছিল। দ্বীপটি জলাভূমিতে পরিপূর্ণ ও অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। তারপর সামনেই এসে গেল গ্রীষ্ম। চার্ণকের সঙ্গে যে সাড়ে চারশত সৈন্য ছিল, তারা ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে একে একে মারা যেতে লাগল। সৈন্যসংখ্যা একশতেরও নিচে গিয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে 'বোফর্ট' ও 'রচেষ্টার' নামে যে দুখানা জাহাজ ছিল, তার মধ্যে 'বোফর্ট-এর তলদেশে ছিদ্র দেখা দিল। তাঁর সঙ্গের লোকজন মরতে মরতে এমনভাবে হ্রাস পেল যে জাহাজ চালাবারই লোক রইল না। ঠিক এই বিপর্যয়ের মধ্যেই আবদাস সামাদ বারো হাজার সৈন্য, বহু পরিমাণ গোলা-বারুদ ও কামানসহ রসুলপুর নদীর অপর পারে এসে হাজির হল।

চার্ণক হিজলি দ্বীপের যেখানে আশ্রয় নিয়েছিল, সেটা পাকাবাড়ি বটে, কিন্তু অত্যন্ত নড়বড়ে। বাড়িটা ছিল একটা আমবাগানের মধ্যে। তার চতুর্দিকে ছিল কাঁচাবাড়ি। সেদিন যদি ভাগ্যদেবী ইংরেজদের প্রতি সুপ্রসন্ন না হতেন, তা হলে আবদাস সামাদের কামানের এক গোলাতেই বাড়িটা ভূমিসাৎ হয়ে যেত, এবং সঙ্গে সঙ্গে ধুলিসাৎ হত ইংরেজদের কলকাতা প্রতিষ্ঠার স্বপ্নবিলাস।

আগে আমি বলে নিতে চাই যে শহর কলকাতার চেয়ে গ্রাম কলকাতা অনেক পুরানো। ষোড়শ শতাব্দীতে গ্রাম কলকাতার উল্লেখ আমরা পাই আকবরের রাজস্বসচিব রাজা তোদরমল কর্তৃক ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রণীত 'ওয়াশিল-ই-জমাতুমার' নামক রাজস্ব সংক্রান্ত সমীক্ষায়। আবার ওই ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত বাংলা মঙ্গলকাব্যসমূহেও আমরা কলকাতা গ্রামের উল্লেখ পাই।

১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর তারিখে জোব চার্ণক যখন তাঁর এদেশীয় স্ত্রী ও তার গর্ভজাত তিন কন্যা সমেত সুতানটিতে এসে অবতরণ করেন, তখন সুতানটির সীমারেখা ছিল উত্তরে বাগবাজারের খাল, পূর্বে লবণ হ্রদ, পশ্চিমে ভাগীরথী ও দক্ষিণে পুরানো টাঁকশাল বাড়ি পর্যন্ত। আর তার দক্ষিণে ছিল পর পর দু'খানা গ্রাম—কলকাতা ও গোবিন্দপুর। সুতানটিই চার্ণকের কাছে ইংরেজদের আদর্শ বাণিজ্যকেন্দ্র হবার পক্ষে উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচিত হয়েছিল। এখানেই চার্ণক বসতি স্থাপন করেছিলেন, এবং কয়েকদিন পরে সপরিবারে বড়দিনের উৎসব পালন করেছিলেন।

সুতানটিই ছিল পরবর্তীকালের কলকাতা শহরের কেন্দ্রবিন্দু। কেননা পরবর্তী দশ বৎসর ইংরেজরা কলকাতা থেকে বিলাতের কর্তৃপক্ষগণের কাছে যত চিঠি-পত্তর লিখত, সেগুলির মাথায় তারা সুতানটিরই ঠিকানা দিত। সুতরাং সুতানটিতে প্রথম অবতরণ ও আগমনের তারিখটাকেই শহর কলকাতার প্রতিষ্ঠা দিবস বলে গণ্য করবার যথেষ্ট যুক্তি আছে। সুতানটিতে প্রথম আগমন (২০ ডিসেম্বর ১৬৮৬) ও সুতানটিতে তৃতীয়বার আগমন (২৪ আগস্ট, ১৬৯০)—এই সময়কালের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলীও তা সমর্থন করে।

চার্ণক ইংরেজদের বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে সুতানটিকে যে সুরক্ষিত (fortified) করবার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং সে সম্বন্ধে বিলাতের কর্তৃপক্ষকে লিখেছিলেন, সেটা আমরা জানতে পারি ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ক্যাপটেন হীথ বিলাতের কর্তৃপক্ষের লিখিত যে চিঠিখানা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, তা থেকে। 'If the place Mr. Charnock may have already settled and fortified upon will in any measure answer our known purpose, in such case, since we can't help it.' তিন সপ্তাহ পরে বিলাতের কর্তৃপক্ষ কলকাতাতেই ইংরেজদের অবস্থান করবার সপক্ষে আর একখানা চিঠি লেখেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্যাপটেন হীথের গোঁয়ারতুমির জন্য ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ নভেম্বর থেকে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ আগস্ট তারিখে সুতানটিতে তৃতীয়বারের মত ফিরে আসার সময়কালের মধ্যে চার্ণককে হীথের গোঁয়ারতুমির জন্য এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। তবে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ আগস্ট তারিখের পর চার্ণককে আর সুতানটি ত্যাগ করতে হয়নি বলেই আমরা ২৪ আগস্ট ১৬৯০ তারিখটাকেই কলকাতার জন্মদিন বলে ধরি।

১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর তারিখে ইংরেজরা সুতানটিতে আসবার পর এখানে যে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, সেটা আমরা ক্যাপটেন হীথ বিলাতের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যে চিঠিখানা এনেছিলেন মাত্র তা থেকেই যে জানতে পারি, তা নয়। ১৬৯০

খ্রীষ্টাব্দের ২৪ আগস্ট তারিখে চার্ণক তৃতীয়বারের জন্য সুতানটিতে আসবার পর, সুতানটি কাউন্সিলের যে প্রথম অধিবেশন হয়, সেখানে গৃহীত প্রস্তাব থেকেও জানতে পারি। ওই প্রস্তাবের পাঠ আমি এখানে উদ্ধৃত করছি। যথা—'আগে যে সমস্ত ঘরবাড়ি ছিল, সেগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পুনরায় কতকগুলি গৃহনির্মাণ প্রয়োজন। একটি মালগুদাম, একটি রান্না ও খাবার ঘর, কোম্পানির কর্মচারীদের থাকবার স্থান, পাহারাদারদের বাসস্থান ও এলিস সাহেবের আবাসগৃহ নির্মাণ করা শীঘ্রই প্রয়োজন। এজেণ্ট ও মিস্টার জেরেমিয়া পিটির আবাসস্থানের কতকটা এখনও আছে—সেগুলো মেরামত করে নিলেই চলবে।' এই প্রস্তাব থেকেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ নভেম্বর তারিখে ইংরেজরা যখন ক্যাপটেন হীথের সঙ্গে অন্য কেন্দ্রের সন্ধানে বেরিয়েছিল, তখনই ইংরেজ উপনিবেশে নিতান্তপক্ষে অনুরূপ ঘরবাড়ি ছিল। সুতানটি কাউন্সিলের যে অধিবেশনে ওই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, সেখানেই মন্তব্য করা হয়েছিল যে 'আগে যে সব ঘরবাড়ি ছিল, সেগুলি হয় লুণ্ঠিত, আর তা নয়তো অগ্নিদগ্ধ হয়েছে।'

যখন ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই ইংরেজদের এখানে উপনিবেশ ও ঘরবাড়ি ছিল, সেক্ষেত্রে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ আগস্ট তারিখটাকে কলকাতার জন্মদিন হিসাবে গণ্য করবার পিছনে কোন যুক্তি নেই।

এখানে আরও উল্লেখনীয় যে ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসেই চার্ণক সুতানটি থেকে তাঁর প্রতিভূ ওয়াটস্ ও বরামলকে ঢাকায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন নবাব শায়েস্তা খানের কাছে এক আরজি-পত্র পেশ করবার জন্য। ওই আরজি-পত্রে বারো দফা প্রার্থনা ছিল। তার মধ্যে দু' দফা ছিল—কলকাতায় একটা দুর্গ ও একটা টাঁকশাল নির্মাণ। ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারী তারিখে শায়েস্তা খান চার্ণককে জানান যে তিনি তাঁর আরজি অনুমোদন করেছেন ও ওটা সহি-সাবুদের জন্য দিল্লির বাদশাহের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ তথ্য থেকেও বুঝতে পারা যায় যে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই ইংরেজরা কলকাতায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিল।

## চৌরঙ্গীর জঙ্গলের রানী

১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে জোব চার্ণক যখন তৃতীয় বা শেষবারের মত সুতানটিতে এসে কলকাতা শহরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন, ঠিক সেই সময়েই চৌরঙ্গীর জঙ্গলে ছিল দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গী (যাঁর নাম থেকে জায়গাটার নাম হয়েছে চৌরঙ্গী) প্রতিষ্ঠিত মহাদেবের এক মন্দির ও আশ্রম। ওখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল বাঙলাদেশের এক রানী। স্বামী কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে চৌরঙ্গীর ওই মহাদেবের আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিলেন রানী অজিতাসুন্দরী। রানী অজিতাসুন্দরী ছিলেন চেতুয়া-বরদার ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা শোভা সিংহের প্রথমা রানী। চেতুয়া-বরদা ছিল মন্দারন সরকারের (বর্তমান মেদিনীপুর) পাঁচ নম্বর মহল। রাজা শোভা সিংহ ছিল অত্যন্ত চরিত্রহীন, লম্পট ও অত্যাচারী জমিদার। তারই সময়ে বরদার যদুপুর গ্রামে বাস করত রামেশ্বর ভট্টাচার্য, যিনি

পরবর্তীকালে কর্ণগড়ের রাজা রাম সিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় রচনা করেছিলেন 'শিবায়ন' কাব্য।

যদুপুরে বরদা-বর্ধমান রাজপথের পাশে ছিল এক মস্ত দিঘি। একদিন রামেশ্বরের স্ত্রী সুমিত্রা যখন স্নান করতে যাচ্ছিল ওই দিঘিতে, তখন ওই পথে অশ্বারোহণে যাচ্ছিল রাজা শোভা সিংহ। সুমিত্রার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে শোভা সিংহ বলপূর্বক তুলে নেয় তাকে ঘোড়ার ওপর। সুমিত্রা প্রাণপণে আত্মরক্ষার প্রয়াস করে। তাতে বিব্রত হয়ে শোভা সিংহ তাকে ফেলে দিয়ে যায় পথের ধারে। শোভা সিংহের এই কুকীর্তির কথা তরুণ কবি রামেশ্বরের কানে গিয়ে পৌছায়। রামেশ্বর ছিল তান্ত্রিক সাধক। তাঁর বাসভবনের অনতিদূরেই ছিল তাঁর তন্ত্রসাধনার স্থান পঞ্চমুণ্ডির আসন। সেখানে আরম্ভ করে রামেশ্বর এক মারণযজ্ঞ, যার আহুতি সম্পন্ন হলে অনিবার্য হবে শোভা সিংহের মৃত্যু। শোভা সিংহ নিদারুণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। মুখে মুখে প্রচারিত হল সুমিত্রার ওপর শোভা সিংহের অত্যাচার ও রামেশ্বর কর্তৃক মারণযজ্ঞ আরম্ভের কথা। কথাটা শুনে বিচলিত হয়ে উঠল শোভা সিংহের প্রথমা রানী অজিতাসুন্দরী। ছুটে গেল সে রামেশ্বরের পঞ্চমুণ্ডির আসনের দিকে। লুটিয়ে পড়ল রামেশ্বরের পদপ্রান্তে। অনুনয় করে বলল—''দাও ঠাকুর আমার স্বামীর প্রাণ, অপরাধ তার মার্জনা কর, এমন কুৎসিত কাজ ভবিষ্যতে সে আর কখনও করবে না।'' পতিপ্রাণা নারীর করুণ ক্রন্দন বিগলিত করল রামেশ্বরের রুষ্ট মনকে। 'ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট' রামেশ্বর বলল, ভবিষ্যতে তার স্বামী যেন কোন নারীর ওপর বলপ্রয়োগ না করে। অজিতাসুন্দরী স্বীকার করল রামেশ্বরের কাছে যে ভবিষ্যতে তার স্বামী এরূপ কুকার্য আর কখনও করবে না।

রামেশ্বরের অভয়দানে আশ্বস্ত হয়ে রানী ফিরে এল রাজপ্রাসাদে। শোভা সিংহ শীঘ্রই নিরাময় হয়ে উঠল। কিন্তু প্রতাপশালী শোভা সিংহ যখন শুনল যে রানী অজিতাসুন্দরী একজন সামান্য ব্রাহ্মণের পায়ে পড়ে তার প্রাণ ভিক্ষা করে নিয়ে এসেছে, তখন রুষ্ট হয়ে সে রানীকে বিতাড়িত করে দিল রাজপ্রাসাদ থেকে। বিতাড়িত হয়ে রানী আশ্রয় নিল চৌরঙ্গীর জঙ্গলে চৌরঙ্গীশ্বরের মন্দিরে। এ সবই ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা।

এর প্রতিক্রিয়া গিয়ে পড়ল বর্ধমানের রাজবাটীতে। এই ঘটনার কিছু আগে শোভা সিংহ প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিল বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরামের কাছে, যে সে তার মেয়ে সত্যবতীর পাণিপ্রার্থী হতে চায়। কৃষ্ণরাম সম্মতি দিয়েছিল। কিন্তু অজিতাসুন্দরীকে বিতাড়িত করবার খবর যখন বর্ধমানে গিয়ে পৌছাল, তখন বেঁকে দাঁড়াল সত্যবতী ও তার পিতা কৃষ্ণরাম। শোভা সিংহকে কন্যাদান করতে অসম্মত হল কৃষ্ণরাম। বাগদত্তা কন্যাকে কৃষ্ণরাম শোভা সিংহের হাতে তুলে দিতে অস্বীকৃত হয়েছে, একথা যখন লোকমুখে প্রচারিত হল, শোভা সিংহ তখন নিজেকে অপমানিত বোধ করে, কৃষ্ণরামের ওপর এর প্রতিহিংসা নেবার সঙ্কল্প করল। কৃষ্ণরামকে শিক্ষা দেবার জন্য সে বর্ধমান আক্রমণ করবার মতলব করল। যদিও তখন মোগল আধিপত্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তা হলেও সে একা এটা করতে সাহস করল না। সাহায্য চেয়ে পাঠাল ওড়িশার আফগান সরদার রহিম খানের কাছে।

রহিম খান ও শোভা সিংহের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে বর্ধমান অভিমুখে যাত্রা করে। কৃষ্ণরাম আশঙ্কিত হয়ে নিজ পুত্র জগৎরায়কে স্ত্রী-বেশে শিবিকা করে নবদ্বীপাধিপতির কাছে পাঠিয়ে দেয়। যুদ্ধে কৃষ্ণরাম নিহত হয়। কৃষ্ণরামের পরিবারের মেয়েরা জহর-ব্রত অবলম্বন করে আগুনে ঝাঁপ দেয়। কেবল সত্যবতী ধৃত ও বন্দী হয়। ওদিকে জগৎরায় নবদ্বীপ থেকে ঢাকায় পালিয়ে গিয়ে নবাবের কাছে নালিশ করে। কিন্তু হুজুর তখন 'গুলিস্তান' পড়তেই মশগুল। জগৎরায়ের নালিশ তার কানেই গেল না। সেই সুযোগে শোভা সিংহের সৈন্যদল চতুর্দিকে তাণ্ডবলীলা চালাতে লাগল। এই সময় শোভা সিংহের দলের সঙ্গে যোগ দিল চন্দ্রকোনার জমিদার রঘুনাথ সিংহ। চতুর্দিকেই তারা লুণ্ঠন ও অত্যাচার চালাল। হুগলিকে কেন্দ্র করে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী ১৮০ মাইল ব্যাপী অঞ্চলে শোভা সিংহ নিজ আধিপত্য স্থাপন করে নৌবাণিজ্যের শুল্ক আদায় করতে লাগল। ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ সকলেই ভয় পেয়ে গেল। বিদ্রোহীদের আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য তারা যথাক্রমে কলকাতা, চন্দননগর ও চুঁচুড়ায় দুর্গ নির্মাণ করবার প্রার্থনা নবাবের কাছে পেশ করল। বিদ্রোহ দমনেও তারা নবাবকে সাহায্য করল। নবাব তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করল। এর ফলেই ইংরেজরা কলকাতায় দুর্গ নির্মাণের অনুমতি পায়।

ওদিকে শোভা সিংহ কৃষ্ণরামের মেয়ে সত্যবতীকে বন্দী করে রেখেছিল। ভাগীরথীর পশ্চিম অঞ্চলে নিজ আধিপত্য স্থাপনের পর শোভা সিংহ প্রণয়প্রার্থী হয়ে সত্যবতীর কাছে যায়। সত্যবতী বসনের ভিতর লুকিয়ে রেখেছিল একখানা ছুরিকা। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ সে অতর্কিতে শোভা সিংহকে ছুরিকাঘাত করে নিহত করে।

শোভা সিংহের মৃত্যুসংবাদ যখন যদুপুরে গিয়ে পৌছাল, রামেশ্বর তখন উল্লসিত হয়ে এক কবিতা লিখে ফেলল। কবিতার মর্ম হচ্ছে নারীর প্রতি অত্যাচারীর এরূপই স্বাভাবিক পরিণতি ঘটে, যেমন ঘটেছিল রাবণ ও দুর্যোধনের। লোকের মুখে মুখে এই কবিতা আবৃত্তি হতে লাগল। চটে গেল শোভা সিংহের স্থলাভিষিক্ত তার ভাই হেমন্ত সিংহ। বিতাড়িত করে দিল রামেশ্বরকে যদুপুর থেকে। রামেশ্বর আশ্রয় পেল কর্ণগড়ের রাজা রাম সিংহের নিকট।

যদিও রানী অজিতাসুন্দরীর বিতাড়ন ইতিহাসের ওপর সুদূরপ্রসারী ছাপ রেখে গেছে, তথাপি চৌরঙ্গীর জঙ্গলে রানী অজিতাসুন্দরীর শেষ পর্যন্ত কি হল, সে সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব।

## পেরিন সাহেবের বাগান

আজ বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব ও প্রদর্শনী যে মাঠে অনুষ্ঠিত হয়, এককালে সেখানেই ছিল পেরিন সাহেবের বাগান বাড়ি। যাঁরা কলকাতা নিয়ে চর্চা করেন, তাঁরা সকলেই পেরিন সাহেবের বাগান বাড়ির কথা বলেন। কিন্তু যে কথা তাঁরা বলেন না তা

পরবর্তীকালে কর্ণগড়ের রাজা রাম সিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় রচনা করেছিলেন 'শিবায়ন' কাব্য।

যদুপুরে বরদা-বর্ধমান রাজপথের পাশে ছিল এক মস্ত দিঘি। একদিন রামেশ্বরের স্ত্রী সুমিত্রা যখন স্নান করতে যাচ্ছিল ওই দিঘিতে, তখন ওই পথে অশ্বারোহণে যাচ্ছিল রাজা শোভা সিংহ। সুমিত্রার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে শোভা সিংহ বলপূর্বক তুলে নেয় তাকে ঘোড়ার ওপর। সুমিত্রা প্রাণপণে আত্মরক্ষার প্রয়াস করে। তাতে বিব্রত হয়ে শোভা সিংহ তাকে ফেলে দিয়ে যায় পথের ধারে। শোভা সিংহের এই কুকীর্তির কথা তরুণ কবি রামেশ্বরের কানে গিয়ে পৌঁছায়। রামেশ্বর ছিল তান্ত্রিক সাধক। তাঁর বাসভবনের অনতিদূরেই ছিল তাঁর তন্ত্রসাধনার স্থান পঞ্চমুণ্ডির আসন। সেখানে আরম্ভ করে রামেশ্বর এক মারণযজ্ঞ, যার আহুতি সম্পন্ন হলে অনিবার্য হবে শোভা সিংহের মৃত্যু। শোভা সিংহ নিদারুণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। মুখে মুখে প্রচারিত হল সুমিত্রার ওপর শোভা সিংহের অত্যাচার ও রামেশ্বর কর্তৃক মারণযজ্ঞ আরম্ভের কথা। কথাটা শুনে বিচলিত হয়ে উঠল শোভা সিংহের প্রথমা রানী অজিতাসুন্দরী। ছুটে গেল সে রামেশ্বরের পঞ্চমুণ্ডির আসনের দিকে। লুটিয়ে পড়ল রামেশ্বরের পদপ্রান্তে। অনুনয় করে বলল—"দাও ঠাকুর আমার স্বামীর প্রাণ, অপরাধ তার মার্জনা কর, এমন কুৎসিত কাজ ভবিষ্যতে সে আর কখনও করবে না।" পতিপ্রাণা নারীর করুণ ক্রন্দন বিগলিত করল রামেশ্বরের রুষ্ট মনকে। 'ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট' রামেশ্বর বলল, ভবিষ্যতে তার স্বামী যেন কোন নারীর ওপর বলপ্রয়োগ না করে। অজিতাসুন্দরী স্বীকার করল রামেশ্বরের কাছে যে ভবিষ্যতে তার স্বামী এরূপ কুকার্য আর কখনও করবে না।

রামেশ্বরের অভয়দানে আশ্বস্ত হয়ে রানী ফিরে এল রাজপ্রাসাদে। শোভা সিংহ শীঘ্রই নিরাময় হয়ে উঠল। কিন্তু প্রতাপশালী শোভা সিংহ যখন শুনল যে রানী অজিতাসুন্দরী একজন সামান্য ব্রাহ্মণের পায়ে পড়ে তার প্রাণ ভিক্ষা করে নিয়ে এসেছে, তখন রুষ্ট হয়ে সে রানীকে বিতাড়িত করে দিল রাজপ্রাসাদ থেকে। বিতাড়িত হয়ে রানী আশ্রয় নিল চৌরঙ্গীর জঙ্গলে চৌরঙ্গীশ্বরের মন্দিরে। এ সবই ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা।

এর প্রতিক্রিয়া গিয়ে পড়ল বর্ধমানের রাজবাটীতে। এই ঘটনার কিছু আগে শোভা সিংহ প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিল বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরামের কাছে, যে সে তার মেয়ে সত্যবতীর পাণিপ্রার্থী হতে চায়। কৃষ্ণরাম সম্মতি দিয়েছিল। কিন্তু অজিতাসুন্দরীকে বিতাড়িত করবার খবর যখন বর্ধমানে গিয়ে পৌঁছাল, তখন বেঁকে দাঁড়াল সত্যবতী ও তার পিতা কৃষ্ণরাম। শোভা সিংহকে কন্যাদান করতে অসম্মত হল কৃষ্ণরাম। বাগদত্তা কন্যাকে কৃষ্ণরাম শোভা সিংহের হাতে তুলে দিতে অস্বীকৃত হয়েছে, একথা যখন লোকমুখে প্রচারিত হল, শোভা সিংহ তখন নিজেকে অপমানিত বোধ করে, কৃষ্ণরামের ওপর এর প্রতিহিংসা নেবার সঙ্কল্প করল। কৃষ্ণরামকে শিক্ষা দেবার জন্য সে বর্ধমান আক্রমণ করবার মতলব করল। যদিও তখন মোগল আধিপত্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তা হলেও সে একা এটা করতে সাহস করল না। সাহায্য চেয়ে পাঠাল ওড়িশার আফগান সরদার রহিম খানের কাছে।

রহিম খান ও শোভা সিংহের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে বর্ধমান অভিমুখে যাত্রা করে। কৃষ্ণরাম আশঙ্কিত হয়ে নিজ পুত্র জগৎরায়কে স্ত্রী-বেশে শিবিকা করে নবদ্বীপাধিপতির কাছে পাঠিয়ে দেয়। যুদ্ধে কৃষ্ণরাম নিহত হয়। কৃষ্ণরামের পরিবারের মেয়েরা জহর-ব্রত অবলম্বন করে আগুনে ঝাঁপ দেয়। কেবল সত্যবতী ধৃত ও বন্দী হয়। ওদিকে জগৎরায় নবদ্বীপ থেকে ঢাকায় পালিয়ে গিয়ে নবাবের কাছে নালিশ করে। কিন্তু হুজুর তখন 'গুলিস্তান' পড়তেই মশগুল। জগৎরায়ের নালিশ তার কানেই গেল না। সেই সুযোগে শোভা সিংহের সৈন্যদল চতুর্দিকে তাণ্ডবলীলা চালাতে লাগল। এই সময় শোভা সিংহের দলের সঙ্গে যোগ দিল চন্দ্রকোনার জমিদার রঘুনাথ সিংহ। চতুর্দিকেই তারা লুণ্ঠন ও অত্যাচার চালাল। হুগলিকে কেন্দ্র করে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী ১৮০ মাইল ব্যাপী অঞ্চলে শোভা সিংহ নিজ আধিপত্য স্থাপন করে নৌবাণিজ্যের শুল্ক আদায় করতে লাগল। ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ সকলেই ভয় পেয়ে গেল। বিদ্রোহীদের আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য তারা যথাক্রমে কলকাতা, চন্দননগর ও চুঁচুড়ায় দুর্গ নির্মাণ করবার প্রার্থনা নবাবের কাছে পেশ করল। বিদ্রোহ দমনেও তারা নবাবকে সাহায্য করল। নবাব তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করল। এর ফলেই ইংরেজরা কলকাতায় দুর্গ নির্মাণের অনুমতি পায়।

ওদিকে শোভা সিংহ কৃষ্ণরামের মেয়ে সত্যবতীকে বন্দী করে রেখেছিল। ভাগীরথীর পশ্চিম অঞ্চলে নিজ আধিপত্য স্থাপনের পর শোভা সিংহ প্রণয়প্রার্থী হয়ে সত্যবতীর কাছে যায়। সত্যবতী বসনের ভিতর লুকিয়ে রেখেছিল একখানা ছুরিকা। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ সে অতর্কিতে শোভা সিংহকে ছুরিকাঘাত করে নিহত করে।

শোভা সিংহের মৃত্যুসংবাদ যখন যদুপুরে গিয়ে পৌছাল, রামেশ্বর তখন উল্লসিত হয়ে এক কবিতা লিখে ফেলল। কবিতার মর্ম হচ্ছে নারীর প্রতি অত্যাচারীর এরূপই স্বাভাবিক পরিণতি ঘটে, যেমন ঘটেছিল রাবণ ও দুর্যোধনের। লোকের মুখে মুখে এই কবিতা আবৃত্তি হতে লাগল। চটে গেল শোভা সিংহের স্থলাভিষিক্ত তার ভাই হেমন্ত সিংহ। বিতাড়িত করে দিল রামেশ্বরকে যদুপুর থেকে। রামেশ্বর আশ্রয় পেল কর্ণগড়ের রাজা রাম সিংহের নিকট।

যদিও রানী অজিতাসুন্দরীর বিতাড়ন ইতিহাসের ওপর সুদূরপ্রসারী ছাপ রেখে গেছে, তথাপি চৌরঙ্গীর জঙ্গলে রানী অজিতাসুন্দরীর শেষ পর্যন্ত কি হল, সে সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব।

## পেরিন সাহেবের বাগান

আজ বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব ও প্রদর্শনী যে মাঠে অনুষ্ঠিত হয়, এককালে সেখানেই ছিল পেরিন সাহেবের বাগান বাড়ি। যাঁরা কলকাতা নিয়ে চর্চা করেন, তাঁরা সকলেই পেরিন সাহেবের বাগান বাড়ির কথা বলেন। কিন্তু যে কথা তাঁরা বলেন না তা

হচ্ছে এই যে পেরিন সাহেব কে ছিলেন, এবং বাগবাজারে তাঁর বাগান বাড়িটা কবে ছিল। সেটা জানাবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

পেরিনের পুরা নাম ছিল ক্যাপটেন চার্লস পেরিন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন কলকাতায় বসতি স্থাপন করে, তখন এখানে অনেক অবৈধ বণিকের (interlopers) আবির্ভাব ঘটে। পেরিন তাদেরই অন্যতম। তাঁর নিজের জাহাজ ছিল, এবং সেই জাহাজে করে তিনি দেশদেশান্তরে অবৈধ বাণিজ্যে লিপ্ত হতেন। কিন্তু তাঁর জন্মস্থান ও পিতামাতা সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। তাঁর সম্বন্ধে যেটা আমরা জানি সেটা হচ্ছে, কোন সময়ে তিনি কলকাতায় ছিলেন এবং এখানে ঘরবাড়ি ও বাগানবাড়ি তৈরি করেছিলেন। এই সময়কালটা জানবার সূত্র হচ্ছে মাত্র তিনটা—(১) কলকাতার প্রথম কালেকটার র‍্যালফ্ শেলডনের সঙ্গে তাঁর বিরোধ, (২) ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির খাতায় তাঁর নামের উল্লেখ ও (৩) আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন নামে আরেকজন অবৈধ বণিকের সঙ্গে তাঁর সমসাময়িকতা। এই তিন সূত্র থেকে আমরা বুঝতে পারি যে অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে সূচনায় পেরিন কলকাতার অধিবাসী ছিলেন।

উপরোক্ত এই তিন সূত্র ধরে ক্যাপটেন চার্লস পেরিনের জীবনী সম্বন্ধে আমরা যতটা জানি, তাই এখানে বিবৃত করছি। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা সুতানটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনখানা গ্রামের জমিদারী স্বত্ব (এটা জমিদারী স্বত্ব নয়, এ মতবাদ একেবারে ভুল) কেনেন। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা জমিদারী পরিচালনার জন্য র‍্যালফ শেলডন নামে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। তিনিই হচ্ছেন কলকাতার প্রথম কালেকটর। তিনি একাধারে কালেকটর ও ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আবার রোটেশন গভর্নমেন্টের আমলে তিনি সপ্তাহান্তরে কলকাতার গভর্নরও ছিলেন। ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে বেঞ্জামিন বাউচার কলকাতার কালেকটর ছিলেন। এসব তথ্য থেকে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, তা হচ্ছে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে সূচনায় র‍্যালফ শেলডন কলকাতার অধিবাসী ছিলেন।

এই র‍্যালফ শেলডনের কাছ থেকে ৫০০ পাউণ্ড ধার নিয়ে ক্যাপটেন চার্লস পেরিন বাণিজ্য উপলক্ষে পারস্য দেশে যান। এই টাকা কর্জ নেবার সময় পেরিন, শেলডনকে একখানা খত বা 'বণ্ড' লিখে দেন। পারস্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করে পেরিন বিশেষ লাভবান হন। উঁচু দামে কলকাতায় বেচবার জন্য তিনি পারস্য দেশ থেকে উৎকৃষ্ট মদ সংগ্রহ করে, কলকাতার দিকে রওনা হন। ফেরবার পথে তিনি গোয়ায় সস্তা দরে একখানা জাহাজ বিক্রি হচ্ছে দেখে জাহাজখানা কিনে নেন। গোয়া থেকে কালিকটে গিয়ে তিনি সেখান থেকে লঙ্কা কিনে গোয়ায় কেনা নতুন জাহাজখানাতে সেই লঙ্কা তুলে নেন। কলকাতায় ফিরে এসে পেরিন আমদানীকৃত লঙ্কা ও মদ শেলডনকে বেচবার জন্য প্রস্তাব দেন। কিন্তু পারস্য দেশে বাণিজ্যে গিয়ে পেরিন বেশ লাভবান হয়েছে দেখে শেলডন বেশ ঈর্ষান্বিত হয়। মাত্র যে পরিমাণ লঙ্কা প্রচলিত বাজার দরে কিনলে পেরিনের দেনা শোধ হয়, সেই পরিমাণ লঙ্কা নিয়ে শেলডন পেরিনকে তার খতখানা ফেরত দিতে অস্বীকার করে। বলে তুমি অবৈধভাবে যেথায় সেথায় গিয়ে বাণিজ্য করছ, সেই হেতু

তোমাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখবার জন্য তোমার খতখানা আমি আমার জিম্মায় রেখে দেব। উপরন্তু শেলডন ঘোষণা করে দেয় যে পেরিন যে লঙ্কা নিয়ে এসেছে সে লঙ্কা পচা লঙ্কা এবং পারস্য দেশ থেকে যে মদ এনেছে, তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট মানের। ফলে পেরিনের পক্ষে কলকাতার বাজারে লঙ্কা ও মদ বেচা অসম্ভব হয়। বিষণ্ণ মনে একদিন পেরিন লাল দিঘির উদ্যানে পরিভ্রমণ করছেন। এমন সময় আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটনের (১৬৮৮ থেকে ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি প্রাচ্যদেশসমূহের সহিত অবৈধ বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন।) সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। পেরিন নিজের দুঃখের কাহিনী হ্যামিলটনের কাছে বিবৃত করেন। কিন্তু হ্যামিলটন পেরিনকে বলে যেহেতু সে নিজেই একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি (reckoned a Criminal guilty of that unpardonable sin of inter loping) সেই হেতু সে পেরিনকে এ বিষয়ে বিশেষ কিছু সাহায্য করতে পারবে না। সেজন্য হ্যামিলটন পেরিনকে বলে তুমি যেনতেন প্রকারেন (on any terms of agreement whatsoever) শেলডনের সঙ্গে তার ঝগড়া যেন মিটিয়ে নেয়। পেরিন হ্যামিলটনের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথোপকথন করছে, এটা শেলডন নিজের বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে দেখেছিল। দুজনে কি কথাবার্তা হচ্ছে তা জানবার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। পেরিনকে সে ডেকে পাঠায়। সব শুনে শেলডন পেরিনকে বলে আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি তোমার নিজের জাহাজে করে পারস্য দেশে বাণিজ্য করতে যেতে পারবে।

কিন্তু আমদানীকৃত মদগুলো যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থাতেই রয়ে গেল।

শেলডনের ঘোষণার পর সে মদগুলোর এমনই দুর্নাম হয়েছিল যে সে মদ কেউ কিনতে চাইল না, যদিও তখন কলকাতায় মদের অভাব ছিল। সেজন্য হ্যামিলটন পেরিনকে পরামর্শ দিল যে একদিন রাত্রে সে যেন গোপনে মদগুলো হ্যামিলটনের জাহাজে তুলে দেয় এবং তারপর হ্যামিলটন সেগুলো বিক্রি করে দেবার চেষ্টা করবে। এর পরই হ্যামিলটন এক দিন কলকাতা কাউনসিলের দু'জন সদস্যকে তাঁর বাড়ি নিমন্ত্রণ করে এবং তাঁদের ওই মদে আপ্যায়ন করে। তাঁরা ওই মদের এমনই প্রশংসা করে যে হ্যামিলটনের পক্ষে ২৫০ পেটি মদ দ্বিগুন দামে বিক্রি করা সম্ভবপর হয়। পেরিনের কলকাতায় অনেক দেনা ছিল, কিন্তু মদের দ্বিগুণ দাম পেয়ে তার পক্ষে সে দেনা মেটানো সম্ভবপর হয়।

ইতিমধ্যে শেলডনের সম্মতি অনুযায়ী পেরিন পারস্য দেশে যাবার আয়োজন করে। শেলডন নিজের কতগুলো পচা লঙ্কা ও ছেঁড়া চটের থলে পারস্য দেশে বেচার জন্য পেরিনের জাহাজে তুলে দেয় এবং তাকে দিয়ে বিল অব লেডিং এ সহি করিয়ে নেয় যে সেগুলো দোষমুক্ত ও অক্ষত। পেরিন তাতেই রাজি হয়। কিন্তু যাত্রার প্রাক্কালে শেলডন বিশ্বাসঘাতকতা করে পেরিনের বিরুদ্ধে ২৫০০ টাকার একটা বিল পরিশোধ করবার নোটিশ জারি করে দেয়। যাহোক এই ব্যাঘাতের হাত থেকে পিরিন বেঁচে যায়, কেননা সেই বিলটা হ্যামিলটন শোধ করে। পারস্য থেকে বাণিজ্য করে কলকাতায় ফিরলে শেলডন আবার তার বিরুদ্ধে ১১,০০০ পাউণ্ডের একটা ঋণ পরিশোধ করতে বলে। পেরিন আবার

আসে। এ ভাবেই তখন কলকাতার প্রশাসন চলছিল। এ সম্বন্ধে হ্যামিলটন লিখে গেছেন —'One may form an idea of the depravity and dismal image and tyranny and villainy supported by a power, that neither divine nor human laws have force enough to bridle or restrain.'

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কনসালটেসনস বহি থেকে আমরা জানতে পারি যে ওই বৎসর পেরিন sceptre নামক এক জাহাজের মালিক ছিলেন। মনে হয় পরে তিনি ওই জাহাজেই পারস্য দেশে বাণিজ্যে গিয়েছিলেন। কলকাতায় ফেরবার পর খুব সম্ভবত কলকাতায় তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। কেননা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দের খাতা বহি থেকে আমরা জানতে পারি যে ওই সালে পেরিন মৃত। আগেই বলেছি যে পেরিনের মৃত্যুর পর তার সমস্ত সম্পত্তি ইংরেজদের দখলে আসে। পরে পেরিনের বাগান বাড়ি কেনেন ক্যাপটেন জন বুকানন নামে এক ব্যক্তি। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে সিরাজদ্দৌলা যখন কলকাতা আক্রমণ করে, বুকানন তখন মৃত। কেননা অন্যান্য ইংরেজদের সঙ্গে বুকাননের বিধবা তখন ফলতায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। পলাতক ইংরেজদের মধ্যে তখন তরুণ বয়স্ক ওয়ারেন হেস্টিংসও ছিলেন। ফলতায় বুকাননের বিধবার সঙ্গে হেস্টিংস-এর ভাব হয় এবং তার পরিণতিতে হেস্টিংস বুকাননের বিধবাকে বিবাহ করে। এই বিধবার গর্ভে হেস্টিংস-এর এক পুত্র ও এক কন্যা হয়। হেস্টিংসের এই স্ত্রীর মৃত্যু হয় ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কাশিমবাজারে। মেয়েটিও কাশিমবাজারে মারা যায়। ছেলেটিকে হেস্টিংস বিলাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু হেস্টিংস প্রথমবার বিলাতে ফিরে যাবার কিছু পূর্বে ছেলেটির মৃত্যু ঘটে।

এই বিবাহের সূত্রেই হেস্টিংস বাগবাজারে পেরিন সাহেবের বাগানের মালিক হয়েছিলেন। কিন্তু কবে ওই বাগান তিনি বিক্রি করেছিলেন, বা কি করে তা কলকাতা করপোরেশনের হাতে এসেছিল, তা আমরা জানি না। করপোরেশন রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রস্তরকুচি জমা করবার জন্য এই ভূমিখণ্ড ব্যবহার করে বলে এর নাম হয় 'মেটাল ইয়ার্ড'। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন বাগবাজার সার্বজনীন রেজেষ্ট্রিকৃত হয়, তখন এর নামকরণ করা হয় দুর্গানগর।

পেরিন অবৈধ বণিক ছিলেন। সেজন্য মনে হয় যে অবৈধভাবে আনীত পণ্য তিনি ওই বাগান বাড়িতে লুকিয়ে রাখতেন। সামনে গঙ্গার ধারেই তাঁর জাহাজ নোঙর করা থাকত। সেজন্যই বোধ হয় জায়গাটাকে 'পেরিং পয়েন্ট' বলা হত। 'পেরিং পয়েন্ট'এর কথা আমরা ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দেও শুনি। ওই সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখের কোম্পানির এক ইস্তাহারে পড়ি—শহরের মধ্যে আতসবাজী ছোঁড়ায় অনেক স্থানের চালাঘরে আগুন লেগে পাড়াকে পাড়া ভস্মীভূত করে দিয়েছে। পেরিন পয়েন্ট ও শহরের মধ্যে আমাদের যে বারুদখানা আছে—এরূপ আতসবাজীর দ্বারা তারও বিপদ ঘটতে পারে। এজন্য আদেশ করা যাচ্ছে, কলকাতার মধ্যে আর আতসবাজী ছুঁড়তে দেওয়া হবে না। বাজীর

## কলকাতার আদিরূপ

এটা গালগল্প নয়, নিছক ঐতিহাসিক সত্য যে, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বাড়িখানা যে ভূমিখণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তারই তলদেশ দিয়ে একসময় প্রবাহিত হত কলকাতার প্রাচীন খালটা। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জোব চার্ণক যখন প্রথম সুতানটিতে এসে অবতরণ করেন তখন এ খালটা তো ছিলই, পরবর্তীকালেও ছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিউ সেক্রেটারিয়েট বিলডিং-এর নিকট ভাগীরথী থেকে নির্গত হয়ে খালটা হেস্টিংস স্ট্রীটের পাশ দিয়ে এগিয়ে এসে বর্তমান কলকাতা রেজিস্ট্রি অফিসের কাছে বাঁদিকে বাঁক নিয়ে পূর্বদিকে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিস, চাঁদনী চকের উত্তর, ওয়েলিংটন স্কোয়ার ও ক্রীক রো হয়ে শিয়ালদহ বৌবাজারের কাছে লবণ হ্রদে গিয়ে পড়ত। কলকাতার প্রাচীন মানচিত্র থেকে খালটার এই গতিপথ নির্ণয় করা হয়েছে। নিউ সেক্রেটারিয়েট বিলডিং-এর সামনে খালটার উত্তরদিকে শেঠ বসাক পরিবারের রাসবিহারী শেঠের বাড়ি ছিল। ক্রীক রো অঞ্চলের বাসিন্দারা ওই খালটার জল ব্যবহার করত। ওই খালটায় নামবার জন্য অনেক বাড়ির সঙ্গে সংলগ্ন যে সিঁড়ি ছিল, তার ভগ্নাবশেষ বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত কলকাতার প্রাচীন লোকেরা দেখেছে।

এই খালটা রীতিমত নাব্য ছিল, কেননা সমসাময়িক বিবরণীতে আমরা পড়ি — 'large boats could come up it'. ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ঝড়ে এই খালটায় অনেক বড় বড় নৌকা ডুবে গিয়েছিল, যা থেকে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দক্ষিণ অঞ্চলের নাম হয়েছিল 'ডিঙ্গাভাঙ্গা'।

খালটা লবণ হ্রদে যেখানে গিয়ে পড়েছিল, সেখানেই ছিল বৈঠকখানার সেই পৌরাণিক বৃক্ষটি, যার তলায় বলা হয় জোব চার্ণক বসে তামাক খেতেন। তা থেকেই নাকি জায়গাটার নাম হয়েছিল বৈঠকখানা। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দেও গাছটা ছিল এবং ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আপজনের মানচিত্রে জায়গাটা দেখানো হয়েছে।

এই সম্পর্কে যে প্রশ্নটা স্বাভাবিকভাবে মনে জাগে, তা হচ্ছে সুতানটি-হাটখোলা থেকে জোব চার্ণক শিয়ালদহ বৌবাজারের মোড়ে লবণহ্রদের ধারে গাছতলায় কেন তামাক খেতে যেতেন? কলকাতার কোন ইতিহাসকারই এ প্রশ্নের উত্তর দেন নি। সেজন্য মনে হয় এ প্রশ্নটার উত্তর এখানে দেওয়া প্রয়োজন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষমুহূর্ত পর্যন্ত পূর্বদেশের পণ্যবাহী নৌকাসমূহ লবণ হ্রদ অতিক্রম করেই কলকাতায় আসত। ভেবে দেখা যেতে পারে যে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতেও তাই করত। এই সব পণ্যবাহী নৌকাসমূহ কলকাতার ওই প্রাচীন খাল দিয়েই ভাগীরথীতে এসে পড়ত এবং বেতোরের পর্তুগীজ বণিকদের কাছে তাদের মাল বেচত। ইংরেজরা কলকাতায় আসবার পরেও তারা এই পথেই কলকাতায় আসত। খানিকটা পথ এগিয়ে গিয়ে সস্তায় মাল গস্ত করা যায় বলেই, জোব জার্ণক বোধহয় বৈঠকখানার ওই গাছতলায় বসে তামাক খেতেন ও মাল গস্ত করতেন। এটাই মনে হয় এই ঘটনার সঙ্গত ব্যাখ্যা।

ভাগীরথীর যেখান থেকে খালটা শুরু হয়েছিল, তারই দক্ষিণে খালটার অপর পারে ছিল শেঠ-বসাকদের আবাদভূমি ও তাঁতশালা। তার পূবদিকে ছিল চৌরঙ্গীর বিরাট জঙ্গল। এই জঙ্গলের ভিতর দিয়েই ছিল কালীঘাটে তীর্থযাত্রীদের যাবার পায়ে হাঁটা পথ। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে হলওয়েল এই রাস্তার উল্লেখ করেছেন।

বোধ হয় ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ঝড়ের পর খালটা ভাঙ্গা ডিঙ্গিতে ভরতি হয়ে যাবার পর ওটা অনাব্য হয়ে পড়ে। তখনই খালটাকে বুজিয়ে ফেলা হয়। খালটা বুজিয়ে ফেলবার পর এর পাশের অঞ্চলেই কলকাতার ব্যবসাপাড়া গড়ে ওঠে। বর্তমান বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের তখন নাম ছিল কসাইটোলা। এটা বিস্তৃত ছিল ধর্মতলা স্ট্রীটের মোড় থেকে লালবাজারের মোড় পর্যন্ত। এই রাস্তার ওপর অনেকগুলি মাংসের দোকান ছিল, সেজন্যই এটাকে কসাইটোলা বলা হত।

কিন্তু শীঘ্রই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কসাইটোলাই কলকাতার বড় ব্যবসাকেন্দ্রে পরিণত হয়। কারণটা আর কিছুই নয়। আগে খালটা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল গোবিন্দপুরকে। গোবিন্দপুরে খালটার উত্তরদিক পর্যন্তই ছিল লোকালয়। লালদিঘির দক্ষিণে যেখানে এখন টেলিগ্রাফ অফিস অবস্থিত ওখানে একটা বাড়ি ছিল, যে বাড়িতে কোম্পানির ক্যালিকো প্রিন্টাররা বাস করত। এর আশেপাশে আরও কতকগুলো মাটির ঘর ও পাকা বাড়ি ছিল ও একটা পুষ্করিণী ছিল। ওর পূর্বদিকে ছিল কলেট সাহেব ও কর্নেল স্কটের বাড়ি। পশ্চিমে খানিকটা উঁচু ডাঙ্গা ছিল। তারপর ছিল বেলামী সাহেবের বাড়ি ও কোম্পানির আস্তাবল। আস্তাবলের পশ্চিমে ছিল ক্যাপটেন র‍্যানী, ক্যাপটেন ক্রেটন, মিস্টার উড ও মিস্টার স্মিথের বাড়ি। তারপর ছিল হাসপাতাল ও বারুদখানা ও তার পশ্চিমে ছিল কলকাতার প্রাচীন কবরস্থান। এখানেই পরে সেণ্ট জন চার্চ স্থাপিত হয়। এখন যেখানে মেটকাফ হল, ওখানে শেঠদের এক আবাসবাটী ছিল। এটা কোম্পানির প্রধান দালাল রামকৃষ্ণ শেঠের বাস্তুভিটা। তখন ওটা ভাড়া দেওয়া ছিল আরমতি সাহেবকে। রামকৃষ্ণ শেঠের বাড়ির দক্ষিণে ছিল রাসবিহারী শেঠ ও তার ভাইদের পরিত্যক্ত বাড়ি। বাঁকশাল স্ট্রীট ও হেস্টিংস স্ট্রীটের (তার মানে খাল ধারে) মধ্যে কলকাতার জমিদার হলওয়েল সাহেবের দুখানা বাড়ি ছিল।

এই হচ্ছে খালধারের উত্তদিকের চেহারা। এবার দক্ষিণ দিকের চেহারাটা দেখা যাক। খালের ওপারে (তার মানে দক্ষিণ দিকে।) শেঠ-বসাকদের আবাদভূমি ও তাঁতশালা ছাড়া, সমস্ত চৌরঙ্গী অঞ্চলটা ছিল বনজঙ্গলে আবৃত। ওই জঙ্গলের মধ্যে ছিল এক সাধুর আশ্রম ও মন্দির যেখানে আশ্রয় নিয়েছিল চেতুয়া বরদার বিতাড়িতা রানী অজিতাসুন্দরী।

খালটা বুজিয়ে দেবার পর, এই দুই অঞ্চলের মধ্যে আর কোন বিচ্ছিন্নতা রইল না। কলকাতার সঙ্গে চৌরঙ্গী অঞ্চল একাকার হয়ে গেল। ওই সময় থেকেই চৌরঙ্গীর জঙ্গলটা পরিষ্কার করা শুরু হয়। সমসাময়িক বিবরণী থেকে আমরা জানতে পারি যে চৌরঙ্গী অঞ্চলে দু-একখানা বাড়িও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ময়দানে নূতন দুর্গও নির্মাণ হয়ে গিয়েছিল। শহর এইভাবে দক্ষিণে এগিয়ে যাওয়ার ফলে সাহেবপাড়া এগিয়ে এল চীনাবাজার অঞ্চল থেকে কসাইটোলা পর্যন্ত। কসাইটোলার বড় রাস্তা ছাড়া,

আশপাশের অলিগলিগুলোতেও লোক বসবাস করতে শুরু করে দিল। সুতরাং নূতন সাহেবপাড়াকে কেন্দ্র করে কসাইটোলাতে যে একটা ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে উঠবে, তাতে কোন বিচিত্রতা নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে খবরের কাগজে যে সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন বেরুত, তা থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে কসাইটোলায় নানারকম দোকান প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের এক বিজ্ঞাপনে দেখি [illegible]নং কসাইটোলায় পিটার অগিয়ার অ্যাণ্ড বাটলার বন্দুকের কারবার করছে। এই কারবারটা উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ পর্যন্ত চালু ছিল। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস বেনেট নামে এক ব্যক্তি মেয়েদের কেশবিন্যাসের জন্য ১০নং ম্যাঙ্গো লেনে এক দোকান খোলেন। ম্যাঙ্গো লেনে জন মরিস নামে এক ব্যক্তি নীলচাষের অভিজ্ঞতা নিয়ে চাকুরীর সন্ধান করেন। অন্য কসাইটোলায় আলেকজাণ্ডার ওয়াট নামে এক ব্যক্তি জুতার দোকানের বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন।

এই সময় এসপ্লানেড (এসপ্লানেড তখন নূতন দুর্গের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল) সাহেব মেমেদের বেড়াবার স্থান ছিল। ১৭৯২-৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত আপজনের কলকাতার মানচিত্রে পরিদৃষ্ট হয় যে কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট তখন তৈরি হয়ে গেছে এবং পশ্চিমদিকে এবং সমান্তরাল রাস্তার ওপর অবস্থিত ছিল পুরানো পোস্ট অফিস। সেজন্যই এই রাস্তাটার নাম এখনও ওলড পোস্ট অফিস স্ট্রীট। কাউনসিল হাউস স্ট্রীটের শেষে এখন যেখানে ট্রেজারী বিল্ডিং ওখানেই ছিল গভর্ণরের বাড়ি। এক কথায় খালধার আর জলাভূমি ছিল না, হয়ে দাঁড়িয়েছিল সাহেব-সুবো ও গভর্নরের নিবাস-স্থল। বর্তমান রাজভবন তৈরী করেছিলেন ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে মারকুইস অভ ওয়েলেসলী। ওয়েলেসলীর ধারণা ছিল : 'India should be governed from a palace and not from a counting house, with the ideas of a prince, not with those of a retail dealer in muslins and indigo'.

## কি করে মহানগরী হল?

১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে জোব চার্ণক কলকাতায় এলেন তৃতীয় বার। তখন থেকেই কলকাতায় ইংরেজদের স্থায়ী বসবাস শুরু হল। তখন কলকাতা মানে তিনখানা পাশাপাশি গ্রাম, সুতানুটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুর। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা ১৬ হাজার টাকায় এই তিনখানা গ্রামের জমিদারী স্বত্ব কিনে নিয়ে কলকাতার জমিদার হয়। ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার কালেক্টর বা জমিদার একটা সমীক্ষা করান। ওই সমীক্ষায় দেখা যায়, কলকাতার তখন মোট আয়তন ছিল ৫০৭৭ বিঘা। এই ৫০৭৭ বিঘা জমির মধ্যে মাত্র [illegible] বিঘা ১০ কাঠায় ঘরবাড়ি ছিল। বাকি জমির ১৫২৫ বিঘায় ছিল ধানক্ষেত, ৪৮৬ বিঘায় বাগান বাগিচা, ২৫০ বিঘায় হত কলার চাষ। ১৮৭ বিঘায় তামাকের চাষ, ১৫০ বিঘায় তরিতরকারির চাষ, ৩০৭ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি, ১৬৭ বিঘা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির

এলাকাভুক্ত, ১১৬ বিঘায় ছিল রাস্তাঘাট, পুকুর, কুয়া ইত্যাদি, আর ১১৪৪ বিঘা পতিত জমি। এই হচ্ছে কলকাতার আদিরূপ। বলা বাহুল্য এ রূপটা হচ্ছে গ্রাম্যরূপ।

১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার জমিদারি কেনবার পর ইংরেজরা এখানে একটা দুর্গ নির্মাণ করে। দুর্গবিশিষ্ট জায়গায় বেশি নিরাপত্তা পাওয়া যাবে ভেবে অনেকেই কলকাতায় এসে বাস শুরু করে। ইংরেজরা তাদের জমি বিলি করে প্রজাস্বত্ব ভিত্তিতে। নির্ধারিত দিনের মধ্যে খাজনা না দিলে, জমি ক্রোক করা হত ও অপরকে বিলি করা হত। জমি পুনরুদ্ধারের কোনও অধিকার ছিল না। জমি অপরকে বেচবারও কোনও অধিকার ছিল না। ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার জনসংখ্যা ছিল ১২,০০০। আরমেনিয়ান ও পর্তুগীজরাই কলকাতার প্রাচীন অধিবাসী। আর ছিল এদেশী লোক। তারপর এসেছিল ইংরেজরা। এরা সকলেই ছিল বণিক। দেশী লোক যারা কলকাতায় এসে বসবাস করল, তারা অধিকাংশই এইসব বণিকদের দাসদাসী। আর ছিল পালকিবাহকের দল। ইংরেজরা যেসব চাকর-বাকর নিযুক্ত করল তারা হচ্ছে দারোয়ান, সরকার, পিওন, হরকরা, ছাতা বরদার, হুকা বরদার, খানসামা ইত্যাদি। এছাড়া ছিল ইংরেজদের কেরানি, ভকিল, গোমস্তা প্রভৃতির দল। এই ক্রমবর্ধমান জনতার নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য শহরে এল দোকানদার, মহাজন, নাপিত, পুরোহিত, ধোবা, মুনশি, ঠিকাদার, দালাল প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোক। শহরে এরা সবাই বসতি স্থাপন করল। তার জন্য তৈরি করল ঘরবাড়ি। ঘরবাড়ি তৈরির জন্য এল ঘরামি, রাজমিস্ত্রি ইত্যাদি। শহরের নানা জায়গায় স্থাপিত হল মুদির দোকান, তামাক ও গুলটিকের দোকান। এমন কি ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে শহরে দু'-খানা গাঁজার দোকান খোলবারও লাইসেন্স দেওয়া হল। গাঁজার দোকান ছাড়া শহরে 'আরক' নামে এক প্রকার তীব্র মদের দোকানেরও লাইসেন্স দেওয়া হল। দু'জন লাইসেন্স পেল বিবি ডোমিনগো অ্যাশ ও গোবিন্দ শুঁড়ি।

ইংরেজদের জমিদারী পরিচালনার ভার দেওয়া হল একজন কালেক্টরের ওপর। আর তাকে সাহায্য করবার জন্য নিযুক্ত করা হল একজন এদেশী কালেক্টর, নাম 'ব্ল্যাক কালেক্টর' বা 'কালা কালেক্টর'। তার মাহিনা ছিল চার টাকা। কিন্তু জুরে কী করে ? পিলেয় মেরে দিত। দুহাতে তারা ঘুষ নিত। একবার সহকারী কালেক্টর গোবিন্দরাম মিত্র কালেক্টরের মুখের ওপরই বলেছিল—'সহকারীদের এরূপ ঘুষ নেওয়ার অধিকার সব সময়েই আছে, কেননা, তাদের যা বেতন দেওয়া হয়, তাতে তাদের পদমর্যাদা বজায় রেখে চলা যায় না।' গঙ্গার ধারে কুমারটুলিতে গোবিন্দরামের বিরাট বসতবাড়ি ও নয়-চূড়াবিশিষ্ট এক কালী মন্দির ছিল। কালী মন্দিরের উচ্চতা ছিল বর্তমান শহিদ মিনারের চেয়েও বেশি। বিদেশীদের কাছে এটা ছিল কলকাতার দিকচিহ্ন। তারা এটাকে 'দি প্যাগডা' বলত। প্রথম সহকারী কালেক্টর নন্দরাম সেনও একটা বড় শিবমন্দির করেছিলেন।

১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দের কোম্পানির আয়ব্যয়ের খাতায় দেখা যায় যে তখন শহর কোতোয়ালের (বর্তমান পুলিস কমিশনারের পূর্বসূরি) মাহিনা ছিল চার টাকা ও প্রত্যেক পুলিশ রক্ষীর বেতন ছিল মাত্র দু'টাকা। ওই বছরে কোম্পানির গোমস্তার মাহিনা ছিল এক টাকা নয় আনা। কোম্পানির সেরেস্তার জন্য এক মাসে কাগজ কেনা হয়েছিল ছয় আনার ও কালি দু আনার।

শহরের অবস্থা ছিল খুবই অস্বাস্থ্যকর। কলেরা, জ্বর ও বসন্ত নিত্য লেগে থাকত। শহরে সাহেবদের জন্য একটা সুন্দর হাসপাতাল ছিল বটে, তবে সেখানে যারা যেত, তারা আর ফিরে আসত না।

আদালতও একটা ছিল, কিন্তু কোন জেলখানা ছিল না। চোর ও খুনীদের শাস্তি দেওয়া হত গঙ্গার ওপারে হাওড়ায় 'দ্বীপান্তর' করে। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা দিল্লির বাদশাহ্ ফারুকশিয়ারের কাছ থেকে ফরমান পাবার পর, ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় মেয়রস্ কোর্ট নামে এক আদালত স্থাপিত হয়। পরে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়। [illegible] ৫ আগস্ট তারিখে এখানেই অনুষ্ঠিত হয় প্রথম ব্রহ্মহত্যা, মহারাজ [illegible]। [illegible] ব্রহ্মহত্যার পাপ তাদের অর্সায় বলে, কলকাতার লোক সেদিন [illegible] আশ্রয় নিয়েছিল।

[illegible] সাহেবেরা খুব মিতব্যয়ী ও সংযমী ছিল। কিন্তু পলাশীর [illegible] তারা খুব বিলাসপরাণ হয়ে ওঠে। তারা তখন [illegible] কলকাতাকে তারা ভোগবিলাসের কেন্দ্র করে তোলে।

[illegible] যে সাহেবরাই খুব নিত তা নয়। এদেশী দেওয়ানরাও। তারাই কলকাতার [illegible] প্রতিষ্ঠাতা। তারা যে ঐশ্বর্যের মধ্যে হাবুডুবু খেতেন, তা [illegible] দিকে তাকালে বুঝতে পারা যাবে কোথা থেকে টাকা আসত তাদের [illegible]।

[illegible] খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় ১৭টা বাজার ছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল '[illegible]'। তার পরই সুতানটির বাজার। সুতানটির বাজার সপ্তাহে দুদিন বসতো—[illegible] ও রবিবার। লোহালক্কড়ের জিনিস থেকে আরম্ভ করে শাকসবজি, কাপড়, [illegible], মাছ, তেল, নুন, ঘি, সবকিছুই বিক্রি হত সুতানটির বাজারে। সেকালে [illegible] দাম খুবই সস্তা ছিল। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার বাজার দর ছিল—চাল [illegible] মণ, ডাল ২.৫০ মণ, ঘি ১৫.৪১ মণ, সরষের তেল ৮.৪৪ মণ, নুন ১.২৫ মণ, [illegible] ৩.৩৭ মণ, চিনি ৭.১৫ মণ, মিষ্টান্ন মেঠাই ১০.০০ মণ ও মোরব্বা ১৯.০০ টাকা [illegible]। [illegible] গোটা খাসির দাম ছিল এক টাকা।

[illegible] ভদ্র গৃহস্থের জীবনযাত্রা ছিল খুব সরল। বারমাসে তারা তের পার্বণ করত। [illegible] তারা গঙ্গাস্নান করত। মেয়েরা ছিল অসূর্যম্পশ্যা। তারা অন্তঃপুরেই থাকত। [illegible] কোন অন্তর্বাস ছিল না, তারা পাছাপেড়ে শাড়ি পরত। পুরুষরা পরত ধুতি, গায়ে [illegible] চাদর ও মাথায় বাঁধত পাগড়ি।

প্রথম একশ বছরের মধ্যে কলকাতার অনেক পরিবর্তন ঘটল। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে [illegible] হেস্টিংস্ গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হবার পর কলকাতা ভারতের রাজধানীর মর্যাদা পেল। কলকাতা এক জনবহুল শহর হল। ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার জনসংখ্যা ছিল ১২,০০০। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ৬০০,০০০। ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় আটখানা পাকাবাড়ি ও ৮,০০০ কাঁচাবাড়ি ছিল। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ৪৯৮ পাকাবাড়ি ও ১৪,৪৫০ কাঁচাবাড়ি ছিল। আগে সাহেবপাড়া ছিল বি-বা-দী বাগ ও চীনাবাজার অঞ্চলে। শতাব্দীর

শেষ দুই দশকে চৌরঙ্গী অঞ্চলে। আগে কলকাতায় ঘোড়ার গাড়ি ছিল না। ঘোড়ার গাড়ি চলতে থাকে হেস্টিংস-এর আমলে। দেশী লোকদের মধ্যে মহারাজ নবকৃষ্ণই প্রথম ঘোড়ার গাড়ি কেনেন। হেস্টিংস-এর আমলে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে চিঠিপত্তর পাঠাবার জন্য একটা ডাকবিভাগও খোলা হয়। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ঘোড়দৌড়েরও প্রচলন হয়। বাংলা হরফে বই ছাপাও হয়। তবে স্কুল কলেজ ছিল না। ছিল পাঠশালা, চতুষ্পাঠী, মকতাব ও মাদ্রাসা। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে হিকি প্রথম সংবাদপত্র 'গেজেট' প্রকাশ করেন। এদেশী লোকদের জন্য একটা হাসপাতালও (বর্তমান মেয়ো হাসপাতালের জনক) স্থাপিত হয়। একেবারে শতাব্দীর শেষে রাজভবনও নির্মিত হতে থাকে। তারপর প্রচেষ্টা চলে কলকাতাকে রূপান্তরিত করবার।

উনিশ শতকের প্রারম্ভ থেকেই লটারী করে কলকাতাকে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা হয়। ১৮০৫ থেকে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লটারীর টাকায় অনেক পুকুর কাটানো হয়। টাউন হল (১৮০৬-১৩) নির্মিত হয় ও বেলেঘাটা খালের সংস্কার করা হয়। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে একটা স্থায়ী লটারী কমিটি গঠিত হয় এবং তারাই প্রথম এক বৃহৎ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। এই কমিটির কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল কলকাতার সাহেব-পাড়াকে তৈরি করা। এটা তৈরি হয়েছিল ক্যামাক স্ট্রীট অঞ্চলের বস্তিগুলোকে উচ্ছেদ করে। তাছাড়া ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তারা তৈরি করেছিল ব্যাপারীটোলা (ওয়েলিংটন স্কোয়ার অঞ্চল), হেস্টিংস ও হেয়ার স্ট্রীট, ম্যাংগো লেন ও কসাই- টোলা, ক্রীক রো, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, কিড স্ট্রীট, উড স্ট্রীট, ইলিয়ট রোড, পার্ক স্ট্রীট ও চৌরঙ্গী অঞ্চল। গোলদিঘি বা কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলও তারা সুসংস্কৃত করেছিল। ময়রা স্কোয়ার থেকে বৌবাজার পর্যন্ত একটা নূতন রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল, যার নাম দেওয়া হয়েছিল ওয়েলিংটন স্ট্রীট। তারপর ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের পর ওই রাস্তাটাকে সোজা টেনে আনা হয়েছিল (কলেজ স্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট) শ্যামবাজার পর্যন্ত চার্নকের রাস্তার (পরবর্তীকালের ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড) সঙ্গে মিলিত করবার জন্য? কলকাতায় এসময় পাকাবাড়ির তুলনায় মাটির বাড়ির সংখ্যাই ছিল বেশি।

ইতিমধ্যে বেসরকারী উদ্যোগে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী উদ্যোগে সংস্কৃত কলেজ ও ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নির্মিত হয়। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে স্ত্রীশিক্ষার জন্য নেটিভ ফিমেল স্কুল (পরবর্তীকালের বেথুন কলেজ) স্থাপিত হয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সরকার হিন্দু কলেজ অধিগ্রহণ করেন ও ওর নামকরণ করেন প্রেসিডেন্সী কলেজ। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্টকে রূপান্তরিত করে হাইকোর্ট স্থাপন করা হয়। ১৮৬২ থেকে ১৮৭২-এর মধ্যে বর্তমান হাই কোর্ট ভবন তৈরি করা হয়।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটকে বাড়িয়ে ধর্মতলা স্ট্রীটের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্যানিং স্ট্রীট, ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বিডন স্ট্রীট, ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রে স্ট্রীট ও ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে হ্যারিসন রোড নির্মিত হয়।

কলকাতার রাস্তায় জল দেওয়া শুরু হয়েছিল ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখ থেকে। প্রথম জল দেওয়া হয় চিৎপুর রোডে। তার কিছু পরেই কলকাতার রাস্তায় তেলের আলো জ্বালা হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ জুলাই থেকে গ্যাসের আলো ও ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ জুলাই থেকে কলকাতা শহরে পরিশোধিত জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। এর জন্য কতকগুলো জলাধার সৃষ্টি করা হয়। তারপর ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ মে তারিখ থেকে টালায় একটা পাম্পিং স্টেশন কার্যকর করা হয়। জল নিকাশের জন্য ১৮৬১-৭৫-তে কলকাতা মাটির তলায় ড্রেন পাইপ বসানো হয়। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা করপোরেশন গঠিত হবার পর থেকে কলকাতার রাস্তাঘাট ও ড্রেন সংস্কার, জল সরবরাহের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রাইমারী বিদ্যালয়, মিউনিসিপাল মার্কেট, পার্কগুলোর তদারকী করা ইত্যাদির ভার কলকাতা করপোরেশনের ওপরই ন্যস্ত আছে।

কলকাতায় ঘোড়ার ট্রামের প্রবর্তন হয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী থেকে। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর থেকে ট্রাম টানবার জন্য ঘোড়ার বদলে বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হয়। ১৮৯৬ সাল থেকে কলকাতায় মোটর গাড়ির প্রচলন হয় ও ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রিকশ গাড়ির। ১৯২৪ থেকে কলকাতায় বাস সারভিসের প্রবর্তন হয়। কলকাতায় বাইসাইকেল চলেছিল ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। টেলিগ্রাফের প্রবর্তন হয়েছিল ১৮৫২ থেকে, টেলিফোনের ১৮৭৭ থেকে, ইলেকট্রিসিটি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে, বেতারবাণী ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ও টেলিভিশন ১৯৫৭ থেকে। চক্র রেল ও পাতাল রেল চালু করা হল ১৯৮৬-৮৭ সাল থেকে। কলকাতায় প্রথম ফুটপাত তৈরি হয় ১৮৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দে ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটে রাজভবনের সামনে। তারপর সব বড় রাস্তার ধারে। কলকাতার ফুটপাতগুলোকে সীমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো হয় প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময়।

কলকাতায় প্রথম মিউনিসিপাল মার্কেট খোলা হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারী তারিখে চৌরঙ্গীর লিণ্ডসে স্ট্রীট ও বার্টরাম স্ট্রীটের সংযোগস্থলে। নূতন বাজার বলে একে নিউ মার্কেট বলা হয়। কলকাতায় এখন আরও আটটা মিউনিসিপাল মার্কেট আছে। শবদাহের জন্য কলকাতায় চারটা ঘাট আছে—কাশীপুর, বাগবাজার, নিমতলা ও কেওড়াতলায়। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ আগস্ট তারিখে কলকাতায় প্রথম ইলেকট্রিক ক্রিমেটরিয়ামের উদ্বোধন হয় কেওড়াতলায়।

কলকাতাকে মহানগরীতে পরিণত করার কাজ প্রধানত শুরু হয় ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট অ্যাকট পাশ হবার পর। প্রথম তৈরি করা হয় শহরের বুক চিরে একটা বড় রাস্তা (এখনকার চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যু)। পরে ওই রাস্তা বিস্তৃত করে তৈরি করা হয় যতীন্দ্রমোহন অ্যাভেন্যু ও গিরিশ অ্যাভেন্যু। চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যু ও যতীন্দ্রমোহন অ্যাভেন্যুর সংযোগস্থল থেকে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় পর্যন্ত তৈরি করা হয় ভূপেন বোস অ্যাভেন্যু। পূর্বদিকে শ্যামবাজার ব্রিজ রোড বিস্তৃত করে নাম দেওয়া হয় আর, জি, কর রোড। পূর্বদিকে এক কচুরিপানাপূর্ণ জলাভূমি ভরাট করে তৈরি করা হল রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট। উত্তর থেকে দক্ষিণে যেমন রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট তৈরি হল, পশ্চিম থেকে

পূর্ব দিকেও কয়েকটা রাস্তা তৈরি করা হল। একটা গ্রে স্ট্রীট থেকে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট পর্যন্ত নাম বি. কে. পাল অ্যাভেন্যু। আর একটা পোস্তার মোড় থেকে পূর্ব দিকে সিমলা ভেদ করে মানিকতলার খালের ওপার পর্যন্ত। এর এক অংশের নাম হল বিবেকানন্দ রোড ও অপর অংশের নাম মানিকতলা মেন রোড। আরও একটা রাস্তা মিশন রো থেকে ওয়েলিংটন স্কোয়ার পর্যন্ত, নাম দেওয়া হল মিশন রো এক্সটেনশন ও গণেশ অ্যাভেন্যু। ওদিকে এন্টালী ও পার্ক সার্কাস অঞ্চলকে ভেঙে তছনছ করে ফেলা হল। ওদিকটার নূতন রূপ দেওয়া হল এবং পূর্বদিকে ভি. আই. পি. রোড নামে এক নূতন রাস্তা নির্মাণ করা হল। কিন্তু সবচেয়ে বড় কাজ যা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট করল, সেটা হচ্ছে শহরের দক্ষিণে হোগালা বন কেটে একটা সম্পূর্ণ নূতন অভিজাত পল্লী সৃষ্টি। এই নূতন পল্লীর হৃৎপিণ্ডের ভিতর যে রাস্তাটা তৈরি করা হল, তার নাম দেওয়া হল রাসবিহারী অ্যাভেন্যু এবং শীঘ্রই এ রাস্তায় ট্রাম চলাচল শুরু হল। বড় একটা হল 'লেক' তৈরী করা হল, এবং তার সঙ্গে সংযোগ করা হল লেক রোড। তারপর তৈরি করা হল শহরের সবচেয়ে চওড়া রাস্তা সাদার্ন অ্যাভেন্যু। বস্তুতঃ ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট যে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করল, তার ফলে শহরের চেহারাটা সম্পূর্ণভাবে বদলে গেল।

কলকাতার পাকা বাড়িগুলো আগে পশ্চাদগামী হত, একটা মহলের পর আর একটা মহল। নিমাই মল্লিকের ছিল সাত মহল বাড়ি। এখন বাড়িগুলো তৈরী হয় উর্ধগামী। এক তলের ওপর আর এক তল। চ্যাটার্জি ইনটারন্যাশনালের বাড়ি হচ্ছে ২৪-তল।

এখন কলকাতাকে মহানগরীতে পরিণত করবার দায়িত্ব নিয়েছে কলিকাতা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, সংক্ষেপে আমরা যাকে বলি সি. এম. ডি. এ।

## ৩০০ শিয়ালদহের যুদ্ধ

ইংরেজদের সঙ্গে ঝগড়া করে নবাব সিরাজদ্দৌল্লা দু বার কলকাতা আক্রমণ করেছিল। কলকাতা সম্বন্ধে যেসব বই প্রকাশিত হয়েছে, সেসব বইয়ের অধিকাংশতেই সিরাজের এই দুই আক্রমণ সম্বন্ধে ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। এই দুই আক্রমণের ঘটনাবলী পরস্পরের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। সেজন্য মনে করি এ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পরিবেশনের প্রয়োজন আছে।

সিরাজের কলকাতা আক্রমণের কারণটা আগে বলে নিই। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দি খান-এর মৃত্যুর পর, তাঁর দৌহিত্র সিরাজদ্দৌল্লা বাঙলার নবাব হয়। গোড়া থেকেই ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ঘটে। বিরোধের কারণ, আলিবর্দি খান জীবিত থাকা কালে ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠিতে তাঁকে প্রবেশ করতে না দেওয়া, তাঁর অভিষেককালে প্রথানুযায়ী ইংরেজ কর্তৃক তাঁকে উপঢৌকন পাঠিয়ে অভিনন্দিত না করা, রাজা রাজবল্লভের বিরুদ্ধে অভিযোগ কালে ইংরেজগণ কর্তৃক তাঁর পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে

আশ্রয় দান, বাণিজ্য-সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার করা ও নবাবের আদেশের বিরুদ্ধে কলকাতার দুর্গ সুদৃঢ় করবার প্রয়াস। ইংরেজদের শায়েস্তা করবার জন্য নবাব প্রথম কাশিমবাজার কুঠি লুণ্ঠন ও অধিকার করেন। এরপর তিনি কলকাতা আক্রমণ করবার উদ্যোগ করেন।

সিরাজ কলকাতায় আসছে শুনে ইংরেজরা কলকাতাকে সুরক্ষিত করবার চেষ্টা করে। তিনটা তোপমঞ্চ বা ব্যাটারি স্থাপন করা হয়। তার মধ্যে একটা হচ্ছে বাগবাজারে পেরিনস্ পয়েণ্ট-এ। এখানেই নবাববাহিনীর সঙ্গে ইংরেজদের প্রথম সংঘর্ষ হল। কিন্তু ইংরেজরা নবাববাহিনীকে এখানে আটকাতে পারল না। চিৎপুরের রাস্তা ধরে নবাববাহিনী দুর্গের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। দুধারের বাড়িতে তারা আগুন লাগিয়ে দিল। সেগুলো লুণ্ঠন করল। বড়বাজার সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করল। নবাববাহিনী কর্তৃক ইংরেজরা তিনদিক থেকে আক্রান্ত হল। একমাত্র ভাগীরথীর দিকটাই ইংরেজদের পক্ষে মুক্ত ছিল। দুর্গের অভ্যন্তরস্থ লোকরা ভীতিগ্রস্ত হয়ে দুর্গের পিছনের পথ দিয়ে ১৯ জুন ১৭৫৬ তারিখে ভাঁটার স্রোতে জাহাজে করে ফলতায় পালিয়ে গেল। মাত্র কয়েকজন সাহসী লোক জমিদার জেফানিয়া হলওয়েলের নেতৃত্বে দুর্গের মধ্যে রয়ে গেল। ২০ জুন তারিখের সন্ধ্যা পর্যন্ত হলওয়েল শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সক্ষম না হয়ে আত্মসমর্পণ করলেন।

নবাব কলকাতা দখল করে এর নাম পরিবর্তন করে 'আলিনগর' রাখলেন, এবং এর শাসনভার দিলেন রাজা মাণিক চাঁদ নামে একজন হিন্দু শাসকের ওপর।

কলকাতার পতনের পর এক দ্রুতগামী জাহাজ এই বিপর্যয়ের খবর মাদ্রাজে নিয়ে গেল। চারমাস পরে ১৬ অক্টোবর তারিখে ক্লাইভ ও ওয়াটসন কলকাতার দিকে রওনা হল পাঁচখানা যুদ্ধের জাহাজ নিয়ে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী তারিখে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে আবার ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীয়মান হল।

নবাব এক বিরাট বাহিনী নিয়ে আবার কলকাতার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। হুগলির কাছে নবাবের বাহিনী ভাগীরথী অতিক্রম করে দমদমের দিক দিয়ে কলকাতা আক্রমণ করবার জন্য এগুতে লাগল। দমদমের রাস্তা যেখানে শহরে এসে প্রবেশ করেছে তার নিকটেই ছিল কলকাতার তৎকালীন দুই বিরাট ধনী গোবিন্দরাম মিত্র ও উমিচাঁদ-এর বাগান বাড়ি। নবাব উমিচাঁদের বাড়িতে তাঁর ছাউনি করে, মারাঠা খাতের পশ্চিম দিকে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে রেখে দিলেন। নবাব তাঁর সৈন্যবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন দেখে ক্লাইভও এক দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি প্রথম নবাবের বিচ্ছিন্ন সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করে তাদের মনে ত্রাস জাগিয়ে তারপর গণ্ডগোলের মধ্যে নবাবকে আক্রমণ করবেন ঠিক করলেন। যদিও পরে তিনি এই পরিকল্পনার কিছু পরিবর্তন করেছিলেন, তবুও মোটামুটিভাবে এই পরিকল্পনাটাকেই ১৭৫৭ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী তারিখে কার্যকর করে কলকাতার শেষ যুদ্ধে জয়লাভ করেন।

প্রথম বার নবাব চিৎপুরের রাস্তা ধরে এসেছিলেন বলে ক্লাইভ তাঁকে প্রতিহত

করবার জন্য কাশীপুরে (বর্তমান কাশীপুর রোড ও গান ফাউণ্ডারী রোডের সংযোগস্থলে) একটা পরিখা কেটে কিছু ইউরোপীয় ও ৩০০ সিপাহী দ্বারা সংরক্ষিত একটা শিবির ও তোপমঞ্চ স্থাপন করেছিলেন।

এ সংবাদ পেয়েই নবাব চিৎপুরের রাস্তা পরিহার করে দমদমের রাস্তা ধরেছিলেন।

কাশীপুরের শিবির থেকে ক্লাইভ ৫ ফেব্রুয়ারী তারিখে কুয়াশার মধ্যে নবাবের বাহিনীকে অতর্কিতে আক্রমণ করবেন বলে সামনে ও পিছনে ৪৯০ টি করে এদেশীয় সিপাহী ও মাঝখানে ৬৫০ জন ইউরোপীয় পদাতিক ও ১০০ জন গোলন্দাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে ক্লাইভের বাহিনী শত্রুবাহিনীকে অতর্কিতে আক্রমণ করে। শত্রুবাহিনী কিছু গুলি ছুঁড়বার পর ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তারপর ক্লাইভ যখন খাতের ওধারে উমিচাঁদের বাড়ির সামনে আসেন, তখন শত্রুপক্ষের তরফ থেকে এক ভীষণ প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। কিন্তু নাবব-বাহিনীর ওপর গোলাবর্ষণ করায় তারা আবার ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। ক্লাইভের মতলব ছিল যে উমিচাঁদের বাড়ির দক্ষিণে খাতের ওপর যে সেতু ছিল, সেই সেতু অতিক্রম করে সিরাজের মূল ঘাঁটি আক্রমণ করবেন। কিন্তু কুয়াশার অন্ধকারে ক্লাইভ লক্ষ্য করেন নি যে খাতের ওধারে শত্রুপক্ষের দুটো কামান বসানো ছিল। তা থেকে শত্রুপক্ষ গোলাবর্ষণ করতে থাকে। তখন ক্লাইভ ক্ষিপ্রগতিতে ওর আরও দক্ষিণে অবস্থিত পরবর্তী সেতু অতিক্রম করে নবাবের শিবিরে আসবার চেষ্টা করেন। সেই সেতুটি ছিল বর্তমান বৌবাজারের নিকটে। কিন্তু সেখানেও তাঁকে শত্রুপক্ষীয় কামানের গোলাবর্ষণের সম্মুখীন হতে হয়। ক্লাইভ যাতে না সেতু অতিক্রম করে খাতের ভিতরের দিকে আসতে পারে, সেটা সাধন করাই নবাববাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সে উদ্দেশ্য তাদের ব্যর্থ হয়। অসীম সাহসের সঙ্গে ক্লাইভবাহিনী নবাববাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও নবাববাহিনীর একটা কামান কেড়ে নেয়। নবাববাহিনীর সঙ্গে শেষ যুদ্ধ হয় শিয়ালদহের কাছে। সে যুদ্ধে নবাববাহিনী হেরে গিয়ে পালিয়ে যায়। নবাবও পালিয়ে গিয়ে দমদমের নাগের বাজারের শিবিরে আশ্রয় নেন।

## কলকাতার বেগম

ময়ূরের মতন পেখম মেলে, দুর্দান্ত দাপটের সঙ্গে এই শহরের সামাজিক জীবনে বিজয় নাচন নেচে গেছেন 'কলকাতার বেগম'। অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে, চার চারবার বিয়ে করে ও পাঁচ সন্তানের জননী হয়ে এই মহিলা বেঁচেছিলেন ৮৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত। কোনদিন নিভে যেতে দেননি তাঁর জীবনের রঙিন আলো। স্তব্ধ হতে দেননি তাঁর সবুজ মনের গতি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আসর জমিয়ে গেছেন তিনি তাঁর গঙ্গার ধারের প্রাসাদোপম বাড়ির বৈঠকখানায়। দেশী কায়দায় বিছানো ফরাসের ওপর তাকিয়া হেলান দিয়ে, গড়গড়া টানতে টানতে গল্প করতেন তাঁর রামধনু-রঙে রাঙানো দীর্ঘ জীবনের কাহিনী। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতো কলকাতার বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকরা। আদর-আপ্যায়নের তিনি ছিলেন প্রতীক। সকলের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন ভালবাসা,

সম্মান ও মর্যাদা। কলকাতার লোক যে তাঁকে কতটা ভালবাসত তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল তাঁর মৃত্যুর সময়। তাঁর শবানুগমন করেছিলেন কলকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, কলকাতা কাউনসিলের সদস্যবৃন্দ, সুপ্রীম কোর্টের জজেরা, এমন কি ছ'ঘোড়ার গাড়িতে চেপে আনুষ্ঠানিকভাবে তৎকালীন বড়লাট লর্ড মিন্টো। কেল্লার একদল রেজিমেণ্টও সঙ্গে গিয়েছিল! তার আগে কলকাতার ইতিহাসে কোনদিন অনুষ্ঠিত হয়নি এমন রাজকীয়ভাবে কোন নাগরিকের শেষকৃত্য।

'কলকাতার বেগম' কিন্তু প্রকৃত ছিলেন না কোন নবাবের ঘরণী। বন্ধুত্ব ছিল তাঁর সিরাজের দিদিমা নানী বেগমের সঙ্গে। তিনি তাঁর মজলিসে বসে খোশগল্প করবার সময় [illegible] করতেন নানী বেগমের নাম। সে জনাই কলকাতার লোকরা গুণ- [illegible] তাঁকে অভিধা দিয়েছিলেন 'বেগম'।

[illegible] এই মহিলার জন্ম হয় মাদ্রাজে। আর ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের [illegible] তাঁর মৃত্যু হয় কলকাতায়। ইংরেজ আমলের এই ৮৭ বৎসরের ইতিহাস এবং ওই সময়কালের মধ্যে কলকাতা শহরের বিরাট পরিবর্তন পরিব্যাপ্ত [illegible] তাঁর জীবনকালকে। অতীতের মূককণ্ঠকে ভাষার যাদুতে রূপান্তরিত করবার জন্য যে উপাদানের প্রয়োজন, তার অভাব ছিল না তাঁর। ক্লাইভ থেকে মিন্টোর আমল পর্যন্ত এই দীর্ঘকালের ইতিহাস তাঁর নখদর্পণে ছিল। আলিবর্দি খান ও সিরাজকে তিনি [illegible] দেখেছেন, সিরাজের দিদিমা নানী বেগমের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্প্রীতি ছিল, বর্গী হাঙ্গামার সময় বাঙলার লোককে সন্ত্রস্ত হতে দেখেছেন, ক্লাইভ ও ওয়াটসনের সঙ্গে আলাপ করেছেন, হোলকার, সিন্ধিয়া ও মারাঠাদের গৌরব রবির অস্তাচল দেখেছেন, নন্দকুমারের ফাঁসি দেখেছেন, বাঙালী বড়লোকদের বাড়ী দুর্গোৎসব ও অন্যান্য পাল পার্বণের ঘটা দেখেছেন, ফ্রানসিসের সঙ্গে হেষ্টিংসকে ডুয়েল লড়তে দেখেছেন, নীলকুঠির পত্তন দেখেছেন, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মর্মান্তিক ক্রন্দন শুনেছেন, ছাপাখানার [illegible] দেখেছেন, ব্যাঙ্ক ও ইনস্যুরেন্স কোম্পানির প্রতিষ্ঠা দেখেছেন, শহরে ঘোড়ার গাড়ীর প্রচলন দেখেছেন, রাজভবন ও টাউন হল তৈরী হতে দেখেছেন, ময়[illegible]ন নূতন দুর্গ নির্মাণ দেখেছেন, এসব ঘটনার তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী। এক কথায়, মজলিস [illegible] মালমশলা সব সময় তাঁর জিহ্বাগ্রে ছিল।

'কলকাতার বেগম'-এর দীক্ষিত নাম ছিল ফ্রানসেস। পিতা ছিলেন মাদ্রাজে অবস্থিত ফোর্ট সেন্ট ডেভিড দুর্গের গভর্নর। নাম এডওয়ার্ড ক্রুক। ফ্রানসেস ছিল তাঁর দ্বিতীয় কন্যা। পিতাকে বৃত করতে চেয়েছিল কোম্পানি বাহাদুর মাদ্রাজের ফোর্ট সেণ্ট জর্জের [illegible] গভর্নর হিসাবে। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তিনি ওই পদ, বার্ধক্য ও স্বাস্থ্যের কারণে। অবসর নিয়ে চলে গিয়েছিলেন ইংলণ্ডে, ছেলেমেয়েদের রেখে গিয়েছিলেন ভারতে।

ফ্রানসেস চলে আসেন কলকাতায়। উনিশ বছর বয়সে ৩ নভেম্বর ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বিয়ে করেন তৎকালীন বাঙলার গভর্নরের ভাই বা বোনের ছেলে প্যারী পারপল টেম্পলারকে। এই স্বামীর ঔরসে তাঁর দুটি পুত্র হয়, কিন্তু দুটিই মারা যায় শৈশবে! [illegible] স্বামীদের গোড়াতেই তিনি বিধবা হন। মাত্র ন'মাস পরে ২ নভেম্বর ১৭৪৮

খ্রীষ্টাব্দে আবার বিবাহ্ করেন জেমস আলথেন নামে এক ব্যক্তিকে। বিয়ের দশ দিন পরেই মারা যান তাঁর দ্বিতীয় স্বামী বসন্ত রোগে। তারপর আবার বিবাহ্ করেন কলকাতা কাউনসিলের জ্যেষ্ঠতম সদস্য উইলিয়াম ওয়াটসকে। এবার বোধ হয় শিখেছিলেন বাংলা ভাষা; কেননা, ওয়াটস সাহেব ভাল বাংলা বলতে পারতেন।

এই উইলিয়াম ওয়াটস-ই কোম্পানির কাশিমবাজার কুঠির অধিকর্তা নিযুক্ত হন। আলিবর্দি খান তখনও জীবিত। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দি খানের মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র সিরাজদৌল্লা যখন কাশিমবাজার কুঠি অবরোধ ও লুণ্ঠন করেন, স্ত্রী ও তিন নাবালক পুত্রকন্যা সহ (কন্যা এমেলিয়ার বয়স ছয়, পুত্র এডওয়ার্ডের বয়স চার ও কনিষ্ঠা কন্যা সোফিয়া এক বছরের শিশু) ওয়াটস সাহেব বন্দী হন। শ্রীমতী ওয়াটস ও তাঁর তিন সন্তানকে রাখা হয় সিরাজের দিদিমা নানী বেগমের অভিভাবকত্বে। সিরাজ যখন কলকাতা আক্রমণে ব্যস্ত, নানী বেগম তখন শ্রীমতী ওয়াটস ও তাঁর ছেলেমেয়েদের সুপ্রহরায় পাঠিয়ে দেন চন্দননগরে ফরাসীদের কাছে। চন্দননগরের ফরাসী কর্তৃপক্ষ তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানায়।

কলকাতা আক্রমণের পর সিরাজ যখন মুরশিদাবাদে প্রত্যাগমন করেন, তখন তিনি ওয়াটস সাহেব ও অন্যান্য ইংরেজ বন্দীদের মুক্তি দেন। এটা নাকি নানী বেগমের আদেশেই ঘটেছিল।

পরের বছর ইংরেজরা যখন কলকাতা শহর পুনরুদ্ধার করে ও সিরাজের সঙ্গে একটা সাময়িক সন্ধি হয়, ওয়াটস সাহেবকে তখন মুরশিদাবাদের নবাব দরবারে রেসিডেণ্ট করে পাঠানো হয়। এ সময় ওয়াটস সাহেবকে যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে মুরশিদাবাদে থাকতে হয়েছিল। কারণ, ক্লাইভের সঙ্গে সিরাজের আপস-মীমাংসা সম্পর্কিত আলোচনার সময় তাঁকে প্রায়ই সিরাজের রোষে পড়তে হচ্ছিল। অবস্থা বিপজ্জনক দেখে ওয়াটস সাহেব গোপনে মুরশিদাবাদ থেকে পালিয়ে আসেন। তারপর পলাশীর যুদ্ধ উদ্বোধন করে বাঙলায় ইংরেজ আধিপত্যের সূত্রপাত। এসব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন শ্রীমতী ওয়াটস। এ ঘটনাগুলিকেই তিনি তাঁর বর্ণালী ভাষায় বর্ণনা করে যেতেন তাঁর ক্লাইভ স্ট্রীটের অদূরে গঙ্গার ধারে অবস্থিত বৈঠকখানায়।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াটস সাহেব তাঁর পরিবারবর্গকে নিয়ে বিলাত চলে যান, এবং পরে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। দীর্ঘকাল ভারতে থাকার দরুন, শ্রীমতী ওয়াটস রপ্ত করে ফেলেছিলেন ভারতের আচার-ব্যবহার। ইংলণ্ডে তার অভাব দেখে, ইংলণ্ডে থাকতে তাঁর মন টিকল না। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন। ভারতে ফেরবার আগে তিনি বিলাতে তাঁর দুই মেয়ের বিবাহ দিলেন ও পুত্রকে প্রতিষ্ঠিত করে এলেন। তাঁর বড় মেয়ের ছেলেই ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন ১৮১২ থকে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

৪৯ বৎসর বয়সে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় আবার বিয়ে করলেন সেণ্ট জন চার্চের অন্যতম প্রধান যাজক রেভারেণ্ড উইলিয়াম জনসনকে। বোধ হয়, পাদরী সাহেবের সঙ্গে তার বিবাহটা মধুর হয়নি। কেননা, এর কয়েক বছর পরে পাদরী জনসন যখন বিলাতে গেলেন, 'কলকাতার বেগম' তখন অস্বীকৃত হলেন তাঁর সঙ্গে যেতে, এবং কলকাতাতেই থেকে গেলেন।

গঙ্গার ধারে তাঁর প্রাসাদপুরীর বৈঠকখানায় সন্ধ্যার পর বসালেন তিনি কলকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মনোরঞ্জনের জন্য এক বেশ গুলজারী আসর। তাঁর মর্যাদাপূর্ণ অতিথি-সৎকার ছিল প্রশংসাতীত। ফরাসের ওপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ও ক্রীতদাসীদের দ্বারা পরিবৃতা হয়ে,গড়গড়া থেকে তামাক টানতে টানতে, অভ্যাগতদের শুনাতেন তিনি পুরানো কলকাতার অজস্র রঙীন কাহিনী। সেণ্ট জন গির্জায় তখন সমাধি দেওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলীর কাছ্ থেকে তিনি অনুমতি পেয়েছিলেন যে ওখানেই্ তাঁর সমাধি হবে। যদিও ওয়েলেসলী চলে যাবার পর লর্ড মিণ্টোর আমলে তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল, তা হলেও তিনি ওয়েলেসলী প্রদত্ত অনুমতি থেকে বঞ্চিত হননি। সেণ্ট জন গির্জায় তাঁর সুন্দর সমাধিস্তম্ভের ওপর লেখা আছে—

'The oldest British resident in Bengal universally beloved, respected and revered.'

## ৩০ কলকাতার বাবু-কালচার

বাবু-কালচারটা কি, এবং এই কালচারের নায়কদের কি কি লক্ষণ ছিল, তার একটা অনুপম বর্ণনা দিয়ে গেছেন শিবনাথ শাস্ত্রী। বাবু সমাজ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, "তাঁহারা পারসী ও স্বল্প ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে আস্থাহীন হইয়া ভোগে সুখেই দিন কাটাইত। ইহাদের বহিরাকৃতি কি কিছু বর্ণনা করিব? মুখে, ভ্রূপার্শ্বে ও নেত্রকোণে নৈশ অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ কালিমারেখা। শিরে তরঙ্গায়িত বাবরি চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে ফিনফিনে কালো পেড়ে ধুতি। অঙ্গে অতি উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমরিকের বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনট করা উড়ানী ও পায়ে পুরু ব্যগলস সমন্বিত চীনেবাড়ীর জুতা। এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলের লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীণা ইত্যাদি বাজাইয়া, কবি হাফ আখড়াই, পাঁচালী প্রভৃতি শুনিয়া রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত, এবং খড়দহের মেলা, মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতির সময় কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগকে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিয়া আসিত।"

আগে বলেছি যে, এই বাবু সমাজের উদ্ভব কলকাতা শহরেই ঘটেছিল। ইংরেজরা যখন কলকাতায় এসে শহর প্রতিষ্ঠা করে, তখন তাদের সংস্পর্শে এসে যারা রাতারাতি বড়লোক হয়, তাদের প্রভাবেই 'বাবু-সমাজ' গড়ে উঠেছিল। 'বাবু সমাজ' নামটা দিয়েছিল গ্রামের লোকেরা। কেননা, বাবু সমাজের আচার-ব্যবহার, চিত্তবৃত্তি, বাক্‌কৌশল, বেশভূষা, পোষাক-আশাক ও 'জীবনযাত্রা প্রণালী চমক লাগিয়ে দিয়েছিল গ্রামের লোকদের। ধনপ্রাচুর্যের অভিমান-অহংকারের ওপরই এ সমাজের ওপরতলা প্রতিস্থিত ছিল। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কলিকাতা কমলালয়' বইয়ে কলকাতার বাবু সমাজের পয়সা উপায়ের নানারকম পন্থার উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন—'এরা বনিয়াদী বড় মানুষ নয়, ঠিকাদারী, জুয়াচুরি, পোদ্দারী, পরকীয়া রমণী সংঘটন ইত্যাদি পন্থা অবলম্বন করে বড়লোক হয়েছেন।'

মুখ্যত, দেওয়ানী ও বেনিয়ানগিরিই এদের পেশা ছিল। দেওয়ানী ছিল চাকরী বা গোলামী করা। মনিবের হয়ে তারা মনিবের ব্যবসা (প্রধানত লবণ ও আফিমের ব্যবসা) দেখতেন, জমিদারীর তদারকী করতেন, এবং ক্ষেত্রবিশেষে অন্য কাজকর্মের দায়িত্ব পালন করতেন। এক কথায়, দেওয়ানরাই ছিল মনিবের কর্মক্ষেত্রের প্রত্যক্ষ হর্তাকর্তা বিধাতা। দেওয়ানদের অর্থপ্রাচুর্যের বহর দেখে বেশ বুঝা যায় যে তারা চুরি-চামারী করে মনিবের টাকা রীতিমত ফাঁক করে দিত। আর, বেনিয়ানী ছিল, যাকে বলে মহাজনী কারবার। এরা বণ্ড লিখিয়ে নিয়ে সাহেবসুবোদের টাকা ধার দিত। বিলাসিতার জন্য সাহেবদের প্রায়ই টাকার দরকার হত, এবং সে সময় তারা বেনিয়ানদের শরণাপন্ন হত। ব্যবসার জন্য মূলধন নিয়োগই হউক, বা পণ্যদ্রব্য কেনাবেচার কারণেই হউক, সাহেবদের পদে পদে বেনিয়ানদের ওপর নির্ভর করতে হত। এরূপ টাকা ধার দেবার জন্য বেনিয়ানদের মাঝে মাঝে মার

পেতেও হত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধার দেওয়া টাকার অঙ্কটা সুদে আসলে এমনভাবে স্ফীত হয়ে উঠত যে তারা অল্পকালের মধ্যেই বড়লোক হয়ে দাঁড়াত। ভবানীচরণ এঁদের 'খানদানী বড় মানুষ নয়' বললেও, এরাই কলকাতা শহরের বনিয়াদী পরিবার-সমূহের প্রতিষ্ঠাতা হয়ে দাঁড়ায়। পদের ও ধনের গরিমা প্রদর্শন করাই এদের বৈশিষ্ট্য ছিল। এমন কি পূজাপার্বণও এদের কাছে ধনগরিমা প্রদর্শনের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। ভবাণীচরণ বলেছেন, 'কলকাতার দুর্গোৎসব দেবার্চনা না বলে, ঝাড় উৎসব, বাতি উৎসব, কবি উৎসব, বাই উৎসব, বিশেষ স্ত্রীর গহনা উৎসব ও বস্ত্রোৎসব বলিলেও বলা যায়।' এক একজন ছেলেমেয়েদের বিয়েতে বা বাপমায়ের শ্রাদ্ধে দু লক্ষ থেকে দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করত। অনেকে বারো মাসে তেরো পার্বণে ছেলেমেয়েদের বিয়েতেও একরূপ পরিমাণ অর্থ ব্যয় করত। পয়সা উপার্জনে ইংরেজদের অনুগ্রহলাভ করবার জন্য, তারা এইসব উৎসবে সাহেব-মেমদের নিমন্ত্রণ করত এবং সাহেবদের আপ্যায়নের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সুরাপান ও নিষিদ্ধ খানাপিনার ব্যবস্থা করত।

ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে 'বাবু সমাজ' আচারভ্রষ্ট হয়েছিল বটে, কিন্তু গোড়া থেকেই এরা এমন একটা কৌশল অবলম্বন করেছিল, যাতে এদের ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজের কেউ কিছু না বলতে পারে। এরা বড় বড় পণ্ডিতদের কলকাতায় এনে নিজেদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের দিয়ে টোল ও চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়েছিল। এই সকল পণ্ডিতদের বিধানের একটা নিদর্শন ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ জুলাই তারিখের 'সমাচার দর্পণ' এর অঙ্কে ছাপা হয়েছিল। 'বাবু জিজ্ঞাসা করেন, ভট্টাচার্য মহাশয় সুরাপানে কি পাপ আছে? ভট্টাচার্য কহেন সুরাতে পাপ হয় যে বলে, তাহার পাপ হয়। ইহার প্রমাণ আগম ও তন্ত্রের দুইটা বচন আওড়াইয়া দিলেন, পাঠ করিলেন এবং কহিলেন মদ্য ব্যতিরেকে উপাসনাই হয় না। বলরাম ঠাকুরও মদ্যপান করিয়াছিলেন। বাবু তুষ্ট হইয়া ভট্টাচার্যকে টোল করিয়া দিলেন।' ভবাণীচরণও একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এক বাঙ্গাল ব্রাহ্মণ বাবুকে উপদেশ দিচ্ছে যে পরদার ও যবনী বেশ্যা সম্ভোগে ও সুরাপানে পাপ হয়। কুলপুরোহিত শিরোমণি তাকে নির্বোধ বলে গালি দিয়ে বলছেন—'আগতা ভৈরবীচক্রে সর্ববর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ। পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। মাতৃযোনীং পরিত্যজ্য বিহরেৎ সর্বযোনিষু ইত্যাদি।''

শিবনাথ শাস্ত্রী বাবু সমাজের যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেটা বিশেষভাবে প্রযুক্ত এই সমাজের প্রতিষ্ঠাতাদের বংশধরদের ক্ষেত্রে। এই বংশধররা কিভাবে শিক্ষিত হতেন, তার একটা পরিচয় পাওয়া যায় 'সমাচার দর্পণ'-এর ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারী ও ৯ জুন তারিখের সংখ্যাদ্বয়ে প্রকাশিত 'বাবুর উপাখ্যান' থেকে। এই উপাখ্যানে বিবৃত হয়েছে, কলকাতায় একজন অতি বড় ধনবান কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রথমাবস্থায় তিনি নানা সাহেবদের ও কোম্পানীর সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত থেকে ধনোপার্জন করেছিলেন। তারপর তিনি সাহেবদের কুঠির দেওয়ানী কর্মে নিযুক্ত হন। কৃত্রিম অকৃত্রিম আফিম তৈরী করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। পুত্রের জন্মের সময় তিনি যথেষ্ট দানাদি করেন ও বাড়িতে

নামকরণের ব্যাপারে সভাসদ পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। কুলাচার্য বললেন, ইনি কুলীনের ঔরসে জাত আর কুলীনের নয় লক্ষণ যথা 'আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং। নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম' এই পুত্রের আছে, সেই হেতু এঁর নাম তিলকচন্দ্র রাখা হউক। কিন্তু প্রতিবাদের ঝড় তুলে বিদ্যালংকার বললেন, "আপনার এত ঐশ্বর্যে এ সন্তান হইয়াছে ইনি বাবু হইবেন। আমি গণনাদ্বারা অনুভব করিতেছি যে বাবুদের যে নয় লক্ষণ যথা—'ঘুড়ী তুড়ী জস দান আখড়া বুলবুলি মনিয়া গান। অষ্টাহে বনভোজন এই নবধা বাবুর লক্ষণ" এই পুত্রে রহিয়াছে অতএব ইহার নাম বাবু রাখা হউক। অতঃপর সমন্বয় করে বাবুর নাম রাখা হল তিলকচন্দ্রবাবু। তারপর পুত্র বড় হতে লাগল, কথা বলতে শিখল। তিলকচন্দ্র সকলকেই কটুবাক্য বলে ও মারে। তাকে দমন না করে, সকলেই তাতে আহ্লাদ করে। তিলকচন্দ্রবাবু কোন অপকর্ম করলে তাকে শাস্তি না দিয়ে চক্রবর্তী দেওয়ান শিখিয়ে দেন যে, 'তুমি কহ আমি করি নাই।' এইরূপে বাবুকে নিয়ে সর্বদাই আমোদ হয়। তখন তিনি 'বাবু' নামে খ্যাত হলেন, কেহ আর তিলকচন্দ্র বলে না। চক্রবর্তী বাবুকে লেখাপড়া শেখালেন না, বল্লেন 'বামুনের ছেলে গায়ত্রী শিখলেই যথেষ্ট, যা সম্পত্তি রেখে যাব যদি রক্ষা করে খেতে পার কখনও দুঃখ পাবে না। ভাবলেন 'পুত্রের অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হইবে, আমি দেখিতে আসিব না।' ষোল বছর বয়স হবার পর বাবুর অনেক মোসাহেব ও উমেদার জুটে গেল। এদিকে চক্রবর্তী দেওয়ানেরও দেহান্ত হল। বাবু তখন ধনাধিপতি হয়ে, নিজেই কর্তা হলেন। বাবু সমস্ত রাত্রি বেশ্যালয়ে থাকেন। দীনদুঃখী আত্মীয়-স্বজনেরা যদি বাবুর নিকট আসে, বাবু তাদের ইংরাজী ঘুষা মারেন এবং কহেন যে 'হামারা পিট্টল লে আও' এই প্রকার ভয়ানক শব্দ করেন, তাতে দীন দুঃখীরা পলায়ন করে। বাবু কেবলই স্ত্রীলোকের সন্ধানে থাকেন। সেজন্য বাবুর নিকট যদি কোন লোক আসিয়া কয় যে অমুক লোক এই প্রকার দায়গ্রস্ত। বাবু তৎক্ষণাৎ গাড়ি আরোহণ করিয়া তাহার বাটীতে গিয়ে কহেন যে, এ তোমার কোন দায়, আমি সকল উদ্ধার করিব কিন্তু এইক্ষণে কিছু অস্পষ্ট থাকহ আর বৈঠকখানায় কেন বসিয়াছ বাটীর ভিতর চল সেইখানেই পরামর্শ করিব। বাটীর ভিতর গিয়া মিথ্যা আশ্বাসবাক্যে আকাশের চন্দ্র হাতে দিয়া স্ত্রীলোক কোন দিকে থাকে তাহার অনুসন্ধান করেন এবং ঐ চেষ্টাতে প্রত্যহ যাতায়াত করেন।

তারপর 'বাবু কালচার'কে আশ্রয় করে কয়েকখানা বই লেখা হল। বইগুলি প্রকাশিত হল উনবিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে। বইগুলার নাম 'কলিকাতা কমলালয়', 'নববাবুবিলাস', 'নববিবি বিলাস' ও 'দূতীবিলাস'। সমষ্টিগতভাবে এই বইগুলিকে 'বাবু কালচার'-এর মহাভারত বলা যেতে পারে। বইগুলি সবই লিখেছিলেন স্বনামে ও বেনামে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

যেহেতু 'নববাবুবিলাস' হচ্ছে সমসাময়িক কালের বাবু কালচারের একখানা বিশ্বস্ত দর্পণ, সেজন্য ওতে বাবুর যে পরিচয় পাওয়া যায়; তা সংক্ষেপে এখানে বিবৃত করা হচ্ছে। বাবুর মোসাহেবরা বাবুকে উপদেশ দিচ্ছে—'শুন বাবু টাকা থাকিলেই হয় না। ইহার সকল ধারা আছে। আমি অনেক বাবুগিরি করিয়াছি এবং বাবুগিরি জারিজুরি

করিয়াছি এবং অনেক বাবুর সহিত ফিরিয়াছি, রাজা গুরুদাস, রাজা ইন্দ্রনাথ, রাজা লোকনাথ, তনুবাবু, রামহরিবাবু, বেণীমাধববাবু প্রভৃতি ইহাদিগের মজলিস শিখাইয়াছি এবং যেরূপে বাবুগিরি করিতে হয় তাহাও জানাইয়াছি। এক্ষণে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত তথাপি ইচ্ছা হয় তুমি যেরূপে উত্তম বাবু হও এমত শিক্ষা দিই।'

'প্রথম উপদেশ। যে সকল ভট্টাচার্যরা আসিয়া সর্বদা টাকা দাও, টাকা দাও, ঐ কথা বই আর অন্য কথা বলে না, তাহাদের কথায় কান দিবে না। আমার পিতার শ্রাদ্ধের সময় উহারা যখন কহিল, বাবু শ্রাদ্ধের কি করিব। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে শ্রাদ্ধের ফল কি? উহারা বলিল, পিতৃলোকের তৃপ্তি হয়। আমি বলিলাম, কোনকালেও শুনি নাই যে মরা গরুতে ঘাস জল খাইয়া থাকে। ভট্টাচার্য শেষে কহিল বাবুজী আর কিছু কর না কর, পিণ্ডদানটা করা আবশ্যক,তাহাতে আমি কহিলাম আজ আমি উত্তম বুদ্ধিমতী পরমধার্মিকা বকনাপিয়ারীর নিকট যাইব তাহারা যেরূপ পরামর্শ দিবে সেরূপ করিব। বকনাপিয়ারী আমাকে কহিল, 'তুমি এক কর্ম কর এক ব্রাহ্মণকে ফুরাইয়া দাও, শ্রাদ্ধ দশপিণ্ড ব্রাহ্মণ ভোজনাদি যত কর্ম সেই করিবেক। আমিও তাবত কর্ম ফুরাইয়া দিলাম। অতএব নির্বোধ ভট্টাচার্যেরা আগমন করিলে কদাচ আসিতে আজ্ঞা হয় বসিতে আজ্ঞা হয় এরূপ বাক্য বলিবে না, যদ্যপি কিঞ্চিৎ দিতে হয়, তবে কহিবা সময়ানুসারে আসিবে। এইরূপ মাসেক দুই প্রতারণা করিয়া কিঞ্চিৎ দিবা।'

(এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভবানীচরণ বকনাপিয়ারীকে 'বেশ্যাপ্রধানা' বলে বর্ণনা করেছেন। মনে হয় যে, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক 'ভাঁড়' 'সচিত্র গুলজারনগর' (সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সুলিখিত ভূমিকা ও টীকা সমেত সম্পাদন করেছেন) নামে যে ব্যঙ্গাত্মক নকসা করেছিলেন, তাতে তিনি ভবানীচরণের 'নববাবুবিলাস' থেকেই 'বকনাপিয়ারী'র নামটা আত্মসাৎ করেছিলেন। চিত্তরঞ্জনবাবু বা অন্য কারুর নজরে এটা পড়েনি।)

দ্বিতীয় উপদেশ। গাওনা বাজনা কিছু শিক্ষা কর যাহাতে জিউ খুশী থাকিবে এবং যত বারাঙ্গনা আছে তাহাদিগের বাটীতে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিয়া ঐ বারাঙ্গনা- দিগের সর্বদা ধনাদি দ্বারা তুষ্ট রাখিবে, কিন্তু যবনী বারাঙ্গনা সম্ভোগ করিবে; কারণ, তাহারা পেঁয়াজ রসুন আহার করে সেই হেতু তাহাদিগের সহিত সম্ভোগে যত মজা পাইবে এরূপ মজা কোন রাঁড়েই পাইবে না। যদি বল যবনী বেশ্যা গমন করিলে পাপ হইবে তাহা কদাচ মনে করিবে না। যাদের পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা থাকে তাহারাই উত্তম স্ত্রী সম্ভোগ করে। যদি বেশ্যা গমনে পাপ থাকিত, তবে কি উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি বেশ্যার সৃষ্টি হইত। তারপর পয়ার ছন্দে বললেন—'কর গিয়া বেশ্যাবাজি, যদি বল কর্ম পাজি, মন শুচি হলে পাপ নয়। যাহার যাহাতে রুচি, সেই দ্রব্য তারে শুচি, তার তাতে হয় সুখোদয়। অন্য অন্য সুখের সৃষ্টি, করি বিধি পরে মিষ্টি, করিলেন সুখের সৃজন। বেশ্যাকুচ বিমর্দন, যতনেতে আলিঙ্গন, আর তার শ্রীমুখ চুম্বন। বেশ্যার আলয়ে বাস, সহবাস দিবানিশি,তুমি বাবু কর আচরণ। ইহাতে অন্যথা কভু মনে না ভাবিবে বাবু, হবেক দুঃখ বিমোচন।' (এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সমসাময়িককালে রাজা রামমোহন

রায়ের এক যবনী রক্ষিতা ছিল। উমানন্দন ঠাকুরের এক প্রশ্নের উত্তরে রাজা রামমোহন রায় বলেছিলেন যে, ওরূপ যবনী রক্ষিতা শৈবমতে বিবাহিতা স্ত্রীর সামিল। ওই সময় আর একজন বড়লোক প্রসিদ্ধা বাইজী নিকীকে হাজার টাকা মাসিক মাহিনায় রক্ষিতা রেখেছিলেন।)

তৃতীয় উপদেশ। প্রতি রবিবারে বাগানে যাইবা মৎস্য ধরিবা সকের যাত্রা শুনিবা নামজাদা বেশ্যা ও বাই ইয়ারদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাগানে আনাইবা বহুমূল্য বস্ত্র, হার, হীরকাঙ্গুরীয়া ইত্যাদি দিয়া তুষ্ট করিবা। দেখিবে কি মজা হয়।

চতুর্থ উপদেশ। যাহার চারি 'প' পরিপূর্ণ হইবে তিনি হাফ বাবু হইবেন। চারি 'প' হইতেছে পাশা, পায়রা, পরদার ও পোষাক। ইহার সহিত যাহার চারি 'খ' পরিপূর্ণ হইবে তিনি পুরা বাবু হইবেন। চারি 'খ' হইতেছে খুশি, খানকী, খানা, খয়রাত।'

এরপর বাবু এই উপদেশমত উড়তে লাগলেন। টাকার খাকতি পড়ায় মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করলেন। মহাজনেরা আর যখন টাকা ধার দিল না তখন স্ত্রীর গহনা চুরি করলেন। তারপর বাবু রিক্তহস্ত হলেন। বেশ্যালয় থেকে তাড়িয়ে দিল ও দুমাসের খোরাকী বাবদ বাবুর নামে নালিশ করল। বাবুর দুমাস জেল হল। বাবুর পিতা টাকা দিয়ে বাবুকে খালাস করে নিয়ে এলেন। তারপর পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হলে. মুখাগ্নি করে বাড়ী এলেন। আত্মীয়-কুটুম্ব সকলে বলল, 'উহার জাত গিয়াছে, উহার বাটী যাওয়া হইবেক না? ইহা শুনিয়া গল-লগ্নীকৃতবাসা হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিলেন। শ্রাদ্ধের উপলক্ষে সমন্বয় হইল। তারপরে এক বাটী বানাইবার পরামর্শ করিলেন। যে বিষয় ছিল, বাটী বানাইতে খরচ হইয়া গেল, অবশিষ্ট কিছু বিষয় থাকিল পাঁচটি কন্যা সন্তানের বিবাহ দিতে হইবেক। বাবু ভাবিলেন, একদিনও স্ত্রীর সহিত বাস করিলাম না, তথাপি এ কি যাতনা। কন্যাদিগের বিবাহ না দিলে জাতি রক্ষা হয় না, ক্রমে পাঁচ কন্যার বিবাহ দিলেন, ধনের শেষ হইল। পরিবার প্রতিপালনার্থ দায়গ্রস্ত হইলেন। শেষে বাটীর পাট্টা বন্ধক কর্জ সুদ সমেত অনেক টাকা দেনা হইল। মহাজন বাটী বিক্রয় করিয়া লইলে আখেরে টালার বাগানে কোন ভাগ্যবানের অধিকারে বাস করিয়া কোনরূপে শেষ জীবন কাটাইলেন।' এই হচ্ছে বাবু কালচারের নায়কদের জীবনচরিত। কারুর এক পুরুষেই এরূপ ঘটেছে, কারুর আবার দু-তিন পুরুষে।

বাবু কালচারের ঠিক কবে থেকে সূচনা হয়েছিল, তা বলা কঠিন। তবে মনে হয় এর সূত্রপাত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে, আর পরিসমাপ্তি ঘটেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে। বোধ হয়, প্রথম বাবু ছিলেন কলকাতার কালেকটরের সহকারী গোবিন্দরাম মিত্র, যার রতন, ললিতা ও মতি নামে তিন রক্ষিতার নাম আমরা পাই সিরাজ কর্তৃক কলকাতা আক্রমণের জন্য যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল, তার তালিকায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে বাগবাজারের বিখ্যাত ধনী ভুবনমোহন নিয়োগী। (যিনি প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপন করেছিলেন ও 'নোট' পুড়িয়ে সিগারেট ধরাতেন ও সরস্বতী পূজার বিসর্জন উপলক্ষে চিৎপুর রোডের উভয় পার্শ্বস্থ বারাঙ্গনাদের মধ্যে এক হাজার জোড়া বেনারসী শাড়ী বিতরণ করেছিলেন। মহাশয়ই ছিলেন কলকাতার শেষ 'বাবু।'

ভবানীচরণ বাবুদের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের। ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের চিত্র আমরা পাই দুখানা বই থেকে। একখানা হচ্ছে বিদ্যাভূষণীকৃত 'বাবু নাটক', আর একখানা হচ্ছে টেকচাঁদ ঠাকুর রচিত 'আলালের ঘরের দুলাল'।

ষাটের দশক পর্যন্ত বাবু সমাজ ও তার কালচারের প্রতিপত্তি যে পুরামাত্রায় ছিল, তা আমরা 'হুতোম পেঁচার নক্‌শা' থেকে জানতে পারি। হুতোম এই বাবুদের সম্বন্ধে লিখেছেন—'বেশ্যাবাজিটা আজকাল এ শহরে বড়মানুষের এলবাস পোষাকের মধ্যে গণ্য। কলকাতার অনেক প্রকৃত হিন্দু দলপতি ও রাজারাজড়ারা রাত্তিরে নিজ বিবাহিত স্ত্রীর মুখ দেখেন না, বাড়ীর প্রধান আমলা দাওয়ান মুচ্ছুদ্দীরা যেমন হুজুরদের হয়ে বিষয়কর্ম দেখেন, স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের ভারও তাদের ওপর আইনমত অর্শায়, সুতরাং তাঁরা [illegible]...বোকাগোছের কোন কোন বাবুরা বাপ-মার ভয়ে আপনার শোবার ঘরে একজন চাকর বা বেয়ারাকে শুতে বলে আপনি বেরিয়ে যান। চাকর দরজায় খিল দিয়ে ঘরের মেঝেয় শুয়ে থাকে, স্ত্রী তুলসীপাতা ব্যবহার করে খাটে শুয়ে থাকেন।...বড় মানুষের বাড়ির পাশে একটি গৃহস্থের সুন্দরী বউ কি মেয়ে নিয়ে বাস করবার যো নেই; তা হলে দশদিনেই সেই সুন্দরী টাকা ও সুখের লোভে কুলে জলাঞ্জলি দেবে। ...শহরের বড়মানুষেরা অনেকে এমনি লম্পট যে, স্ত্রী ও রক্ষিতা মেয়েমানুষ লোকেও সন্তুষ্ট নন, তাতেও সেই নরাধম রাক্ষসদের কামক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না—শেষে ভগ্নী, ভাগ্নী ও বাড়ির যুবতী মাত্রেই তার ভোগে লাগে....অনেক বড়মানুষের বাড়ি মাসে একটি করে ভ্রূণ হত্যা হয়।'

তবে বাবু কালচারের শীঘ্রই পতন ঘটেছিল। এর সহায়ক ছিল শিক্ষার বিস্তার ও ভবানীচরণ যাদের বড়লোকদের নীচেরতলার লোক বলে উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজ নামে আখ্যাত করেছিলেন, তাদের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার ফলে। এই সমাজের ছেলেরা ইংরেজি শিক্ষা লাভ করে কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল, কেউ এটর্নী, কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ ইঞ্জিনীয়ার, আর কেউ কেরানী হয়েছিল। তার মানে বাবু সমাজকে পশ্চাদপটে হটিয়ে দিয়েছিল একটা শিক্ষিত পেশাদারী সমাজ। এই সমাজই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে বিংশ শতাব্দীর বর্তমান কাল পর্যন্ত সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বৈজ্ঞনিক, আইনজীবী, রাজনীতিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী তৈরী করেছিল। এদেশে বিত্ত ও বিদ্যার সমন্বয় এরাই ঘটিয়েছে। দেশের উন্নতি এদের ওপরই নির্ভর করেছে। এরাই শেষ পর্যন্ত সূচিত করেছিল এদেশ থেকে ইংরেজের মহাপ্রস্থান।

# ৩০ আঠারো শতকের সাহেব বিবি গোলাম
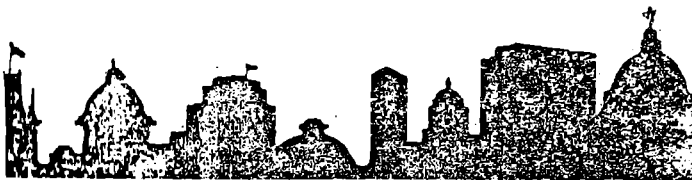
১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই ইংরেজরা পাকাপোক্তভাবে কলকাতায় বাস করতে থাকে। দশ বছরের মধ্যেই তাদের সংখ্যা, হাজারের ওপরে গিয়ে পৌছায়। একজন সমসাময়িক বণিক আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন লিখে গেছেন যে ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় ১২০০ ইংরেজ বাসিন্দা ছিল। লঙ সাহেব বলেছেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে কলকাতায় ইংরেজ বাসিন্দাদের সংখ্যা ছিল ৪০০০। কিন্তু তাদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৫০ জন। সুতরাং যে সমাজে পুরুষের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা কম থাকে, সে সমাজে যা ঘটে, ইংরেজদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। অধিকাংশ ইংরেজই তাদের যৌনক্ষুধা মেটাতো এদেশী মেয়েদের মাধ্যমে। এ সম্বন্ধে পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি মেয়েরাও সহায়ক ছিল। এরকম পর্তুগীজ মেয়েদের আড়ত ছিল ব্যাণ্ডেলে। তবে জীবনসঙ্গিনী হিসাবে সাহেবরা এদেশী মেয়েদেরই বেশি পছন্দ করত। এরূপ মেয়েদের সাহেবরা 'বিবিজান' বলত। কলকাতায় বিলাতী মেয়েদের দুষ্প্রাপ্যতা হেতু বিলাত থেকে ক'জন অবিবাহিতা মেয়ে জাহাজে করে কলকাতায় এল, তার খবর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের সংবাদ পত্র সমূহে নিয়মিত প্রকাশিত হত। তবে যারা আসত তারা সাধারণত উচ্চপরিবারের মেয়ে নয়, নিম্নবিত্ত পরিবারের ভাগ্যান্বেষী মেয়ের দল। বিলাতে বসে তারা শুনত এদেশে যে সব ইংরেজ আছে, তারা এক এক জন 'নবাব' বিশেষ। সেই আকর্ষণেই তারা বিলাত থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে পাড়ি মারত—যদিও তখন বিলাত থেকে কলকাতায় আসবার জাহাজভাড়া ছিল পাঁচ হাজার টাকা। এখানে এসে তথাকথিত কোন 'মাসীমার' বাড়ি উঠত এবং পরবর্তী রবিবার সকালে গির্জাঘরে প্রার্থনার সময় কোন অবিবাহিত পুরুষের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই বিয়ের কাজটা সমাধা করত।

ক্লাইভের আমলে সাধারণ 'রাইটার'দের মাহিনা পাঁচ পাউণ্ড, আর সিনিয়র 'মার্চেণ্ট'দের ৪০ পাউণ্ড। কিন্তু জুরে কি করে, পিলেয় মেরে দিত। গোপন ব্যবসায়, উৎকোচ ও উপঢৌকন এবং নানারূপ অবৈধ উপায়ে তারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। সে জন্য তারা এদেশের নবাবদের মতো বিলাসময় জীবন যাপন করতে পারত। সাহেবরা এভাবেই কলকাতাকে ভোগবিলাসের লীলাকেন্দ্রে পরিণত করেছিল। এসব সাহেব-নবাবের ঘরণী হবার আকা তেই বিলাতের নিম্নবিত্ত সমাজের মেয়েরা কলকাতার উদ্দেশ্যে পাড়ি মারত। মেয়েছেলে নিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহেবদের মধ্যে প্রায়ই লড়াই হত। একে 'ডুয়েল' বলা হত। বর্তমান ঘোড়দৌড়ের মাঠের কাছে দুটো গাছ ছিল। ওই গাছ দু'টোর তলাতেই 'ডুয়েল' লড়া হত। সে জন্য ওই গাছ দুটোকে 'Trees of destruction' বলা হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহেবদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটা মনোরম বিবরণ পাই ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে, কলকাতা থেকে এক মহিলা বিলাতে তার বান্ধবীকে যে চিঠি লিখেছিল তাতে। ওই পত্রে ওই মহিলা লিখেছিল—'সকাল সাতটার সময় সাহেবের দারওয়ান ফটক খুলে দিলে সরকার, পিয়ন, হরকরা, হাবদার, হুঁকাদার খানসামা, কেরাণী প্রভৃতি সাহেবের কর্মচারীরা ভিতরে ঢুকে সামনের বারান্দায় জড় হয়।

আটটার সময় জমাদার সাহেবের শোবার ঘরে যায়। সাহেবের পাশে যে এদেশী মহিলাটি শুয়ে থাকে, সে তখন ভিতরের এক দরজা দিয়ে নিচে নেমে যায় নিজের ঘরে। সাহেব শয্যা ত্যাগ করলেই তার ভৃত্যবৃন্দ ঘরে ঢুকে তাঁকে তিনবার সেলাম দিয়ে অভিবাদন জানায়। আধঘণ্টা লাগে সাহেবের পোষাক পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিয়ে দিতে। তারপর নাপিত এসে সাহেবকে কামিয়ে দেয়, তার নখ কেটে দেয় ও কান পরিষ্কার করে দেয়। তারপর জল দিয়ে সাহেবের হাত পা ধুইয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের খানসামা প্রাতরাশ নিয়ে এসে হাজির করে। প্রাতরাশ শেষ হলে, পিছন থেকে সাহেবের হেয়ার-ড্রেসার সাহেবের মাথা আঁচড়ে দেয় ও সামনে হুঁকাবরদার হুঁকার কল্কে লাগিয়ে দেয়। তারপর সাহেবের বেনিয়ান এসে হাজির হয়। তাদের সঙ্গে কাজ সেরে, সাহেব পালকিতে গিয়ে আরোহণ করে। সাহেবের পালকির সামনে দশ বারো জন জমাদার, হরকরা, পিয়ন প্রভৃতি ছুটতে ছুটতে যায়। বাইরের সমস্ত কাজকর্ম সেরে সাহেব মধ্যাহ্ন ভোজনের আগেই বাড়িতে ফেরে। দু'টার সময় মধ্যাহ্ন ভোজন হয়। বেলা চারটে নাগাদ সাহেব নিদ্রা যায় ও সন্ধ্যা সাতটা আটটা পর্যন্ত নিদ্রায় মগ্ন থাকে। ঘুম থেকে উঠে সাহেব চা খায় ও তামাক পান করে। তারপর উৎকৃষ্ট পোষাকে সুসজ্জিত হয়ে সাহেব পরিচিত মহলে মেয়েদের আনুষ্ঠানিক দর্শন দিতে যায়, রাত্রি দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরে সান্ধ্য ভোঁজ করে। এই করতে করতেই রাত্রি বারোটা বেজে যায়। তারপর সাহেব শয়নকক্ষে প্রবেশ করে।

সস্তাগণ্ডার দিন ছিল বলে সাহেবরা গাণ্ডেপিণ্ডে খেত। সাহেবরা দিনে তিনবার খেত। সকালবেলা প্রাতরাশ। যার যা খুশি তাই খেত এবং পরিমাণের হিসাব থাকত না।

তারপর দু'টার সময় মধ্যাহ্ন ভোজন। মধ্যাহ্ন ভোজনে যত পারত খেত ঝলসানো ও কষা মাংসের পদ। তাছাড়া ছিল মুরগী ও হাঁসের মাংস, নানারকম শাক-সব্জি, আলু ইত্যাদি। এছাড়া ছিল মদ্যপানের ধুম। 'হার্টলে হাউস'-এ বলা হয়েছে—'মদই ছিল পরিবারের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত জিনিস। প্রতি মেয়েছেলে দিনে এক বোতল ও পুরুষরা চার বোতল মদ খেত। সে-যুগে বিলাতী মদের দাম পাঁচ টাকা বোতল ছিল। সান্ধ্যভোজনেও রীতিমত চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় সবই থাকত। সাহেবরা যেমন অত্যধিক মদ খেত, তেমনই তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল অত্যধিক পরিমাণে ব্যভিচার ও রক্ষিতা রাখার ব্যাপার। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের এক সংবাদপত্রে বলা হয়েছে 'যদি গরমের হাত থেকে বাঁচতে চাও, তা হলে কাছে রক্ষিতা রেখে দেবে।' তবে সে-যুগের সাহেবী সমাজে ইওরোপীয় রক্ষিতা রাখা দূষনীয় ছিল। কিন্তু এদেশীয় রক্ষিতা রাখা দুষণীয় ছিল না। নিজেদের ব্যভিচার প্রকৃতি চরিতার্থ করবার অসুবিধা দেখলে সে-যুগের সাহেবরা সাধারণতঃ ডাক্তারকে ঘুষ দিয়ে স্ত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে ডাক্তারকে দিয়ে স্বাস্থ্যের কারণে স্ত্রীকে বিলাতে পাঠিয়ে দেওয়ার সুপারিশ সংগ্রহ করত।

কলকাতায় বসতি স্থাপনের পর ইংরেজরা দুটো জিনিস রপ্ত করে নিয়েছিল। একটা পালকি চাপা ও আর একটা হুঁকোয় তামাক খাওয়া। হুঁকোয় তামাক খাবার নেশায়

সাহেবরা মশগুল হয়ে উঠেছিল। শুধু যে সাহেবরাই তামাক খেত, তা নয়। মেমসাহেবরাও এর বেশ অনুরক্ত ছিল। আর পালকিতে চড়া সম্বন্ধে সাহেব ও মেমদের মধ্যে দুই ভিন্ন পদ্ধতি ছিল। সাহেবদের ক্ষেত্রে পালকি-বাহকরা পালকিটাকে খানিকটা নিচু করে ধরত, আর সাহেব পালকির দরজার দিকে পিছন হয়ে পাছাটা পালকির ভিতর ঢুকিয়ে দিত। তারপর পালকির ভিতর ঠিক হয়ে বসে নিত। মেয়েরা এ-প্রণালী অবলম্বন করত না। এতে শ্লীলতাহানির সম্ভাবনা থাকায়, তারা পালকির প্রবেশ পথের দিকে মুখ করে দাঁড়াত। পালকিবাহকরা পালকিটাকে একেবারে মাটির কাছাকাছি নিচু করে ধরত। এবং মেমসাহেব পরনের গাউনটা গুটিয়ে নিয়ে পালকির ভিতর ঢুকে পড়ত।

## গরমকালের কলকাতা

সাহেবরা ঠাণ্ডা দেশের লোক। এদেশে এসে কীভাবে তারা গরমের হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করত, এ প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে জাগে। উত্তরটা দিয়েছিল, ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের এক সংবাদপত্রে, এক ইংরেজ সম্পাদক ইংরেজদের লক্ষ্য করে। তিনি লিখেছিলেন—'যদি গরমের হাত থেকে বাঁচতে চাও, তাহলে কাছে রক্ষিতা রেখে দেবে'। সে যুগের সাহেবী সমাজে রক্ষিতা রাখা মানে এদেশি মেয়েকে ঘরণী করে নেওয়া, কেননা, ইংরেজ-মেয়েকে রক্ষিতা রাখা সে যুগের সাহেবী সমাজে নিন্দনীয় ব্যাপার ছিল। এটা আমরা জানতে পারি ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের এক লেখকের বিবৃতি থেকে। তিনি লিখে গেছেন—"Concubinage is so generally practised in India by Europeans at the same time so tacitly sanctioned by married families, who scruple not to visit at the house of a bachelor that retains a native mistress though were she an European they would avoid it as polluted." (অতুল সুর, 'কলকাতা ঃ এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস' পৃষ্ঠা ১১১ দ্রঃ)।

গরমের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য এদেশি মেয়েদের ঘরণী রাখা সে যুগের সাহেবী সমাজে প্রতিষ্ঠিত প্রথা ছিল। সে যুগের ভাষায় তাদের 'বিবিজান' বলা হত। সে যুগের এক ইংরেজ মহিলা বিলেতে তার এক বান্ধবীকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তা থেকে আমরা জানতে পারি যে, এদেশে অবস্থিত সব সাহেবেরই একজন করে বিবিজান থাকত। এই বিবিজানদের অধিকাংশেরই ইতিহাস আমাদের কাছে অজানা রয়ে গিয়েছে। মাত্র কয়েকজনের সম্বন্ধেই আমরা লিপিবদ্ধ নজির পাই। ভারতের সংবাদপত্রের জনক 'হিকির গেজেট'-এর সম্পাদক হিকি সাহেবের এক এদেশি ঘরণী ছিল। এই মেয়েটির গর্ভে হিকি সাহেবের দশটি সন্তান হয়েছিল। সমসাময়িককালে আর এক হিকির (ইনি আইনবিদ ছিলেন) দু'জন এদেশি ঘরণীর কথা পড়ি তার নিজের লেখা রোজনামচা থেকে। তার প্রথম ঘরণী ছিল এক বাঙালি মেয়ে। তাকে হিকি পরিহার করেছিলেন তার ব্যভিচারিতার জন্য। আর তার দ্বিতীয় ঘরণী ছিল একজন হিন্দুস্থানী মেয়ে। এদের বিষয়ে বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে আমার 'কলকাতার চালচিত্র' (১৯৮২) বইয়ে। এসব বিবিজানদের ছেলেমেয়েদের সাহেবরা নিজের ছেলেমেয়েরূপেই মানুষ করত। এটা আমরা জানতে পারি কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্ণকের জীবনী থেকে ও পার্ক স্ট্রীটের কবরখানার এক স্মৃতিফলক থেকে। শার্লট নামে তিন বছরের এক শিশুর কবরের ওপর এই স্মৃতিফলকে লেখা আছে—'মোস্ট লাভলি অ্যাণ্ড বিলাভেড্ চাইল্ড অফ চার্লস রীড অ্যাণ্ড বিবিজান'। সমসাময়িককালে ফরস্টার সাহেব যিনি প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন তাঁর ইংরেজি-বাংলা অভিধান সংকলনের জন্য তাঁরও এক হিন্দুস্থানী ঘরণী ছিল।

গরম কাটাবার জন্য এদেশি মেয়েদের রক্ষিতা রাখা প্রথাটা পর্তুগীজ আমল থেকেই চলে আসছিল। এদেশি মেয়েদের রক্ষিতা রাখবার অধিকার সম্বন্ধে পর্তুগীজরা একখানা

ফারমানও পেয়েছিল সম্রাট শাজাহানের কাছ থেকে। পর্তুগীজ সাহেবদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য এদেশি মেয়েদের লালসা উৎকটভাবে চিত্রিত হয়ে আছে সপ্তদশ শতাব্দীর কাঁচড়াপাড়ার এক মন্দিরগাত্রে গাঁথা এক টেরাকোটা চিত্রফলকে (ছবিটা দেওয়া আছে আমার 'হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার অব বেঙ্গল' (১৯৬৩) বইয়ে)। বস্তুত ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের সময় পর্যন্ত সাহেবরা এদেশি মেয়েদের ঘরণী রাখত।

সেকালে সাহেবরা কীভাবে গরম কাটাতো সে সম্বন্ধে তো এতক্ষণ বললাম। এবার এদেশের লোকের কথা বলি। সাধারণ বাঙালি, মাথাটাকে রৌদ্রের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য মাথায় পাগড়ি বাঁধত। আর ধনীলোকরা মাথায় পরত শামলা। রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখদের আমরা ছবিতে দেখি মাথায় শামলা-আঁটা অবস্থায়। আর বড়লোকেরা যখন বাইরে বেরোত, তখন তাদের সঙ্গে যেত ছাতাবরদার। আমরা পড়ি যে মহারাজ নবকৃষ্ণদেব বাহাদুর প্রত্যহ প্রাতঃকালে যখন গঙ্গাস্নানে যেতেন, তখন তাঁর সঙ্গে যেত এক ছত্রবাহক এক বর্ণাঢ্য ছাতা নিয়ে। আর কোর্ট-কাছারি, অফিস-দপ্তরের জানালা-দরজায় গরমকালে টাঙানো হত খসখসের টাটি—প্রতি আধঘণ্টা অন্তর সেগুলোতে জল ছিটাবার জন্য নিযুক্ত থাকত লোক! ত্রিশ বছর আগে পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই ছিল। এখন এয়ার-কণ্ডিশনিং চালু হবার পর এসব উঠে গেছে।

তখনকার দিনে বাড়িতে লোক ব্যবহার করত হাতপাখা। কেননা, যাট-সত্তর বছর আগে পর্যন্ত ইলেকট্রিক ফ্যান বা আলোর ব্যবহার সাধারণ গৃহস্থের বাড়িতে ছিল না। যদিও বিংশ শতাব্দীর প্রথম বছরেই 'কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন সংগঠিত হয়ে গিয়েছিল, তা হলেও কলকাতার মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘরে ইলেকট্রিক আলোর ব্যবহার বিশের দশকের আগে ঘটেনি। ফ্যানের ব্যবহার আরও পরে ঘটেছিল।

গরমকালের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল পানীয় জলের, কেননা কলকাতায় নলের সাহায্যে পানীয় জল সরবরাহ কলকাতা করপোরেশন কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছিল উনিশ শতকের সত্তরের দশকে। তার আগে সাহেবরা পানীয় জল সংগ্রহ করত লালদিঘি থেকে। আর দেশি পাড়ার লোকরা পানীয় জল সংগ্রহ করত স্থানীয় পুষ্করিণী বা দিঘি থেকে। সিমলা অঞ্চলের লোকরা পানীয় জল সংগ্রহ করত হেদুয়ার পুষ্করিণী থেকে। অনেক অভিজাত পরিবারের বাড়িতে 'জলের ঘর' থাকত। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'তখন জলের কল বসেনি। বেহারা কাঁখে করে কলসীভরে মাঘ-ফাল্গুনের গঙ্গার জল তুলে আনত। একতলার অন্ধকার ঘরে সারি সারি ভরা থাকত বড়ো বড়ো জালায় সারা বছরের খাবার জল।' (রবীন্দ্রনাথ, 'ছেলেবেলা' পৃষ্ঠা ১২)।

আগেই বলা হয়েছে যে তখনকার দিনে ইলেকট্রিক ফ্যান ছিল না। বৈঠকখানায় বড় হাতপাখা বা টানাপাখা (পরে দেখুন) দিয়ে গরমের দিনে বাবুদের ক্লান্তি দূর করা হত। কোর্টকাছারিতে হাকিমদের জন্যও এই ব্যবস্থা ছিল। গরমের দিনে অন্তপুরিকারাই সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেত, রান্নাঘরে জ্বালানী কাঠের আগুনের তেজে ও রান্নাঘরের বাইরে অবরুদ্ধ অন্তঃপুরে সূর্যের তাপে। রাত্রি বেলায় সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের লেকেরা ঘরে না শুয়ে

ছাদে আশ্রয় নিত। গরমের দিনে ছাদে শোয়াটা আরামদায়ক ছিল দুই কারণে। ছাদের ওপর হাওয়াটা পাওয়া যেত। আর হাওয়াটা থাকার দরুন মানুষ মশার উৎপাত থেকে রেহাই পেত। যারা ঘরে শুতো, তাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল তালপাতার হাত-পাখা। সেজন্য যারা ঘরে শুতো তাদের খুব ঘামাচি হতো।

এসবই আমার ছেলেবেলার কথা বলছি। তার মানে বিংশ শতাব্দীর মুখপাতের কথা। এবার বলি গরমকালে আমাদের স্কুলে কি ঘটত। গরমকালে স্কুলে টানাপাখা টাঙানো হত। এগুলো হচ্ছে প্রায় স্কুল-ঘরের প্রস্থ পরিমাণ কাঠের ডাণ্ডায় বাঁধা হাত-দুই তিন-চার-প্রস্থ কাপড়, যা ঝুলানো থাকত একটা কাঠের ডাণ্ডায়। তিন-চারখানা টানাপাখা টাঙানো হত প্রতি ঘরে। একগাছা লম্বা দড়ি দিয়ে পাখাগুলো পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা থাকত। দু'দিকেই দড়ির প্রান্ত নেমে আসত মেঝে পর্যন্ত এবং দু'জন লোক দু'দিকে মেঝের ওপর বসে সেগুলো টানতো। পাখা টানতে টানতে ক্লান্ত হয়ে যখন তাদের একটু তন্দ্রার ভাব আসত তখন আমরা ছেলের দল চেঁচিয়ে উঠতাম— 'পা ।ওয়ালা, পা । খিচ।' আমার সহপাঠীদের মধ্যে যারা একটু দুর্ধর্ষ প্রকৃতির ছিল, যেমন ছোনে মুজমদার (যে পরবর্তীকালে ফুটবল খেলার মাঠে প্রখ্যাত হয়েছিল) পা ।ওয়ালার সঙ্গে সম্বন্ধীর সম্বন্ধ পাতিয়ে বলে উঠত—'এই শালা পা ।ওয়ালা, মারেগা লাথ, জোরসে পা । খিচ।' তবে খুব গরমের সময় ( বোশেখের মাঝামাঝি সময় থেকে রথযাত্রার পর পর্যন্ত) স্কুল বন্ধ থাকত। একে 'সামার ভেকেশন' বলা হত। হাইকোর্ট এ সময় তিনমাস বন্ধ থাকত। আর লাটসাহেব ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা এ সময় দার্জিলিং, সিমলা বা অন্য কোন শৈলাবাসে যেত।

বোশেখ মাস হলেই বাড়ির মেয়েরা তুলসী গাছের 'ওপর ঝারা' বেঁধে দিত। আর ছোট ছোট মেয়েরা প্রাতঃকালে ঘুম থেকে উঠেই সাজি হাতে ফুল সংগ্রহ করতে বেরোত। তারপর বাড়ি ফিরে এসে মাটি দিয়ে শিবঠাকুর তৈরি করে শিবপূজা করত। যে মন্ত্র বলত, তার কোনও মাথামুণ্ড ছিল না। যেমন 'শিল শিলেটন শিলে বাটন, গৌরী আছেন ঘরে' ইত্যাদি; সবশেষে প্রার্থনা করত 'যেন শিবের মত বর পাই।' মেয়েদের আরও অনেক ব্রত ছিল। মেয়েদের কৃত এইসব ব্রতপালন এমন একটা আবহ ও ব্যস্ততা সৃষ্টি করত যে তারা গরমের প্রকোপটা ভুলেই যেত। সধবারা এ সময় করত সাবিত্রী ব্রত। সাবিত্রী ব্রত খুব ঘটা করে করা হত। এতে অনেক লোককে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হত। আবার বিধবারা বোশেখ মাসে কলসী উৎসর্গ করত। কলসী উৎসর্গ মানে জলভরা কলসী ব্রাহ্মণকে দান করা।

সেকালের গরমকালে মানুষ ফল খাবার এক মহাসুযোগ পেত। ফলের ছিল মহাসমারোহ—আম, কাঁঠাল, জাম, জামরুল, ফুটি, তরমুজ, লিচু, তালশাঁস, কালোজাম, গোলাপজাম, ফলসা, বৈচি, টেপারি ইত্যাদি। সবই ছিল খুব সস্তা। ত্রিশের দশক পর্যন্ত এক ঝুড়ি (৮০ টা) ল্যাংড়া আম বারো আনা থেকে এক টাকার মধ্যে পাওয়া যেত। কালোজাম এক পয়সায় দু কুড়ি থেকে তিন কুড়ি। তালশাঁস এক পয়সায় চার খানা।

দেখতাম কাবলিওয়ালারা আট আনায় একটা বড় কাঁঠাল কিনে বাজারে বসেই গোটা কাঁঠালটা খেয়ে ফেলত। ফলের সময় বৈবাহিক বাড়িতে একটা 'ফলের তত্ত্ব' করা হত। এটা ছিল সেকালের একটা ফালতু তত্ত্ব। কেননা এরপরই আসত জামাইষষ্ঠীর তত্ত্ব। জামাইষষ্ঠীর তত্ত্বতেও থাকত প্রচুর ফল।

গরম পড়লেই অফিসের জানালা-দরজায় টাঙানো হত খসখসের টাটি। আধঘণ্টা অন্তর পানিওয়ালা এসে পিচকারী দিয়ে জল ছিটিয়ে খসখসের টাটিগুলোকে ভিজিয়ে দিয়ে যেত। পঞ্চাশের দশকের শেষ পর্যন্ত খসখসের টাটি কলকাতার অফিসসমূহে গরমের আসান ছিল। তারপর 'এয়ার কণ্ডিশনিং' প্রবর্তিত হবার পর খসখসের টাটি অন্তর্হিত হয়।

# কলকাতায় সতীদাহ

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার কথা। সহমরণের জন্য রামমোহনের স্বস্তি নেই। অনুমৃতাদের ধোঁয়ায় কলকাতার আকাশ-বাতাস কলুষিত হয়ে গেছে। কলকাতায় যত সতীদাহ হয়, আর কোথাও তত হয় না। সমসাময়িক সরকারী নথীপত্রে দেখি ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে (তার মানে রামমোহন আসবার পরের বছরে) কলকাতায় ২৫৩ জন সহমৃতা হয়েছিল, ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ৪৪১ জন। এ যেন নিষ্ঠাবান সমাজের জিদের জন্য কলকাতায় অনুমৃতার সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে!

কলকাতাতেই যে সবচেয়ে বেশি অনুমৃতা হত, তা নীচের তালিকা থেকে বুঝতে পারা যাবে—

| | ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে | ১৮১৬ খ্রীঃ | ১৮১৭ খ্রীঃ |
|---|---|---|---|
| ঢাকা | ৩১ | ২৪ | ৫২ |
| মুরশিদাবাদ | ১১ | ২২ | ৪২ |
| পাটনা | ২০ | ২৯ | ৩৯ |
| বেনারস | ৪৮ | ৬৫ | ১০৩ |
| বেরেলী | ১৭ | ১৩ | ১৯ |

রামমোহন গোড়া থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন যে নিষ্ঠাবান সমাজের বিরোধিতা, দেশবাসীর কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও মানসিক জড়তা মাত্র লেখালেখি করেই দূর করা যাবে না। কেননা, সহমরণ কলকাতায় পরবর্তী দশকেও চলতে থাকে। সমসাময়িক সংবাদপত্রসমূহ থেকে আহরণ করে দু'একটা সমাচার আমরা এখানে দিচ্ছি। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ নভেম্বর তারিখের সংবাদপত্রে আমরা পড়ি—'কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি কুলীন ব্রাহ্মণ সর্বসুদ্ধা বত্রিশটি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে তাঁহার জীবদ্দশাতেই দশ স্ত্রী লোকান্তরগতা হইয়াছিল। বাইশ স্ত্রী বর্তমান ছিল। তাহার মধ্যে কেবল দুই স্ত্রী তাঁহার বাটীতে ছিল। আর সকলে স্ব স্ব পিত্রালয়ে ছিল। ২১ কার্তিক বুধবার ঐ চট্টোপাধ্যায় পরলোক প্রাপ্ত হইলে তাঁহার সকল শ্বশুর বাটীতে অতি ত্বরায় তাঁহার মৃত্যু সম্বাদ পাঠান গেল। তাহাতে কলিকাতার এক স্ত্রী ও বাঁশবেড়িয়ার এক স্ত্রী ও নিকটস্থা দুই স্ত্রী এই চারিজন সহমরণোদ্যতা হইল। পরে সেখানকার দারোগা এই বিষয় সদরে রিপোর্ট করিয়া সদর হইতে হুকুম আনাইতে দুই দিবস গত হইল। পরে২৩ কার্তিক শুক্রবার তৃতীয় দিবসের মধ্যাহ্নকালে হুকুম আইলে ঐ চারিজন পতিব্রতা সহমরণ করিয়াছে।'

আবার ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ আগস্ট তারিখের সংবাদপত্রে পড়ি — 'সিমলা নিবাসী ফকিরচন্দ্র বসু ১ ভাদ্র সোমবার ওলাউঠা রোগে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার বয়ঃক্রম প্রায় ৩৬ বৎসর হইয়াছিল। তাহার সাধ্বী স্ত্রী শ্যামবাজার নিবাসী শ্রীমদনমোহন সেনের কন্যা। তাহার বয়ঃক্রম ন্যূনাতিরেক ২২ বৎসর হইবেক এবং সন্তান হয় নাই। ঐ পতিব্রতা রাজাজ্ঞানুরোধে দুই দিবস অপেক্ষা করিয়া বুধবার প্রাতে সুরের বাজারের

নিকট সুরধুনী তীরে স্বামীশবসহ জ্বলচ্চিতারোহণ পূর্বক ইহকাল পরিত্যাগ পুরঃসর পরলোক গমন করিয়াছে।'

আবার ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২ অক্টোবর তারিখের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়—'কীর্তিচন্দ্র ন্যায়রত্ন এক সুপণ্ডিত। তিনি সংপ্রতি কোম্পানি বাহাদুর স্থাপিত সংস্কৃত কলেজে এক অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি গত ২৬ আশ্বিন বুধবার ওলাউঠা রোগোপলক্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ৩৫/৩৬ বৎসর হইবেক। ইহার সাধ্বী স্ত্রী সহগমন করিয়াছেন।'

খবরগুলো পড়লে মনে হবে যে মেয়েরা সব স্বেচ্ছায় অনুমৃতা হত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা নয়। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ মে তারিখের সংবাদপত্রে যা লেখা হয়েছিল, তা থেকে তাই প্রকাশ পায়। লিখিত হয়েছিল—'অবলা অনভিজ্ঞা স্ত্রীলোককে শাস্ত্রোপদেশ দ্বারা ভ্রম জন্মাইয়া এ রূপ উৎকট কর্মে প্রবৃত্ত করান সাক্ষাৎ যমদূতের ন্যায় হস্তধারণ পূর্বক ঘূর্ণপাকে সাতবার ঘুরাইয়া শীঘ্র চিতারোহণ করাইয়া শবের সহিত দৃঢ় বন্ধন পুরঃসরে জলদগ্নিতে দগ্ধকরণ ও বংশদ্বারা শবের সহিত তাহার শরীর দাবিয়া রাখন ও তাহার কথা কেহ শুনিতে না পায় এ নিমিত্তে গোলমাল ধ্বনি করণ অতি দুরাচার নির্মায়িক মনুষ্যের কর্ম। এমত বিষয়ে তাহার সাহায্যকারি ও সঙ্গিলোক সকলেই দোষী হইতেছেন। শাস্ত্রের ভালমন্দ ভগবান জানেন। আপাতত শাস্ত্র দেখাইয়া এমত কর্মে প্রবৃত্ত হওন কিংবা করান বিশিষ্ট লোকের অনুচিত।'

হাত-পা বেঁধে 'সতী'দের যে পুড়িয়ে মারা হত, তার উল্লেখ রামমোহন তাঁর লেখার মধ্যেও করেছিলেন।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ আগস্ট তারিখের সংবাদপত্রে পড়ি ঃ '২৭ জুলাই ইণ্ডিয়া গেজেট নামক পত্রে এই এক অশুভ সমাচার প্রচার হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট এইক্ষণে সহমরণ নিবারণের চেষ্টাতে আছেন এবং এতদ্দেশীয় এক খ্যাত ব্যক্তি সকল নগর বাসীর প্রতিনিধি হইয়া ঐ অনুচিত বিষয়ের প্রমাণ ও প্রয়োগ লিখিয়া সমর্পণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি মহামহিম শ্রীযুত গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং শ্রীযুতও এই বিষয় নিবারণে নিতান্ত মান্য প্রকাশ করিয়াছেন।' বলা বাহুল্য এই 'খ্যাত ব্যক্তি', স্বয়ং রামমোহন ছাড়া আর কেউই নন। এই উপলক্ষেই রামমোহন সহমরণ সম্বন্ধে 'সহমরণ বিষয়' আখ্যাত তাঁর শেষ নিবন্ধ লিখেছিলেন।

রামমোহনেরই চেষ্টায় গবর্নমেণ্ট ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর তারিখে সহমরণ নিষিদ্ধ করে। এর বিরুদ্ধে ইংলণ্ড রাজার নিকট আরজি পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ নভেম্বর তারিখের সংবাদপত্রে আমরা পড়ি—'শ্রীল শীযুত ইংলণ্ডাধিপতি গত জুলাই মাসের একাদশ দিবস বুধবারে প্রবি কৌন্সেলে হিন্দুদের স্ত্রী দাহ বিষয়ে ভাবতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বরের আজ্ঞা গ্রাহ্য করিয়াছেন এবং এদেশের দুএকজন হিন্দু যে পুনরায় স্ত্রী দাহ হয় এজন্য আবেদন লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা গ্রাহ্য করেন নাই।' এরপর কলকাতায় আর সতীদাহ হয় নি।

## ৩০ কলকাতায় নববর্ষ

নূতন বছরের পয়লা দিনটাকেই আমরা 'নববর্ষ' বলি। কিন্তু এটা মানুষের এক মন-গড়া অভিধা। কেননা, কালপ্রবাহের না আছে কোন সূচনা, না আছে কোন ছেদ বা অন্ত। অনন্তের পথে চলেছে কাল নিরন্তর গতিতে। সেই অনন্ত কালপ্রবাহকেই আমরা ভাগ করে নিয়েছি আমাদের সুবিধার জন্য বর্ষ, মাস, দিন ও ক্ষণে। এ ভাগের হেতু ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রকমের। কোথাও বা এর ভিত্তি হচ্ছে জ্যোতিষিক, আবার কোথাও বা কোন ঐতিহাসিক বা বৈষয়িক ঘটনা। আবার কোথাও কোথাও একটা আর একটার সঙ্গে জড়িয়ে একাকার হয়ে গেছে। আবার কোথাও রাষ্ট্র বা ধর্মাধিকরণের আদেশে প্রতিষ্ঠিত নববর্ষের দিন, এগিয়ে বা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভারতে নানারকম বর্ষ গণনা প্রচলিত ছিল। বিক্রম সংবত শুরু হয়েছিল ৫৮ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ থেকে, শকাব্দ শুরু হয়েছিল ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে, গুপ্তাব্দ ৩২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে, হর্ষাব্দ ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে, কলচুরি অব্দ ২৪৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে, বাঙলায় লক্ষ্মণ সংবত শুরু হয়েছিল ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে, নেপালে নেওয়ার সংবত শুরু হয়েছিল ৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে, কেরলে কোল্লম অব্দ ৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে, আর বাঙলা দেশে বঙ্গাব্দের সূচনা হয়েছিল সম্রাট আকবরের সময় থেকে, রাজকার্যের সুবিধার জন্য হিজিরা বর্ষের সঙ্গে তৎপরবর্তী সৌর বৎসরে 'এক' সংখ্যা যোগ করে। চৈতন্যচরিতামৃত'-এর সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে আমরা জানতে পারি যে বঙ্গাব্দ সৃষ্টি হবার পূর্বে বাঙলায় শকাব্দেরই প্রচলন ছিল।

তবে মুসলমান আমলে উত্তর ভারতে ফসলী ও ওড়িশায় আমলী ও বিলায়তী অব্দও প্রচলিত ছিল। ফসলী বর্ষ শুরু হত ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা প্রতিপদ থেকে, আমলী ভাদ্র মাসের শুক্ল দ্বাদশী থেকে ও বিলায়তী আশ্বিন মাস থেকে।

বর্তমানে উত্তর ভারতে বিক্রম সংবতের শুরু হয় চৈত্র শুক্লা প্রতিপদ থেকে, আর শকাব্দের চান্দ্রবৎসর শুরু হয় চৈত্র শুক্লা প্রতিপদ থেকে ও সৌরবৎসর কৃষ্ণা প্রতিপদ থেকে। দক্ষিণ ভারতে বাহস্পর্ত্য বর্ষ প্রচলিত আছে। তা শুরু হয় বৈশাখী কৃষ্ণা প্রতিপদ থেকে। কেরলে কোল্লাম বর্ষ শুরু হয় ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা নবমী থেকে। তামিলনাড়ুতে নববর্ষ শুরু হয় বাঙলার নববর্ষের দিন থেকেই। ওখানে নববর্ষকে বলা হয় 'কুড়িবর্ষম'। গুজরাটে নববর্ষ শুরু হয় কার্তিক মাসের কৃষ্ণা অমাবস্যার পরদিন থেকে। কলকাতাবাসী এই সব রাজ্যের লোকরা এই সব দিন থেকেই তাদের নববর্ষ গণনা করে।

ইংরেজ আমলে কলকাতায় নববর্ষ বলতে পয়লা জানুয়ারী বোঝাত। ওই উপলক্ষে সাধারণ লোক পরস্পরকে 'নিউ ইয়ারস্ ডে কার্ড' পাঠাত। অনেকে সাহেবদের 'ভেট' দিত। ব্যবসায়ীরা লোককে ক্যালেণ্ডার ও ডায়েরী পাঠাত। দিনটা 'পাবলিক হলিডে' ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর এই ছুটিটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন পয়লা বোশেখই নববর্ষের ছুটির দিন হিসাবে মর্যাদা লাভ করেছে। স্বাধীনতা লাভের পর এটা একটা উৎসবের দিন হিসাবেও পালিত হয়। সে উৎসবটা কি এবং কিভাবে পালিত হয়, সে কথা আমি পরে বলছি। তার আগে আগেকার দিনে পয়লা বোশেখে কি হ'ত, তা বলে নিতে চাই।

সূচনায় পয়লা বোশেখে বিশেষ কোন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের প্রচলন আমাদের দেশে ছিল না। আমার সামনেই রয়েছে দু'শো বছরের হিন্দু পর্বের এক তালিকা। ওই তালিকায় এই নববর্ষের কোনও উল্লেখই নেই। পঞ্জিকায় ওদিন মাত্র ধ্বজা রোপণের বিধান লেখা আছে। কিন্তু বাঙলাদেশে ধ্বজা রোপণের বিশেষ কোন লক্ষণ আমি আমার দীর্ঘ জীবনকালের মধ্যে লক্ষ্য করিনি। (উত্তর ভারতে অবশ্য নববর্ষে ধ্বজা রোপণ দেখা যায়। তবে সেখানে বর্ষ আরম্ভ হয় চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপদে।) ছেলেবেলায় দেখেছি কলকাতায় ওই দিন পুরোহিত ঠাকুর এসে নূতন পঞ্জিকা পড়ে মেয়েদের বর্ষফল শোনাত ও দক্ষিণা নিয়ে চলে যেত। এখন মেয়েদের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষার প্রসার হয়েছে। মেয়েরা পয়লা বোশেখের আগেই, বাড়ির কর্তারা পঞ্জিকা কিনে নিয়ে এলে বর্ষফলটা নিজেরাই পড়ে নেয়। সুতরাং পুরোহিত ঠাকুরের বাড়িতে এসে বর্ষফল শোনাবার পদ্ধতি উঠে গেছে।

আর আগেকার দিনে নববর্ষের প্রথম দিনে হ'ত হালখাতা। সেটা অবশ্য এখনও প্রচলিত আছে, তবে তার আগেকার দিনের রেশ নেই। আমার ছেলেবেলায় দোকানে দোকানে হালখাতা হ'ত। তার দৃশ্য কিছুদিন আগে পর্যন্ত পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ছবিতে দেখতে পাওয়া যেত। বাস্তব জগতে এখন তার আর কোন অস্তিত্ব নেই। তখনকার সময়ে হালখাতার দিনে ময়রারা এক রকম মিঠাই তৈরি করত, যার নাম ছিল 'হালখাতার মিঠাই'। সে মিঠাই তারা বছরে মাত্র একদিনই তৈরি করত। এখন আর সে মিঠাই তৈরি হয় না।

তখনকার সময়ে হালখাতার দিনে দোকানদাররা সকালবেলা দোকানে গণেশ পূজা ও খাতা মহরৎ করত। খাতা মহরৎ মানে নূতন খাতায় সিঁদূর দিয়ে স্বস্তিক চিহ্ন আঁকা ও দেবতার নাম লেখা। এখনও কোন কোন দোকানে এটা হয়, কিন্তু বেশির ভাগ দোকানদার হয় কালীঘাটে, আর তা নয়তো দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দিরে তাঁদের নূতন খাতা পূজা করিয়ে নিয়ে আসে।

বিকালবেলা দোকানে নিমন্ত্রণ করা হ'ত খরিদ্দারদের। দোকানে সেদিন ফরাস পেতে আসর তৈরি করে নিমন্ত্রিতদের আদর-আপ্যায়ন করা হ'ত। সকলের গায়ে গোলাপ জল ছিটানো হ'ত। আসরের মাঝখানে বসানো থাকতো রূপার তৈরি হুকাদানের ওপর দু-তিনটে রূপা দিয়ে বাঁধানো হুকা, অভ্যাগতদের তামাক খাবার জন্য। নূতন খাতা নিয়ে আসরের একধারে বসে থাকত দোকানের এক কর্মচারী। অভ্যাগতরা দিত তাদের বাকি টাকা, সম্পূর্ণ, নয়তো আংশিক। আর যাদের বাকির বালাই থাকত না, তারাও টাকা দিত এবং নূতন খাতায় তাদের নামে সে টাকা জমা করে নেওয়া হ'ত। প্রত্যেককে এক চ্যাঙ্গারি করে মিঠাই দেওয়া হত।

আজকের দিনের গণসমাজে নববর্ষের দিনে যে উৎসব পালিত হয়, সেটা হচ্ছে আনন্দের উৎসব। এ উৎসবের উদ্ভব ঘটেছে মানুষের এক সহজাত প্রবৃত্তি থেকে— পুরাতনের প্রতি বিতৃষ্ণা ও নূতনের প্রতি মোহাসক্তি থেকে। মানুষ ভুলে যেতে চায় পুরাতন বছরের লজ্জা, কলঙ্ক ও গ্লানি। গড়ে তুলতে চায় নববর্ষে জীবনকে নূতন করে—নূতন আশা, আকাঙক্ষা ও ঈপ্সা দিয়ে। জীর্ণতার পরিবর্তে চায় সজীবতা। সে

তাই নববর্ষকে স্বাগত জানাবার জন্য আজকের দিনে মেয়েরা পরে নানা রঙের ও নানা ডিজাইনের শাড়ি, ছেলেরা করে কুচকাওয়াজ, মত্ত হয় নাচ-গান ও নানা রকম আমোদ-প্রমোদে।

কলকাতায় গুজরাটি ও মাড়বারি সমাজে নববর্ষ উৎসব পালিত হয় দেওয়ালীর দিনে। ওদিন আলোকসজ্জায় ঘরদোর শোভামণ্ডিত করা হয়। আর, লোকেরা ওইদিন জুয়া খেলে নির্ণয় করে আগামী বছরে তাদের ভাগ্য। জানি না, বাঙলা দেশেও কোন এক সময় দেওয়ালীর দিন থেকেই নববর্ষ শুরু হ'ত কিনা! কেননা, ওদিনের আলোকসজ্জা, লক্ষ্মীপূজা ও অলক্ষ্মী বিদায়, নববর্ষে সমৃদ্ধির আবাহন ও পুরাতন বর্ষের দীনতার বিসর্জন [illegible]।

## সেকালের রথ ও স্নানযাত্রা

আমাদের ছেলেবেলায় রথের যে আনন্দ ও উৎসব দেখেছি, আজ আর তা নেই। ভেঁপু বাজানো, পাঁপড় ও তেলেভাজা খাওয়া ও মাটির তৈরি খেলনার রথ কিনে রথটানা ছেলেদের খুব আনন্দ দিত। অন্যান্য আর পাঁচটা পরবের মত রথের সে আনন্দ আজ ক্রমশ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তার প্রমাণ, পঞ্চাশ বছর আগে রথযাত্রা (বেসরকারি অফিসে পুনর্যাত্রাও) ছুটির দিন বলে গণ্য হত। আজ আর তা হয় না।

সেকালে রথযাত্রায় কলকাতায় খুব সমারোহ হ'ত। কলকাতার রথের সম্পর্কে সবচেয়ে প্রাচীন সংবাদ যা আমাদের হস্তগত হয়েছে, তা হচ্ছে শোভারাম বসাকের রথ। ওই রথটা গঙ্গার ধারে যেখানে রাখা হত, তার সামনের ঘাটটা এখনও রথতলা ঘাট নামে প্রখ্যাত। কলকাতার হাটখোলার মানিকচন্দ্র বসুর রথও খুব প্রসিদ্ধ ছিল। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জুলাই তারিখের 'চন্দ্রিকা' পত্রিকা থেকে আমরা জানতে পারি যে ওই সালে শিবনারায়ণ ঘোষ এক রথ নির্মাণ করে নিজ মাতার নামে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ওই উপলক্ষে কলকাতা ও প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকদের নিমন্ত্রণ করে প্রত্যেককে একটা ঘড়া ও নগদ আট টাকা করে 'বিদায়' দিয়েছিলেন।

কোথাও ভিড় হলে এখনও বাঙলাদেশের লোক বলে ওখানে রথদোল পড়ে গেছে। কলকাতার রথে এত ভিড় হত যে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে 'মাঝের রাস্তা' দিয়ে রথ নিয়ে যাওয়া পুলিস কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছিল। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কলকাতায় রাণী রাসমণির রূপার রথও বিখ্যাত রথ। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ হতে মার্কিন বৈষ্ণবদের রথেও যথেষ্ট সমারোহ হয়। আমাদের বাড়ির কাছে পাইকপাড়ার রাজাদের (লালাবাবুদের রথও খুব প্রাচীন। পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন মন্ত্রী বিমল সিংহ মশাই-এর আমল থেকেই পাইকপাড়ার রাজবাড়ি পরিত্যক্ত। কিন্তু ঠাকুর দেবতা ও ধর্মানুষ্ঠান পরিত্যক্ত নয়। এখনও ওখানে ওঁদের রথ হয় ও ওঁদের বাড়ির সামনে বি. টি. রোডের ওপর মেলা বসে। তবে আগেকার জৌলুস নেই, কিন্তু ভিড় যথেষ্ট হয়।

কলকাতার অন্যান্য যে সব রাস্তায় রথ চলে সে সব রাস্তারও অনুরূপ দশা। ওইসব রাস্তার মোড়ে মোড়ে চোখে পড়বে বসানো আছে পুলিসের NO WAY বোর্ড।

রথের একটা প্রধান অঙ্গ হচ্ছে রথের মেলা। সেজন্য বলা হয়—'রথ দেখা ও কলা বেচা'। কলকাতার শিয়ালদহের রথের মেলাই প্রসিদ্ধ। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে এই মেলায় নানারকম গাছের চারা বিক্রি হয়—আম কাঁঠালের চারা থেকে লঙ্কা লবঙ্গ, এলাচের চারা পর্যন্ত। এটা বনোৎসবের সহায়ক। কিন্তু এ মেলার আগেকার গৌরব আর নেই। তাছাড়া, মেলা স্থানচ্যুতও হয়েছে। স্বাধীনতালাভের শর্ত হিসাবে দেশবিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত লোকেরা ওই জায়গাটা দখল করে নিয়ে ওই জায়গায় চালাঘর বানিয়ে কাপড়ের দোকান খুলে ফেলল। তারপর একদিন কর্তৃপক্ষ ওই চালাঘরগুলো ভেঙে দিল। গণ্ডগোলের পর কর্তৃপক্ষ ওখানে পাকা ঘর বানিয়ে দিল। ওই পাকা ঘরেই এখন বস্ত্রব্যবসায়ীদের অবস্থান। আর ওর আশপাশের ছিটেফোঁটা খালি জমিতে শিয়ালদহের মেলার সহবস্থান।

বাঙলার অন্যত্রও রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় ও হ'ত। কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতেও

হ'ত। এই রথযাত্রাকে উপলক্ষ করেই বঙ্কিম তাঁর 'রাধারাণী' উপন্যাস লিখেছিলেন। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্কিম জীবনী'র তৃতীয় সংস্করণের ৩০১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন— 'গৃহবিগ্রহ রাধাবল্লভ জীউর রথযাত্রা প্রতি বৎসর মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। পূজনীয় যাদবচন্দ্র তখন জীবিত। বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮২ সালে রথযাত্রার সময় ছুটি লইয়া গৃহে বসিয়াছিলেন। রথে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই ভিড়ে একটি ছোট মেয়ে হারাইয়া যায়। তাহার অনুসন্ধানার্থ বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও চেষ্টা করেছিলেন। এই ঘটনার দুই মাস পরে 'রাধারাণী' লিখিত হয়। সেটা ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা।'

গুপ্তিপাড়ায় বৃন্দাবন মঠের রথ অষ্টাদশ শতাব্দীতে তৈরি তেরো চূড়া রথ। রথের ১৬টা চাকা ছিল। এখন ওই রথ ভঙ্গুর হয়ে গেলেও ওই অবস্থাতেই টানা হয়। এই রথের মেলায় হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সংবাদপত্রসমূহে আমরা মাহেশের রথযাত্রার বিবরণ পাই। খুব সাড়ম্বরে এই রথযাত্রা হত, এবং কলকাতাবাসী ইংরেজরা এটা দেখতে যেতেন। বাঙালি 'বাবু'রা তো যেতেনই, সেটা শিবনাথ শাস্ত্রী বলে গেছেন। শুধু তাই নয়। সঙ্গে তাঁরা বারাঙ্গনাদেরও নিয়ে যেতেন। মাহেশের রথ সম্বন্ধে আমরা ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ জুন তারিখের 'সমাচার দর্পণ'-এ পড়ি—'অনেক অনেক স্থানে রথযাত্রা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার মধ্যে জগন্নাথক্ষেত্রে রথযাত্রাতে যেরূপ সমারোহ ও লোকযাত্রা হয় মোকাম মাহেশের রথযাত্রাতে তাহার বিস্তর ন্যূন নহে। এখানে প্রথম দিনে অনুমান দুই লক্ষ লোক দর্শনার্থে আইসে এবং প্রথম রথ অবধি শেষ রথ পর্যন্ত নয়দিন জগন্নাথদেবের মোকাম বল্লভপুরে রাধাবল্লভ দেবের ঘরে থাকেন। তাহার নাম গুঞ্জবাড়ি। ঐ নয়দিন মাহেশ গ্রামাবধি বল্লভপুর পর্যন্ত নানাপ্রকার দোকানপসার বসে এবং সেখানে বিস্তর বিক্রয় হয়। ইহার বিশেষ কত কি লিখা যাইবেক। এমত রথযাত্রার সমারোহ জগন্নাথক্ষেত্র ব্যতিরিক্ত অন্যত্র কুত্রাপি নাই।' মাহেশের রথযাত্রায় যে মাত্র দোকান পসার বসত, তা নয়। অনেক জায়গা থেকে অনেক লোক এসে জুয়া খেলত। জুয়ায় লোক এমন মত্ত হয়ে উঠত যে হেরে গিয়ে নিজেদের যুবতী স্ত্রী পর্যন্ত বেচে দিত। ১২২৬ সালের ৬ আষাঢ় তারিখের 'সমাচার দর্পণ'-এ লিখিত হয়েছিল—'দুই জন জুয়া খেলাতে আপন যথাসর্বস্ব হারিয়া পরে অন্য উপায় না দেখিয়া আপন যুবতী স্ত্রী বিক্রয় করিতে উদ্যত হইল এবং তাহার মধ্যে একজন খানকীর নিকটে দশ টাকাতে বিক্রয় করিল। অন্য ব্যক্তির স্ত্রী বিক্রীতা হইতে সম্মত হইল না। তদপ্রযুক্ত ঐ ব্যক্তি খেলার দেনার দায়ে কয়েদ হইল।' মাহেশের রথ এখনও হয়, তবে আগেকার সে সমারোহ নেই, যদিও বিপুল সংখ্যক লোক এখনও মাহেশের রথ দেখতে যায়। মাহেশের কাছাকাছি চন্দননগর লক্ষ্মীগঞ্জের যাদু ঘোষের রথও খুব সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার লোকরা সেখানে রথ দেখতে যেত।

রথে লোকের এত ভিড় হয় কেন? তার কারণ, 'রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে'। রথের এমনই মাহাত্ম্য যে রথে দেব দর্শন করলে পুনর্জন্ম হয় না। তবে রথ বলতে আমরা আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে অনুষ্ঠিত জগন্নাথ দেবের রথযাত্রাই বুঝি। কিন্তু রথযাত্রা মাত্র জগন্নাথদেবেরই নয়। অন্যান্য দেবতাদেরও রথযাত্রা আছে। কলকাতার লোক তো কার্তিক মাসের পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত জৈনদের পরেশনাথের রথযাত্রার সঙ্গে পরিচিত আছেনই।

জগন্নাথদেবের রথের মত এরও পুনর্যাত্রা আছে। আমাদের ছেলেবেলায় পরেশনাথের রথটা (এটা মিছিলের শেষে থাকে) মানুষেই টেনে নিয়ে যেত। এখন রথটা মোটরে চলে। জৈনদের এই রথযাত্রা ছাড়া, বৌদ্ধদেরও রথযাত্রা ছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ায় চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান যখন ভারতে এসেছিলেন, তখন তিনি বৈশাখী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত বুদ্ধদেবের রথযাত্রা দেখেছিলেন। সেজন্য মনে হয় হিন্দুদের রথযাত্রা বৌদ্ধদের অনুকরণে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

আরও যে-সব রথযাত্রা আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে--পৌষমাসের শুক্লা একাদশীতে দক্ষিণ ভারতে চিদাম্বরে অনুষ্ঠিত নটরাজের রথযাত্রা, চৈত্রমাসের শুক্লা অষ্টমীতে অনুষ্ঠিত ওড়িশার ভুবনেশ্বরের রথযাত্রা, শারদীয়া বিজয়া দশমীতে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার রঘুনাথ বাড়িতে অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীরঘুনাথ জীউর রথযাত্রা। চব্বিশ পরগনার ঘোষপাড়ায় (কল্যাণীর কাছে) কর্তাভজা সম্প্রদায়ের বৈশাখ মাসে অনুষ্ঠিত রথযাত্রা।

তবে আবার বলি বাঙলায় রথযাত্রা বলতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রাই বোঝায়। এটা কবে থেকে শুরু হয়েছে বলা কঠিন, তবে ষোড়শ শতাব্দীর স্মার্ত রঘুনন্দনের সময় এর প্রচলন ছিল। কালের আবর্তনের সঙ্গে রথযাত্রার অঙ্গ হিসাবে সম্পর্কিত রথের মেলার রূপ পালটে গেছে। আগে রথের মেলায় গৃহস্থালীর যাবতীয় দ্রব্যাদি যেমন ধামা চুবড়ি, চাল ঝাড়ার জন্য কুলো, চাল ধোবার জন্য ধুচুনি, বর্ষার দিনে মাথায় দেবার জন্য টোকা, মাছ ধরার ছিপ ইত্যাদি প্রভূত পরিমাণে বিক্রি হত। এখন রথের মেলায় সেসব জিনিস বিরল।

একালের শহুরে মানুষ রথযাত্রার সঙ্গে যতটা পরিচিত স্নানযাত্রার সঙ্গে ততটা নয়। জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমাতিথিতে জগন্নাথদেবের স্নান উৎসবকে কেন্দ্র করে স্নানযাত্রা। কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে স্নানযাত্রা উপলক্ষে বসতো বড় বড় মেলা। দেবতার পুজোও হতো ঘটা করে। রথের মেলার চেয়ে স্নানযাত্রার মেলার আকর্ষণও কম ছিল না। কিছু কিছু এলাকায় তো রথ উপলক্ষে কোনো উৎসবই হ'ত না—যত ঘটা, জাঁকজমক সবই হ'ত জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমায় স্নানযাত্রা উপলক্ষে।

মাহেশের রথের মেলার মত মাহেশে স্নানযাত্রার সমারোহ যে কিছু কম ছিল না সে কথা জানা যায় 'সমাচার দর্পণে'র সংবাদে—'আগামী মঙ্গলবার ৮ জুন ২৭ জ্যৈষ্ঠ মোং মাহেশে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা হইবেক। এই যাত্রা দর্শনার্থে অনেক ২ তামসিক লোক আবালবৃদ্ধবনিতা আসিবেন ইহাতে শ্রীরামপুর ও চাতরা ও বহলভপুর ও আকনা ও মাহেশ ও রিসিড়া এই ক-এক গ্রাম লোকেতে পরিপূর্ণ হয় এবং পূর্বদিন রাত্রিতে কলিকাতা ও চুঁচুড়া ও ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি শহর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে বজরা ও পিনিস ও ভাউলে এবং আর ২ নৌকাতে অনেক ধনবান লোকেরা নানাপ্রকার গান ও বাদ্য ও নাচ ও অন্য ২ প্রকার ঐহিক সুখসাধনা সামগ্রীতে বেষ্টিত হইয়া আইসেন পরদিন দুই প্রহরের মধ্যে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা হয়। যে স্থানে জগন্নাথের স্নান হয় সেখানে প্রায় তিন চার লক্ষ লোক একত্র দাঁড়াইয়া স্নান দর্শন করে পুরুষোত্তমক্ষেত্র ব্যতিরেকে এই যাত্রার এমন সমারোহ অন্যত্র কোথাও হয় না।' সমাচার দর্পণ, ১৮১৯ খ্রীঃ ৫ জুন (২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬)

# সেকালের জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব

খ্রীষ্টানদের কাছে 'খ্রীস্টমাস ডে' যা, হিন্দুদের কাছে 'জন্মাষ্টমী'-ও তাই। দু'টোই একই গোত্রের পরব। 'খ্রীস্টমাস ডে' হচ্ছে যীশুখ্রীস্টের জন্ম উপলক্ষে উৎসব, আর 'জন্মাষ্টমী' হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব। খ্রীস্টমাস ডে'টা খ্রীষ্টানরা এখনও বেশ জাঁকজমক ও হৈহুল্লোড়ের সঙ্গে পালন করে, কিন্তু হিন্দুদের জন্মাষ্টমী উৎসবটা অনেক ম্লান হয়ে গিয়েছে। অথচ এককালে হিন্দুদের জীবনে এটা একটা খুব বড় পরব ছিল। এটা আমরা জানতে পারি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দু'শো বছর আগেকার একটা নথি থেকে। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সরকারি ছুটির যে তালিকা প্রকাশ করেছিল, তা থেকে আমরা জানতে পারি যে স্নানযাত্রা ও রথযাত্রায় মাত্র একদিন করে ছুটি থাকত, কিন্তু জন্মাষ্টমীতে ছুটি দেওয়া হত দু'দিন।

এই ছুটির তালিকা থেকে আমরা সেকালের হিন্দুদের ধর্মীয় জীবনে জন্মাষ্টমীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানটা বুঝতে পারি। কিন্তু গুরুত্বটা বুঝতে পারলে কি হবে? জন্মাষ্টমীটা কিভাবে পালিত হত, তার কোন লিখিত বিবরণ কোথাও নেই। আজকালকার দিনের লিখিত বইতেও নেই। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী তাঁর 'হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান' বইখানাতে সব রকম পরবের বর্ণনা দিয়েছেন, এমন কি ঘেঁটুপূজা পর্যন্ত, কিন্তু জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে একটা কথাও উল্লেখ করেননি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' বইতেও গত শতাব্দীর প্রথমার্ধের কলকাতার অনেক পুজা-উৎসবের বর্ণনা দিয়েছেন কিন্তু জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে কিছুই বলেননি।'

সুতরাং সেকালের জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে এখানে যা লিখছি, তা আমি নিজে যা শুনেছি বা দেখেছি, তার ভিত্তিতেই লেখা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে জন্মাষ্টমীতে যখন দু'দিন ছুটি দেওয়া হ'ত, তখন জন্মাষ্টমীতে যে আমোদ-প্রমোদ ও নানারকম ঘটা হত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত কলকাতার বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত পরিবারসমূহে নিশ্চয়ই জন্মাষ্টমী উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ত, কিন্তু তারও কোন বিবরণ কোথাও নেই। এরূপ পরিবারসমূহের মধ্যে ছিল পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুর, জোড়াসাঁকোর গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জানবাজারের রাণী রাসমণি, মদনমোহনতলার গোকুল মিত্র ও বাগবাজারের রসিকমোহন নিয়োগীর পৌত্র ভুবনমোহন নিয়োগী যিনি কলকাতায় প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপন করেছিলেন। ভুবনমোহন নিয়োগীর জ্যেষ্ঠপুত্রের সঙ্গেই আমার সেজবোনের বিবাহ হয়েছিল। আমার মাওইমা (তার মানে আমার সেজবোনের শাশুড়ি) ভুবনমোহিনীর কাছ থেকে শুনেছি যে ওদের বাড়িতে জন্মাষ্টমী-নন্দোৎসব খুব ঘটা করে অনুষ্ঠিত হ'ত। ওই উৎসবে ভুবনমোহনের গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রী ও পাড়ার নামী নামী লোকেরা যোগদান করত। তাঁরই মুখে শোনা ওই উৎসবে আসতেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী, নগেন্দ্র, মহেন্দ্র, কিরণ, বেলবাবু প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অভিনেতারা ও বিনোদিনী, ক্ষেত্রমণি, কাদম্বিনী, হরিদাসী, যাদুমণি, রাজকুমারী প্রভৃতি

অভিনেত্রীর দল, ও পাড়ার বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র শিশিরকুমার ঘোষ, রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ প্রমুখেরা। অমৃতলাল বসু ভুবনমোহন নিয়োগীর বাড়ির নন্দোৎসবের ঘটার যে একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, সেটা তাঁর 'আত্মস্মৃতির' এক জায়গায় গৌণ উল্লেখ করে গেছেন। ভুবনমোহন নিয়োগীর মৃত্যুর পর তিনি ভুবনমোহন নিয়োগী সম্বন্ধে এক স্মৃতিচারণ করেছিলেন। সেখানে তিনি বলেছেন—'আজ উনিশ দিন হয়ে গেল ভুবন ইহলোক ছেড়ে চলে গেছে, কিন্তু তার মৃত্যুসংবাদ এ পর্যন্ত কোন সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয় নাই। এটা কিছু বিচিত্র নয়। কারণ, তখনকার অল্পসংখ্যক বাঙালি পরিচালিত সংবাদপত্রের মধ্যে যেগুলি ভুবন নিয়োগীর বড় বাড়ি দেখেছে, গাড়ি দেখেছে, জুড়ি দেখেছে, ফেটিং দেখেছে, দালানে দোল-নন্দোৎসবের ধুমধাম দেখেছে, কালে তাদের প্রায় সবগুলিরই অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। তাঁর বাড়ির অনতিদূরেই যে প্রাচীন পত্রিকাখানি আজও সুস্থশরীরে জীবিত আছে, তার বর্তমান কর্তৃপক্ষের স্বর্গত পিতৃপিতৃব্যগণ ভুবনকে সাদরে নিমন্ত্রণ করে, নিজেদের ঘরে বসিয়েছেন, তাঁর বাড়িতে ও থিয়েটারে পদার্পণ করে নিয়োগীকুলকে সম্মানিত করেছেন, কিন্তু তখন ছিল আঙ্গুলে হীরের আংটিপরা ভুবন আর এখনকার এঁরা যদি দেখে থাকেন, তো দেখেছেন নেংটি পরা ভুবনকে। বড় মানুষ ভুবন নিয়োগী একটু আশ্রয় দিয়েছিল, তাই গিরিশের মত অসাধারণ নাট্যকবি কেরানীগিরিতে জীবন পর্যবসিত করে নাই; স্কুল মাস্টারের বেত্রাঘাতে অর্দ্ধেন্দু ও ধর্মদাস সুরের ন্যায় কলাবিদ্‌দের প্রতিভার 'রঙ্গমঞ্চ হয় নাই'। (সাহিত্যলোক সংস্করণ পৃষ্ঠা ১৮৪-১৮৫)

অমৃতলাল যে ধুমধামের কথা বলেছেন, সে ধুমধাম আমার ছেলেবেলায় ভুবন নিয়োগী মশাইয়ের পতনের সঙ্গে সঙ্গে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ধুমধাম ছিল না বটে, কিন্তু আনুষ্ঠানিক বাহুল্যের অভাব ছিল না। দেখেছি দালানের এক পাশে সাজানো থাকত মালসাভাগের অসংখ্য বড় বড় মালসা। প্রতি মালসায় থাকত কিছু পরিমাণ ভেজানো চিঁড়া ও বহুল পরিমাণ নানারকম সুখাদ্য মিষ্টান্ন। এরকম একটা মালসা আমাদের বাড়ি আসত। নিয়ে আসত ওঁদের বাড়ির পুরোহিত ঠাকুর অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে।

উত্তর ভারতের লোকেরা কলকাতায় জন্মাষ্টমী উৎসব ব্যাপকভাবে পালন করে। কিন্তু আমাদের বাঙলাদেশের মত জন্মাষ্টমীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট নন্দোৎসব এখানে নেই।

নন্দোৎসবের আনন্দই ছিল এ উৎসবের আসল আনন্দ। জন্মাষ্টমীর পূজা হয় রাত্রে, কেননা, রাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল। নন্দোৎসবটা পালিত হয় পরদিন সকালে। রাত্রে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের দরুন, সকালে প্রকাশ পেয়েছিল নন্দের মহা আনন্দ। আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি বৈষ্ণব গায়করা একটি ছেলেকে রঙিন বসন পরিয়ে, মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়ে, ও একটা কৃত্রিম গোঁফ লাগিয়ে, কাঁধে বাঁকে করে দু'হাঁড়ি দই নিয়ে, 'বাড়ি বাড়ি ঘুরে নাচগান করতো। এখনও বোধ হয় তারা বেরোয়,কিন্তু আগেকার সে সংগীত ও চটক নেই। সুন্দর দেখতে লাগত এই সুসজ্জিত নন্দকে। তার নাচগান দেখে বাড়ির মেয়েরা খুব আমোদ করত। এভাবেই বাড়ি বাড়ি ঘুরে নন্দ অর্থ সংগ্রহ করত। আর মেয়েরা বলত, 'তালের বড়া খেয়ে নন্দ নাচিতে লাগিল।' সেকালে ভাদ্রমাসে সুমিষ্ট

খাদ্য ছিল তালের বড়া। এটা ঘরে ঘরে তৈরি হ'ত। সেইজন্যই নন্দর আনন্দ সম্বন্ধে এর উল্লেখ।

সেকালে [illegible] বেরুত জন্মাষ্টমীর মিছিল। ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল নাকি অদ্ভুত ছিল। কিন্তু কলকাতায় আমরা আমাদের ছেলেবেলায় যে মিছিল দেখেছি তা হচ্ছে কনসার্ট পার্টির মিছিল। ওই কনসার্টে বাজানো হত স্বদেশী গান। আমাদের ছেলেবেলায় কনসার্ট পার্টির খুব সমাদার ছিল। আমাদের পাড়াতেই ছিল দক্ষিণারঞ্জন সেন মশাইয়ের কনসার্ট পার্টি। কলুটোলা টোলায় ছিল আমার বড়বৌদির পিতামহ ননী নিয়োগীর বিখ্যাত কনসার্ট পার্টি। এঁরা লর্ড রিপনের দরবারে কনসার্ট বাজিয়ে খুব সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সেকালে কনসার্টের জনপ্রিয়তা, এই থেকে বোঝা যাবে যে সাধারণ রঙ্গালয়ে নাটক অভিনয়ের আগে ও প্রতি ইনটারভেলে কনসার্ট বাজানো হ'ত। এছাড়া, ইডেন গার্ডেনে ব্যাণ্ড ও কনসার্ট বাজাবার জন্য একটা বিশেষ মণ্ডপ ছিল। প্রতিদিন বিকালে সেখানে কনসার্ট বাজানো হ'ত ও বহুলোক তা শোনবার জন্য ওখানে যেত।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে সে কনসার্ট পার্টির মিছিল যেত, তারা পাইকপাড়া বা টালা, ওই রকম কোন অঞ্চল থেকে আসত।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে আমি বহুদিন যুক্ত ছিলাম। দেখেছি ওই প্রতিষ্ঠানের উত্তরপ্রদেশীয় পিওন ও দরোয়ানরা জন্মাষ্টমী উৎসব পালন করত। রাত্রে তারা পটে রাধাকৃষ্ণের পূজা করত ও তার পরদিন দুপুরে অফিসের প্রত্যেক কর্মচারীকে প্রসাদ বিতরণ করত।

# ৩৩০ পুরানো কলকাতার দুর্গাপূজা

পুরানো কলকাতার পূজা সম্বন্ধে সবচেয়ে প্রাচীন নথীবদ্ধ প্রমাণ যা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে, তা হচ্ছে আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটনের 'ভ্রমণ কাহিনী'তে বিবৃত প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা সম্বন্ধে। প্রতিমা শেঠেদের ছিল, কেননা তখন কলকাতার সবচেয়ে ধনীলোক বলতে তাদেরই বুঝাত। আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটনের বিবৃতিটা হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের। তখন অবশ্য কলকাতায় শেঠেরা ছাড়া, আরও ধনী পরিবার ছিল। কিন্তু পয়সায় তারা কেউই শেঠেদের সমতুল ছিল না। যেমন সাবর্ণ চৌধুরীরা, জয়রাম ঠাকুর, নন্দরাম সেন, জগৎ দাস ও পরে বনমালী সরকার ও গোবিন্দরাম মিত্র। বাঙালী বারমাসে তের পার্বণ করত। তার মধ্যে আবার ধনীরা মহাসমারোহে দোল দুর্গোৎসব করত। সুতরাং আমরা অনুমান করতে পারি যে এই সব বড় লোকদের মধ্যে অনেকেই দুর্গোৎসব করতেন। তাতে অবশ্য পয়সা খরচ খুব কম হ'ত না। কেননা, যিনি বাঙলাদেশে প্রথম দুর্গোৎসব করেছিলেন, সেই তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ দুর্গোৎসবে আট লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন। সুতরাং প্রাচীন কলকাতার দুর্গোৎসবও যে বেশ খরচ করে করা হত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে গোড়ার দিকে দুর্গোৎসবে পূজা বাড়ীতে সাহেবদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। আমরা জানি যে একবার দোলযাত্রার উৎসবে সাহেবদের হিন্দুর পূজাবাড়ীতে প্রবেশ করার ব্যাপার নিয়ে জোব চার্ণকের সঙ্গে সাবর্ণ চৌধুরীদের নায়েবের সংঘর্ষ হয়েছিল।

পুরানো কলকাতার দুর্গোৎসব সম্বন্ধে দ্বিতীয় নথীবদ্ধ প্রমাণ যা আমরা পাই, তা হচ্ছে ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে হলওয়েলের 'ইনটারেষ্টিং হিসটরিক্যাল ইভেণ্টস্' গ্রন্থে। তখন দুর্গাপূজার রূপটাও পালটে গেছে। ইংরেজদের তখন নিমন্ত্রণ করে পূজাবাড়ীতে নিয়ে আসা হত। হলওয়েল লিখেছেন —"Doorgah Pujah is the grand general feast of the Gentoos, usually visited by all Europeans (by invitation) who are treated by the proprietor of the feast with the fruits and flowers in seasons, and are entertained every evening whilst the feast lasts, with bands of singers and dancers." হলওয়েলের বিবৃতিটা হচ্ছে রাজা নবকৃষ্ণদেবের সমসাময়িক কালের। তিনিই প্রথম সাহেবদের অনুগ্রহ লাভের জন্য পূজাবাড়ীতে সাহেবদের নিমন্ত্রণ করে আনেন এবং তাদের নাচগান ও ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করেন। কেননা, সমসাময়িক কালে নবকৃষ্ণ তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন—'এবার লর্ড ক্লাইভ পূজার সময় আমার বাড়ীতে প্রতিমা দর্শন করতে আসছেন। তোমার এবার আসা চাই-ই।'

তখন থেকেই শুরু হয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে সাহেবদের নিয়ে আমোদপ্রমোদ করা। আগেই বলেছি এ সব আমোদপ্রমোদ সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন ছিল না। সাহেবদের ধরে, তাদের মনোরঞ্জন করে কিছু আদায় করে নেওয়াই, এর উদ্দেশ্য ছিল। নবকৃষ্ণের

দেখাদেখি, আরও অন্যান্য বড়লোকেরা দুর্গোৎসবে সাহেবদের নিমন্ত্রণ করতেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের 'ক্যালকাটা ক্রনিকেল' পত্রিকায় আমরা অনেক বড়লোকের নাম পাই। নবকৃষ্ণ ছাড়া, সেই তালিকায় ছিল প্রাণকৃষ্ণ সিংহ, কেষ্ট চাঁদ মিত্র, নারায়ণ মিত্র, রামহরি ঠাকুর, বারাণসী ঘোষ ও দর্পনারায়ণ ঠাকুর। এঁরা ছাড়াও, আরও অনেকে দুর্গোৎসব করতেন, যথা রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়, রাজা সুখময় রায় ও পরে প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও দ্বারকানাথ ঠাকুর। দ্বারকানাথ ঠাকুরের পূজা সম্বন্ধে একটা ঘটনার এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই পূজায় নিমন্ত্রণ করবার জন্য দ্বারকানাথ পাঠিয়েছিলেন তাঁর ছেলে দেবেন্দ্রনাথকে রাজা রামমোহন রায়ের কাছে। রামমোহন সৌজন্যের সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এই নিয়ে সমসাময়িক সংবাদপত্রে তির্যক মন্তব্য করা হয়েছিল।

পুরানো কলকাতার পূজাবাড়ীর আমোদ প্রমোদের একটা বর্ণনা ফ্যানী পার্কস্ তাঁর 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত'-এ দিয়ে গেছেন। ফ্যানী পার্কস্ এক পূজাবাড়ীতে গিয়ে (১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ) দেখেছিলেন—'পূজা মণ্ডপের পাশের একটা বড় ঘরে নানারকম উপাদেয় খাবার অঢেল পরিমাণে সাজানো রয়েছে। সবই বাড়ীর কর্তার সাহেব-অতিথিদের জন্য। খাবার সরবরাহ করেছেন বিদেশী পরিবেশক মেসার্স গাণ্টার অ্যাণ্ড হুপার। খাবার জিনিসের সঙ্গে বরফ ও ফরাসী মদও ছিল প্রচুর। মণ্ডপের আর এক দিকে একটা বড় হল-ঘরে সুন্দরী বাইজীদের নাচগান হচ্ছিল। সাহেব ও এদেশীয় ভদ্রলোকেরা চেয়ারে বসে সুরাপান করতে করতে সেই নাচ দেখছিলেন; বাইজীদের গান শোনার জন্য বাইরেও বেশ লোকের ভীড় হয়েছিল। বাইজীদের নাচগান সকলকে বেশ মাতিয়ে রেখেছিল।'

কথিত আছে যে দুর্গোৎসবে বাইজীর নাচগান নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রথম প্রবর্তন করেন। পরে ওটা ভাগীরথীর ধারা ধরে নেমে এসে শোভাবাজারে নবকৃষ্ণদেবের পূজামণ্ডপে প্রবেশ করে। পরে কলকাতার অন্যান্য অভিজাত পরিবার তাঁকে অনুসরণ করেন।

বলা বাহুল্য, কলকাতায় তখন বাইজীদের ছিল পোয়াবারো। কলকাতা শহরের পূজাবাড়ীতে নাচগান করে তারা হাজার হাজার টাকা কামাত। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের কলকাতার ইতিহাসে বেশ কয়েকজন বাইজী তাদের নামের ছাপ রেখে গেছে। তাদের নাচগানের আসরে উপস্থিত থাকবার নিমন্ত্রণ পাবার জন্য কলকাতার সাহেব মহল উৎসুক হয়ে থাকত। আবার এই নর্তকীদের নিয়েও সেকালের বাবুদের লড়াই চলত। যে শ্রেষ্ঠ নর্তকীকে আনতে পারবে, সাহেবদের চোখে তারই সামাজিক মর্যাদা সবচেয়ে বাড়বে। সে যুগের শ্রেষ্ঠ নর্তকী ছিল নিকী। প্রতি রাত্রের নাচগানের জন্য তার হাজার টাকা পারিশ্রমিক ছিল। হাজার টাকা পারিশ্রমিক তো সে যুগের যে কোন বড় লোক দিতে পারত, কিন্তু তাকে পাওয়াই ছিল কঠিন। সাহেবদের কাছে নিকীই ছিল সে যুগের প্রধান আকর্ষণ। বোধ হয়, সে জন্যই কলকাতার কোন বড়লোক মাসিক হাজার টাকা বেতন দিয়ে তাকে নিজের তাঁবে রেখেছিল। এটা আমরা তৎকালীন এক সাময়িক পত্র থেকে জানতে পারি। নিকী সে যুগের ইংরেজি সাময়িক পত্রসমূহে আলোচনার বিষয় হয়েছিল। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের এক সংবাদপত্রে লেখা হয়েছিল—"We had

no opportunity on Monday evening of discovering in what particular house the attraction of any novelty may be found, but from a cursory view we fear that the chief singers Nikhi and Ashroou who are engaged by Neelmunee Mullick and Raja Ramchandra are still without rivals in melody and grace'' ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের 'ক্যালকাটা জার্নাল'-এ এক বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হয়েছিল যে সে বৎসর পূজার সময় নিকী মহারাজা রামচন্দ্র রায় ও বাবু নীলমনি ও বোষ্টমদাস মল্লিকের বাড়ি বাবুদের অতিথিদের তার নাচগানে আপ্যায়িত করবে। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে নিকীর সৌভাগ্য হয়েছিল রাজা রামমোহন রায়ের মানিকতলার বাগানবাড়িতে নাচগান করবার। বস্তুতঃ সে যুগে নিকীর সমকক্ষ আর কোন নৃত্যগীত পটীয়সী বাইজী ছিল না। শ্রোতারা তার গান ও সুরের নেশায় মাতাল হয়ে উঠত। সুরেলা কণ্ঠের জন্য সে যুগে আর যে সব প্রসিদ্ধ বাইজী ছিল, তাদের অন্যতম ছিল বেগমজান। তার গানের হিল্লোলে সকলেই মেতে উঠত। সাহেবরা পর্যন্ত চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বাহবা দিত। আর একজন বাইজী যার একই আসরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রোতারা স্তব্ধ হয়ে থাকত, সে হচ্ছে হিঙ্গন। তার কালো হরিণ চোখ ও মিষ্টি গলা শ্রোতাদের স্বপ্ন রাজ্যে নিয়ে যেত।

সে যুগের কলকাতায় শুধু বাইজীদের নিয়েই প্রতিযোগিতা হত না। প্রতিমার উৎকর্ষ নিয়েও প্রতিযোগিতা হত। বিজয়া দশমীর দিন সন্ধ্যার পরেই সমস্ত প্রতিমা এনে হাজির করা হত বালাখানার মাঠে। (এটা অবস্থিত ছিল 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক স্বর্গীয় অশোক কুমার সরকার মহাশয়ের বর্তমান আবাসবাটির কিছু দক্ষিণে)। রঙমশালের আলোতে প্রতিমাগুলি সব ঝলমল করত। ওখানে বিচার করা হত, সে বছরের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিমা কোন খানা? সেখানে বিচারে শ্রেষ্ঠ বলে যেটা প্রতিপন্ন হত, সে বাড়ীর লোকদের বুক ফুলে দশ হাত হত। আর যে কুমোর সেখানা তৈরী করত সে পেত পুরস্কার।

তখনকার দিনে কুমোরটুলীতে এক ক্রীশ্চান কুমোর ছিল, নাম অ্যান্টনি সাহেব। একবার এক রাজবাড়ী থেকে ডাক পড়ল অ্যান্টনি সাহেবের। রাজা তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করে বললেন,—'এমন একখানা ঠাকুর তৈরী করে দিতে হবে যেখানা সে বছরের শ্রেষ্ঠ প্রতিমা বলে স্বীকৃত হবে।' মন প্রাণ দিয়ে ঠাকুর গড়লেন অ্যান্টনি সাহেব। সে বৎসর অ্যান্টনি সাহেবের প্রতিমাই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হল। উৎফুল্ল হয়ে রাজা বাহাদুর নিজের গলা থেকে মুক্তা-বসানো হারটা খুলে অ্যান্টনি সাহেবের গলায় পরিয়ে দিলেন। রাজার জয়জয়কার হল, আর শিল্পী পেল তার যোগ্য পুরস্কার (অতুল সুর 'বাঙলা ও বাঙালী' পৃষ্ঠা ১৪৭ দ্রষ্টব্য)।

বস্তুতঃ সেকালের পূজার জাঁকজমকের জন্য বড়লোকরা খরচ করতে কুণ্ঠিত হতেন না। সাহেব প্রত্যক্ষদর্শীরা বলে গেছেন যে এক এক পরিবার দুর্গাপূজার উৎসবে পাঁচ-ছয় লক্ষ টাকা খরচ করতেন। অথচ শিবনাথ শাস্ত্রী বলে গেছেন যে সাধারণ গৃহস্থ লোকেরা ৫০/৬০ টাকায় পূজা করতেন।

অনেক সময় হিন্দুদের দুর্গাপূজা ও মুসলমানদের মহরম একই সময় অনুষ্ঠিত হত। তাতে হিন্দুদের পূজা বিঘ্নিত হত ও দাঙ্গাহাঙ্গামা বাঁধত। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে চাঁদনী চকের সামনে মুসলমানরা শোভাযাত্রাগামী নবপত্রিকা কেড়ে নিয়ে কেটে ফেলে। এই কারণে সে বৎসর কোন বাইজী কলকাতার কোন পূজাবাড়ীতে নাচগান করতে আসে নি। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে একবার অতি ভয়াবহ ব্যাপার ঘটে। পূজার বিসর্জনের দিন মুসলমানরা কোম্পানির প্রসদ্ধি বেনিয়ান ও ধনী রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের দুর্গা প্রতিমা ভেঙে চুরমার করে দেয় ও পালকীর মধ্যে অবস্থিত তাঁর পুত্রবধূকে আক্রমণ করে সাংঘাতিকভাবে জখম করে। এর জন্য কয়েকদিন কলকাতায় অরাজকতার সৃষ্টি হয়। (বিশদ বিবরণের জন্য লেখকের 'কলকাতা : এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস' গ্রন্থের পৃষ্ঠা ৯৬ দ্রষ্টব্য)।

সেকালের পূজায় সব বড়লোকের বাড়ীতে সকলেরই অবারিত দ্বার ছিল না। এটা আমরা ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ অক্টোবর তারিখের 'বঙ্গদূত' পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে জানতে পারি। ওই সংবাদে বলা হয়েছে—'এই কলিকাতা রাজধানী মধ্যে শারদীয় মহোৎসবে ত্রিবিধ লোকের আলয়েই জগদীশ্বরীর পূজা হয়। সকলে স্ব স্ব মতে ও বিভবানুসারে নানোপচারে তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকেন।

কেহ বা ইতরাঙ্গ রাগ-রঙ্গের বাহুল্য না করিয়া মুখ্যাঙ্গ হোম যাগ যজ্ঞাদি ও বিবিধোপচারে পূজা সাঙ্গ করেন। কেহ বা মহা ঘটাপূর্বক ঝাড়লণ্ঠন বাদ্য নাচ কাঁচের আধিক্যপূর্বক প্রকৃত কার্যপূজা সংক্ষেপেই সারেন। কেহ বা উভয়েই সমান আয়োজন করেন। তন্মধ্যে ক-এক লোক ভবন মধ্যে কিরূপ করেন তাহা দুর্গাই জানেন। কিন্তু বহির্দ্বারে সারজন সন্তরী স্থাপন করিয়া কিয়দ্ব্যক্তি নিমন্ত্রিত ব্যতীত দর্শনাকাঙক্ষী লোকদিগকে ভবন প্রবেশে নিবারণ করেন। কিন্তু দ্বারের সম্মুখবর্তী পথ হইয়া গমন করিলে বিহারের পরিবর্তে গাত্রে বেত্র প্রহার করিয়া থাকেন। বোধ হয় তদ্‌গৃহপতিরা এই সকল আচরণকেই ভগবতীর সন্তোষের মূল কারণ জ্ঞান করেন। সে যাহা হউক এ বৎসর ৪/৫ স্থানে বৃহৎ সমারোহ হইয়াছিল। বিশেষতঃ স্বর্গীয় মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের দুই বাটিতে নবমীর রাত্রে শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর ও প্রধান সেনাপতি শ্রীশ্রীযুত লর্ড কম্বরমীর ও প্রধান প্রধান সাহেবলোক আগমন করিয়াছিলেন। পরে দুই দণ্ড পর্যন্ত নানা আমোদ ও নৃত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রবণ করত অবস্থিতি করিয়া প্রীত হইয়া গমন করিলেন। ইংরেজ লোকের গতিবিধি ঐ রাজার দুই বাটিতে স্বর্গীয় রাজা রামচাঁদের বাটি ও স্বর্গীয় দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের বাটিতে পুজার চিহ্ন জোড়াসাঁকোর চতুরস্র পথে এক গেট নির্মিত হইয়া তদবধি বাটির দ্বার পর্যন্ত পথের উভয় পার্শ্বে আলোক হইয়াছিল, তাহাতে যাঁহারা ঐ বাটির পূজার বার্তা জানেন না, তাঁহারাও ঐ গেট অবলোকন করিয়া সমারোহ দর্শনেচ্ছুক হইয়া অবারিত দ্বার ভবনে গমন করিলেন। আপামর সাধারণ কোন লোকের বারণ ছিল না। উপরে নীচে যাহার যেখানে ইচ্ছা আসনে উপবিষ্ট হইয়া নৃত্যগীতাদি স্বচ্ছন্দে দর্শন শ্রবণ করিলেন। তাহাতে কোন হতাদরের বিষয় নাই।'

কিন্তু পূজার জাঁকজমক কলকাতায় ক্রমশ কমে আসছিল। ওই ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ অকটোবর তারিখের 'সমাচার দর্পণ'-এ আমরা পড়ি—'এক্ষণে বৎসর ২ ক্রমে সমারোহ

ইত্যাদির হ্রাস হইয়া আসিতেছে। এই বৎসরে এই দুর্গোৎসবের নৃত্যগীতাদিতে যে প্রকার সমারোহ হইয়াছে, ইহার পূর্বে ইহার পাঁচগুণ ঘটা হইত। কলিকাতাস্থ ইংরাজী সমাচার পত্রে প্রকাশ হয় যে কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরা আপনারাই কহেন যে এক্ষণে সাহেবলোকেরা বড় তামাসার বিষয়ে আমোদ করেন না। এ প্রযুক্ত যে হ্রাস হইয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ।' আরও কারণ দেখানো হইয়াছে। 'কলিকাতাস্থ অনেক বড় বড় ঘর এখন দরিদ্র হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা ইহার পূর্বে মহাবাবু এবং সকল লোকের মধ্যে অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখন সেই নামমাত্র আছে। কেহ সুপ্রীম কোর্টে মোকদ্দমা করিতে নিঃস্ব হইয়াছেন। কেহ বা আপনাদের অপরিমিত ব্যয়ে দরিদ্র হইয়াছেন, কেহ বা অধিকারের যে বংশবলেতে বাঙ্গালিরা ক্রমে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হন, তাহা কারণে নির্ধন হইয়াছেন।' তা ছাড়া, 'নাচের সময়ে ক-এক বৎসরাবধি অতিশয় লজ্জাকর ব্যাপার হইত এবং যে ইংলণ্ডীয়রা সেস্থানে একত্রিত হইতেন তাঁহারা সাধারণ এবং মদ্যপান কারণে আপনাদের ইন্দ্রিয়দমনে অক্ষম থাকিতেন।' মনে হয়, এই কারণে কর্তাদের ওপর অন্দরমহলের চাপও পড়েছিল।

তবে পূজাবাড়িতে সাহেবদের আসা-যাওয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের পর থেকে সরকার আর পছন্দ করতেন না। এটা প্রকাশ পায় ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের দশ নম্বরী আইন চালু হওয়া থেকে। ওই আইনে বলা হয় যে অতঃপর ইংরেজরা এদেশীয় লোকদের বাড়িতে কোন পূজাপার্বণে উপস্থিত হতে পারবে না। সেই থেকেই পূজাবাড়িতে সাহেবদের আসা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু পূজার হুল্লোড় বন্ধ হল না। পূজা উপলক্ষে যাত্রা, নাচ, তামাসা, কবির গান প্রভৃতি চলতেই লাগল। তবে সাহেবরা না আসায় পূজার আগেকার জলুস আর রইল না। শোভাবাজারের রাজবাড়ির দুই বাড়িতেই পূজায় আমোদ-প্রমোদ হত। তবে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের 'সংবাদ প্রভাকর'-এ লেখা হয়েছিল যে 'শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর এ বৎসর পীড়িত থাকায় তাঁহার ভবনে নৃত্য গীতাদির আমোদ-প্রমোদ হয় নাই, কিন্তু মহামায়ার মহাপূজার ব্যাপার সর্বাঙ্গসুন্দররূপে সুনির্বাহ হয়েছে।''

একালের 'সার্বজনীন' পূজার পূর্বগামী সেকালের বারোয়ারী পূজা সম্বন্ধে দু-এক কথা বলে এ প্রবন্ধ শেষ করব। বারোয়ারী পূজার উৎপত্তি হয় গুপ্তিপাড়ায় জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষ্যে। তারপর বারোয়ারী পূজা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সেকালের কলকাতার অনেক পাড়াতেই বারোয়ারী পূজা হত। যারা চাঁদা দিত না, তাদের জব্দ করবার জন্য বারোয়ারী পূজার উদ্যোক্তারা তাদের বাড়ী প্রতিমা ফেলে দিত। তা ছাড়া, উদ্যোক্তারা মেয়েদের ওপর অত্যাচার করত। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের 'সংবাদ ভাস্কর'এ আমরা পড়ি— 'স্ত্রীলোকের ডুলি পালকী দৃষ্টি মাত্রই বারোয়ারি দল একত্রিত হইয়া তৎক্ষণাৎ আটক করিতেন এবং তাহাদের ইচ্ছামত প্রণামী না পাইলে কদাপি ছাড়িয়া দিতেন না। স্ত্রীলোকের সাক্ষাতে অকথা উচ্চবাচ্য যাহা মুখে আসিত তাহাই কহিতেন। তাহাতে লজ্জাশীলা কুলবালা সকল পয়সা টাকা সঙ্গে না থাকিলে বস্ত্রালঙ্কারাদি পর্যন্ত প্রদান করিয়া মুক্ত হইতেন।' এই অত্যাচার বন্ধ হয়ে যায় ২৪ পরগণার জেলা শাসক পেটন সাহেবের

চেষ্টায়। তিনি স্ত্রীবেশ ধারণ করে ডুলিতে চেপে পথে বেরিয়ে এই সকল উপদ্রবকারীদের গ্রেপ্তার করেন ও দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড দেন।

পরবর্তীকালে বারোয়ারীর অধ্যক্ষরা কৌশল অবলম্বন করে চাঁদা তুলতেন। 'হুতোম' এক দৃষ্টান্ত দিয়েছে। একবার তারা শহরের সিংগিবাবুদের বাড়িতে গিয়ে হাজির। সিংগিবাবু তখন আফিস বেরুচ্ছেন। বারোয়ারীর লোকেরা তাঁকে ঘিরে ফেলে চেঁচাতে লাগল— 'ধরেছি', 'ধরেছি'। রাস্তায় লোক জমে গেল। সিংগিবাবু তো অবাক। তখন বারোয়ারীর অধ্যক্ষরা বলল—'মশায় আমাদের বারোয়ারীতে মা ভগবতী সিংগিতে চেপে কৈলাস থেকে আসছিলেন। পথে সিংগির পা ভেঙে গেছে। আমরা একমাস যাবৎ অপর সিংগি খুঁজে বেড়াচ্ছি, পাচ্ছি না। আজ আপনাকে পেয়েছি, কোনমতে ছেড়ে দিব না।' [illegible] টাকা চাঁদা দিলেন।

[illegible]। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী সত্যযুগে সুরথ রাজাই প্রথম দুর্গাপূজা করেছিলেন। সুরথ রাজার রাজধানী ছিল বর্তমান বোলপুরে। এই পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী বাঙলাদেশেই দুর্গাপূজার সূচনা হয়েছিল।

[illegible] দুর্গাপূজার সঙ্গে আজকের দুর্গাপূজার অনেক ফারাক ঘটে গিয়েছে। দুর্গা প্রথমে ছিলেন দ্বিভুজা ও দণ্ডায়মান অবস্থায় শূল দ্বারা এক মহিষকে বধ করতে রতা। [illegible] কাছে ভিটায় প্রাপ্ত মূর্তিতে আমরা তাই দেখি। পরে দেবী চতুর্ভূজা, অষ্টভুজা ও দশভূজায় পরিণত হন। সঙ্গে সঙ্গে আসে তাঁর বাহন সিংহ ও মহিষের পরিবর্তে মহিষাসুর। আরও পরে আসে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, নবপত্রিকা। এছাড়া আমাদের ছেলেবেলায় আনন্দময়ীর আগমনবার্তা প্রতি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিত ভিখারী গায়ক 'আগমনী' গীত গেয়ে। আজ পূজার বার্তা পৌঁছে দেয় সার্বজনীন পূজার চাঁদা আদায়কারী পাণ্ডারা সদর দরজার কড়া নেড়ে।

বলা হয় বাঙলাদেশে দুর্গাপূজার বর্তমান ধারার প্রবর্তন করেছিলেন তাহেরপুরের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবংশীয় রাজা কংসনারায়ণ। তিনি সুলতান হুসেন শাহের (১৪৯৩ - ১৫১৯) সমসাময়িক লোক ছিলেন। কংসনারায়ণের পিতার নাম হরনারায়ণ, পিতামহের নাম উদয়নারায়ণ। উদয়নারায়ণ হতেই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে 'নিবারিল' পটীর সৃষ্টি হয়। কংসনারায়ণকে বারেন্দ্র কুলগ্রন্থে 'দ্বিতীয় বল্লালসেন' বলা হয়েছে। কংসনারায়ণের প্রপিতামহ বিজয় লস্করকে দিল্লিশ্বর বাইশখানা গ্রাম ও সিংহ উপাধি দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে বাঙলাদেশের পশ্চিম 'দ্বাররক্ষক' হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন।

কংসনারায়ণ একজন সমৃদ্ধিশালী রাজা ছিলেন। তিনি দুর্গাপূজায় আট লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন। সে যুগে আট লক্ষ টাকার পূজার যে কি রকম ঘটা হয়েছিল, তা সহজেই অনুমেয়। কংসনারায়ণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভাদুরিয়ার রাজা জগৎনারায়ণ নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করে বাসন্তী পূজা করেছিলেন। তখন থেকেই গ্রামের জমিদার বাড়িতে দুর্গাপূজার ধুম লেগে যায়। পাঁচশ ভরি সোনা দিয়ে দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করে পূজা করতেন হুগলি জেলার বৈঁচি গ্রামের জমিদার গঙ্গাধর কুমার।

আমরা শারদীয় পূজাকে 'অকালবোধন' বলি তার কারণ এ সময়টা হচ্ছে সূর্যের

দক্ষিণায়ন। দক্ষিণায়ন কাল হচ্ছে দেবতাদের রাত্রি। দেবতারা তখন নিদ্রামগ্ন থাকেন। উত্তরায়ণ কাল হচ্ছে দেবতাদের দিন। তখনই তাঁরা জেগে থাকেন। দেবতাদের আরাধনার সেটাই হচ্ছে প্রশস্ত সময়। সেজন্য রাবণ মায়ের পূজা করেছিলেন বসন্তকালে। আর রাবণ বধের জন্য শক্তিলাভের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্র পূজার জন্য মাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন শরৎকালে। অকালে বা দেবতাদের রাত্রিকালে রামচন্দ্র মাকে জাগিয়েছিলেন বলে একে অকালবোধন বলা হয়। তবে বাল্মিকী রামায়ণে এ কাহিনীটা নেই।

কংসনারায়ণের আগে থেকেই যে বাঙলাদেশে দুর্গাপূজা হয়ে আসছে, তার প্রমাণ আমরা পাই দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত জীমূতবাহনের 'কালবিবেক' গ্রন্থে। ওই গ্রন্থে প্রচুর উৎসবের সঙ্গে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবার কথা উল্লিখিত হয়েছে। শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি, বাচস্পতি মিশ্র, শূলপাণি, রঘুনন্দন প্রমুখেরাও নানা উৎসবের সঙ্গে দুর্গাপূজা অবশ্য কর্তব্য পর্ব হিসাবে নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

এইসব উৎসবের মধ্যে একটা প্রধান উৎসব ছিল বিজয়া দশমীর দিন পালিত 'শবরোৎসব। জীমূতবাহনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'শবর জাতির ন্যায় লতা-পাতা দ্বারা দেহ আবৃত করে ও সর্বাঙ্গে কাদা মেখে নৃত্যগীত করাই 'শবরোৎসব'। শবরোৎসবে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, অশ্লীল গীত ও গ্রাম্যভাষায় পরস্পরকে গালিগালাজ করা বিহিতকর্ম বলে উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছে, এরূপ না করলে দেবী অসন্তুষ্ট হন। যোগেশচন্দ্র রায় মশায় বলেছেন যে, তাঁর বাল্যকালেও শবরোৎসব হ'ত। এখন এটা আর পালিত হয় না।

বাঙলাদেশের দুর্গাপূজা সম্বন্ধে সাধারণ লোক বলে যে, শরৎকালে মা নিজের ছেলেপুলেকে সঙ্গে নিয়ে বাপের বাড়ি আসেন। সেজন্য প্রতিমাও ঠিক সেইভাবে গড়া হয়। মায়ের ডাইনে-বাঁয়ে থাকে মায়ের দুই পুত্র গণেশ ও কার্তিক এবং দুই কন্যা লক্ষ্মী ও সরস্বতী। কিন্তু যে ধ্যানমন্ত্র অনুযায়ী মায়ের পূজা করা হয়, তাতে কার্তিক-গণেশ ও লক্ষ্মী-সরস্বতীর উল্লেখ নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় রচিত 'রামেশ্বরের শিবায়ণ' গ্রন্থে মায়ের গৃহস্থালীর যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাতে কার্তিক-গণেশের উল্লেখ আছে, কিন্তু লক্ষ্মী-সরস্বতীর কোন উল্লেখ নেই। প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যেও মহিষমর্দিনীর একক মূর্তিই গঠিত হ'ত। তাঁর ছেলে-মেয়েদের কোন স্থান ছিল না। ঠিক কবে থেকে মায়ের প্রতিমায় কার্তিক-গণেশ ও লক্ষ্মী-সরস্বতীর সমাবেশ ঘটেছে, তা আমাদের জানা নেই। আর এক কথা। প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যে মহিষমর্দিনীর যে সবচেয়ে পুরানো নিদর্শন আমরা আলাহাবাদের নিকট ভিটা গ্রাম থেকে পেয়েছি, তাতে মা দ্বিভুজা। পরবর্তী নিদর্শনসমূহে মা ক্রমশ বহুভুজা হয়েছেন। প্রাচীন ভাস্কর্যে নবপত্রিকারও কোন স্থান ছিল না।

এখন মায়ের প্রতিমার পাশে নবপত্রিকা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে, কেননা নবপত্রিকাকে স্নান করিয়ে না আনলে, মায়ের সপ্তমী পূজাই আরম্ভ হয় না। নবপত্রিকাকে অবগুণ্ঠনবতী নববধূর বেশে সজ্জিত শ্বেত অপরাজিতার লতা ও হলুদ রঙের সুতা দিয়ে

বাঁধা শক্তির বিভিন্ন রূপের অধিষ্ঠান, কলা প্রভৃতি নয়টি বিভিন্ন গাছের চারা দিয়ে তৈরি করা হয়। এই নয়টি গাছের মধ্যে কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন ব্রাহ্মণী, কচুর কালী, হরিদ্রার দুর্গা, জয়ন্তীর কার্তিকী, বেলের শিবা, ডালিমের রক্তদন্তিকা, অশোকের শোকরহিতা, মানকচুর চামুণ্ডা ও ধানের লক্ষ্মী। গণেশের মূর্তির পাশে নবপত্রিকা স্থাপিত হয় বলে সাধারণের ধারণা নবপত্রিকা গণেশের স্ত্রী।

বাঙালি আজ যে দেশেই গিয়েছে, সঙ্গে করে সেখানে নিয়ে গিয়েছে তার দুর্গাপূজার উৎসবকে। ঠিক অনুরূপভাবে বাঙালি যখন প্রথম কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেছিল, সে সঙ্গে করে এনেছিল তার দুর্গাপূজা উৎসবকে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে কলকাতা [illegible] শহর প্রতিষ্ঠিত হবার আগে থেকেই এখানে দুর্গোৎসব ঘটার [illegible]।

সেদিনের দুর্গাপূজা বলতে আমি আমার ছেলেবেলার, তার মানে বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকের দুর্গাপূজার কথা বলছি। আমার ছেলেবেলায় দুর্গাপূজার যে সৌরভ ও হিল্লোল দেখেছি, আজ আর তা নেই। আশমান-জমিন ফারাক হয়ে গিয়েছে। এক অবিকৃত আনন্দ ও উৎসবের মধ্যে ডুবে থাকত সেদিনের মানুষ, পূজার এ ক'টা দিন।

আমাদের ছেলেদের ভারি আনন্দ হত ঠাকুর গড়া দেখতে। আমাদের পাড়ায় বিশ্বাসদের বাড়িতে দুর্গাপূজা হত। প্রতিমাটা তাঁদের বাড়ির ঠাকুর দালানেই গড়া হত। ওই প্রতিমা গড়া দেখবার জন্য আমরা ছেলের দল সারা বৎসরই উৎসুক হয়ে থাকতুম। জন্মাষ্টমীর পর প্রতিমা গড়বার জন্য ওঁদের বাড়িতে কুমোরের দল আসত। ওটাই ছিল প্রাচীন ঐতিহ্য। কলকাতা শহর গড়ে যখন ওঠে, তখন যে সব ঋদ্ধিবান হিন্দু কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেছিলেন, তাঁরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন নিষ্ঠাবান সমাজের সমস্ত ধর্মকর্ম। দোল-দুর্গোৎসব তো তাঁরা করতেনই, তা ছাড়া করতেন আরও কত রকমের পূজা। তখন কুমারটুলির জন্ম হয়নি। প্রতিমা গড়বার জন্য কুমোরেরা আসতেন মৃৎশিল্পের দেশ নদীয়া থেকে। বর্ষার শেষে আসতন, আর সরস্বতী প্রতিমা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত কলকাতায় থাকতেন। তারপর তাঁরা আবার ফিরে যেতেন নিজেদের দেশে। এ ক'মাস তাঁরা কুমারটুলিতে বাসা ভাড়া করে থাকতেন। তারপর কলকাতার জনসংখ্যা যখন বাড়তে লাগল, তখন আগন্তুক কুমোরের দলও বাড়তে লাগল। তখন তাঁরা কুমারটুলিতে স্থায়ী বসবাস শুরু করলেন। সে আজ থেকে অন্তত দুশো বছর আগেকার কথা। কেন না ১৭৮৪-৮৫ সনে মার্ক উড কলকাতার যে মানচিত্র তৈরি করেছিলেন, তাতে কুমারটুলির ঘাটের কোনও উল্লেখ নেই।

যাক, আমার ছেলেবেলার যে কথা বলছিলাম, সে প্রসঙ্গেই ফিরে আসা যাক। বিশ্বাসদের বাড়ি আমরা যখন ঠাকুর-গড়া দেখতে যেতুম, তখন কুমোররা আসত কুমারটুলি থেকে। তখন তাদের আমরা কুমোর বলেই জানতুম, আর পাঁচরকম কারিগরের মতো, কারিগর হিসাবে, মাত্র। তাঁরা যে আমাদের দেশের এক রকম শিল্পী, যাঁরা দেবতাকে দেন রূপ, তা জানতুম না। সে চেতনা আমাদের তখনও হয়নি।

প্রতিমাটা গড়া হত একটা কাঠের তৈরি কাঠামোর ওপর। ওই কাঠামোটা বিশ্বাসদের বহুকালের। অতীতে তাঁদের কোনও এক পূর্বপুরুষ, যিনি প্রথম দুর্গাপূজা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনিই ওটা তৈরি করেছিলেন। তারপর থেকে ওই একই কাঠামোপূজা করে তার ওপর প্রতিমা গড়া হত।

বিশ্বাসবাড়ি কুমোররা এলেই আমরা ছেলের দল, ঠাকুরদালানে ওঠবার সিঁড়ির এক পাশে গিয়ে বসতুম এবং কুমোররা কী করে ঠাকুর গড়ে তা দেখতুম। ভারি আনন্দ হত দেখতে, কীভাবে তাঁরা বেলেমাটি, এটেল মাটি, তুস, গোবর ইত্যাদি দিয়ে দেবতার মূর্তি গড়ে তুলতো। কখনও কখনও দেখতে দেখতে আমরা এমনই বিহ্বল হয়ে পড়তাম যে

খাওয়া দাওয়া ভুলে যেতুম। বাড়ি থেকে ডাকের পর ডাক আসত, কিন্তু আমাদের ঠাকুর গড়া দেখতেই মন থাকত। আমাদের উত্তেজনা বিশেষ করে বাড়ত, যখন অসুরের মূর্তিটা তৈরি করা হত। অনেক সময় আমরা বলতাম, 'কুমোরদাদা, অসুর ব্যাটার মুণ্ডুটা সিংগির মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিন।' কুমোরদাদা বলতেন, 'তা কি কখনও হয় দাদু, মা যে একে বধ করবেন। সিংগিব্যাটা যদি একে খেয়ে ফেলে, তা হলে মা কাকে বধ করবেন?' আমরা কুমোরদাদার যুক্তিটা বুঝতাম।

পূজার আর পনেরো কি কুড়ি দিন দেরি আছে। বাবা সেদিন রাত্রে জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁরে, বিশ্বাসবাড়ির ঠাকুর-গড়া কি শেষ হল?" বললাম প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এখন শুধু রঙ তেল করা ও ডাকের সাজ সাজানো বাকি আছে।

সেকালে ডাকের সাজ ছিল মায়ের ডাকসাইটে সাজ। এগুলো যাঁরা তৈরি করতেন, তাঁরাও বড় শিল্পী। তাঁরা মালাকার শ্রেণীরই এক শাখা। এঁদের উপাদান ছিল শোলা। শোলা নিচু জমিতে আপনি আপনি জন্মায়। নদীয়া জেলার বাতের বিলে যে শোলা জন্মায়, তাই হচ্ছে উৎকৃষ্ট। সেজন্য নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ, মাতিয়ারী ও কৃষ্ণনগর সদরই ছিল শোলা-শিল্পীদের কেন্দ্র। তবে অন্য জেলাতেও অনেক শোলা-শিল্পী ছিলেন। যথা, হাওড়া জেলার বালি-ব্যারাকপুর ও আমতা; হুগলির ডানকুনি, উত্তরপাড়া ও শিয়াখালা; চব্বিশ পরগণার খড়দহ; মেদিনীপুরের তমলুক ও গড়বেতা; বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ও সোনামুখী; বর্ধমানের কাটোয়া, দোমহনী ও জামুরিয়া; মুর্শিদাবাদের বহরমপুর ও বেলডাঙ্গা ও বীরভূমের খয়রাশোল, দুবরাজপুর ও ময়ূরেশ্বর।

কুমোরদের কাজটা যে একটা বিশিষ্ট শিল্প, তা বেশ বড় হয়ে বুঝলাম। কুমোরপাড়ার তখন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কারিগর ছিলেন গোপেশ্বর পাল। কুমোরপাড়ায় অত বড় শিল্পী আর জন্মায়নি। তাঁর হাত ও মনের মধ্যে ছিল ভগবানের অসীম করুণা। দু-চার মিনিটের মধ্যেই যে-কোনও লোকের আবক্ষমূর্তি তিনি তৈরি করে ফেলতে পারতেন। তাঁর শিল্পপ্রতিভার পরিচয় দেবার জন্য তিনি আহূত হলেন লণ্ডনের ব্রিটিশ এম্পায়ার একজিবিশনে। ডেক প্যাসেঞ্জার হয়ে যাচ্ছিলেন বিলাতে। একদিন হঠাৎ জাহাজের ক্যাপ্টেনের নজরে পড়ল, লোকটা সারাদিন ধরে মাটি নিয়ে কী গড়ে, আর ভাঙে। মুহূর্তের মধ্যে গোপেশ্বর তৈরি করে দিলেন ক্যাপ্টেনের মূর্তি। চমৎকৃত হলেন ক্যাপ্টেন। বুঝলেন লোকটি মস্ত বড় শিল্পী। নিজের দায়িত্বেই শিল্পীকে নিয়ে গিয়ে স্থান দিলেন সেকেণ্ড ক্লাস কেবিনে। এসব রূপকথার মতো শোনায়, কিন্তু সবই সত্য।

একজিবিশনে আসছেন ডিউক অভ কনট। বেঙ্গল প্যাভিলিয়নে থাকবেন পাঁচ মিনিট। কিন্তু ওই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গোপেশ্বর তৈরি করে দিলেন ডিউক অভ কনটের মূর্তি। অবাক হয়ে গেল দর্শকরা। গোপেশ্বর পালের সমকক্ষ না হোক, এরকম শিল্পী কুমারটুলিতে বহু কাল ধরেই আছেন। তবে তাঁরা অবহেলিত।

বিশ্বাসবাড়ির পূজা বন্ধ হয়ে গেল, বিশ্বাস-মায়ের একমাত্র ছেলের মৃত্যুর পর থেকে। পাড়ায় দুর্গাপূজা শুরু হল আমাদের বাড়ি। আমার বাবাই এটা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আমাদের বাড়ি রাধাষ্টমীতে, কার্তিকপূজা হত, কিন্তু ঠাকুর তৈরি হত কুমারটুলিতে। আমাদের ঠাকুর তৈরি করতেন জিতেন পাল। তিনি এসে কাঠামোটা নিয়ে

করতেন। দিতেন পাল আরও তৈরি করতেন বাগবাজার সার্বজনীনের ঠাকুর। আমাদের বাড়ির পূজো বন্ধ হয়ে গেল আমার মার মৃত্যুর পর, ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে।

বাড়িতে যখন পূজা হত, তখন কী উন্মাদনা ছিল আমাদের। ঢাকের বাজনার তালে তালে নেচে উঠত আমাদের মন। আমাদের বাঁধা ঢুলির দল ছিল। তারা পূজোর দু-চারদিন আগেই আমাদের বাড়ি এসে হাজির হতেন। আজ মাইকের প্রতিঘাতে এঁরা অনেক জায়গাতেই প্রত্যাখ্যাত অথচ এঁদের মধ্যেও থাকতো দক্ষ শিল্পী। অনেক সময় এদের সঙ্গে এমন সব সানাইবাদক থাকতো, যাঁরা আজ কালকার নামজাদা সানাইবাদকদের চেয়ে কম কৃতবিদ্য নন। পূজামণ্ডপে তাঁদের আলাপিত রাগরাগিনী আজ হারিয়ে গিয়েছে মাইক-পরিবেশিত সিনেমা তারকাদের গানের প্রতিঘাতে।

আমাদের সমাজজীবনে সেদিনের অনেক কিছুই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বেঁচে আছে শুধু তন্তুজ শিল্প; তা পূজোর সময় নতুন কাপড় না পরলেই নয়, সেজন্য।

'আনন্দময়ীর আগমনে, আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে'—এ গান থেকেই বুঝতে পারা যায় যে পূজার সময় সে যুগের সমাজজীবনে বয়ে যেত এক অপূর্ব আনন্দের স্রোত। বিশেষ করে আজকের অবহেলিত শিল্পীদের আনন্দই ছিল সবচেয়ে বেশি। পূজার সময়টাই ছিল তাঁদের মরশুম। আজ পূজা-নির্ভর শিল্পগুলি অধিকাংশই অবহেলিত। সেইসব শিল্পীদের কোনও দিনই আমরা সংবর্ধনার আসরে ডাকিনি। তাঁদের জন্য কোনও সম্মান-পুরস্কার বা শিরোপাও রেখে দিইনি। অথচ একদিন তাঁরাই ছিলেন আমাদের পূজার আনন্দের উৎস। কালের চাকার বিবর্তনে, সমাজজীবনে সে পরিবেশ আজ বিধ্বস্ত।
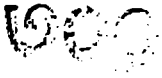
হিন্দুর বিশ্বাস বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ গোপীনিদের সঙ্গে রাসলীলা করেছিলেন। কিন্তু কোন প্রাচীন গ্রন্থে এর উল্লেখ নেই। অথচ বাঙালির 'বার মাসে তের পার্বণ' এর মধ্যে রাসলীলা একটা জনপ্রিয় উৎসব। গত কয়েক শ' বছরের বাঙালি নিরবচ্ছিন্নভাবে মহাসমারোহের সঙ্গে রাসলীলা উৎসব পালন করে এসেছে। সেজন্য মনে হয় এটা চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম উদ্ভবের পরই প্রচলিত হয়েছে। তার পূর্বে কার্তিকী পূর্ণিমার সময় বোধ হয় নবদ্বীপে কালীপূজার সমারোহ হত, কেননা নবদ্বীপে তখন শাক্ত ধর্মেরই প্রাধান্য ছিল। বর্তমানের নবদ্বীপে রাসপূর্ণিমার সময় মহাঘটা ও সমারোহের সঙ্গে কালীপূজা হয়। যাঁরা এই কালীপূজা দেখেছেন তাঁদের মনে হবে এ যেন বৈষ্ণবদের রাসলীলা উৎসবকে স্তিমিত করবার জন্য শাক্তদের এক প্রচেষ্টা।

কিন্তু অন্যত্র রাস পূর্ণিমার দিন রাসলীলা উৎসবই হয়। কলকাতায় এক সময় খুব জাঁকজমকের সঙ্গে রাসলীলা উৎসব অনুষ্ঠিত হত। কলকাতার প্রসিদ্ধ রাস ছিল গোকুল মিত্রের বাড়ির রাস, দর্জিপাড়ার রাস ও রূপলাল মল্লিকের বাড়ির রাস। গোকুল মিত্রের বাড়ির রাস আমি আমার ছেলেবেলায় দেখেছি। বিরাট মেলা বসতো এবং অনেক পুতুল ও সঙ তৈরি করে বিভিন্ন পৌরাণিক ও সামাজিক দৃশ্য দেখানো হত। তবে গোকুল মিত্রের জীবদ্দশায় রাস উৎসবের আরও বেশি ঘটা হত। ওঁদের বাড়ির দক্ষিণে একটা দিঘি ছিল। রাসের সময় ওই দিঘিতে চারখানা নৌকা ভাসিয়ে মেয়েদের কবির গান হত। গোকুল মিত্রের বাড়ির রাসের সূচনা হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নের পর লবণ ব্যবসায়ে ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ঘোড়ার রসদ বেচে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন। এই সময়েই বিষ্ণুপুরের রাজারা তাঁর কাছে তাঁদের গৃহদেবতা মদনমোহন বিগ্রহকে বন্ধক রেখে এক লক্ষ টাকা কর্জ নেন। গোকুল মিত্রের মদন নামে এক ভৃত্য ছিল। একদিন মদনের অনুপস্থিতিতে গোকুল মিত্রের ডাকে সাড়া দিয়ে ঠাকুর মদনমোহন নিজে এসে তাঁকে তামাক সেজে দেন। মদনমোহনকে জাগত দেবতা দেখে গোকুল মিত্র অনুরূপ আর একটি বিগ্রহ তৈরি করান, এবং বিষ্ণুপুরের রাজারা যখন দেনা শোধ করেন, তখন তাঁদের সেই নকল বিগ্রহটি দেন। আসল বিগ্রহটি তিনি নিজ বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকেই ও অঞ্চলটির নাম হয় মদনমোহনতলা। এবং এই সময় থেকেই গোকুল মিত্রের বাড়িতে রাস উৎসবের সূচনা হয়।

তবে গোকুল মিত্রের রাসের আগে কলকাতার বড় রাস ছিল গোঁসাই ঠাকরুণের রাস। কে এই গোঁসাই ঠাকরুণ তা আমরা জানি না। তবে তাঁর রাস যে এক বিখ্যাত রাস ছিল, তা তাঁর রাসাঞ্চলের নাম 'রাসপল্লী' থেকে আমরা বুঝতে পারি। এই রাসপল্লীতে এসেই নবকৃষ্ণ দেব তাঁর বসতি স্থাপন করেছিলেন, এবং পরবর্তীকালে এর নাম হয়েছিল শোভাবাজার।

ঊনবিংশ শতাব্দীর রাসের অনেক খবর আমরা সমসাময়িক সংবাদপত্র থেকে পাই। ২২ নভেম্বর ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের এক সংবাদপত্রে আমরা পড়ি যে সাহেব-মেমেরাও হিন্দুর

বাড়িতে রাসলীলা উৎসবের সময় সমবেত হয়ে আমোদ করতেন। রূপলাল মল্লিক রাসলীলা উৎসবের সময় তাঁর বাড়িতে নাচগানের ব্যবস্থা করতেন এবং এই উপলক্ষে সাহেবদের নিমন্ত্রণ করতেন। সাহেবরা নর্তকীদের নাচগানে তুষ্ট হয়ে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করতেন। তারপর সাহেবদের ভূরিভোজে আপ্যায়িত করা হত। সংবাদপত্রে লিখিত হয়েছিল—'নাচঘরের নীচের তলাতে চারি মেজ সাজাইয়া নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া মেজ পরিপূর্ণ করিয়াছিল। তাহাতে সাহেবেরা তৃপ্ত হইলেন ও মদিরা পান দ্বারা সকলেই আমোদিত হইলেন এবং বাদশাহী পল্টনের বাদ্যকরেরা অনুরাগে নানারাগে বাদ্য করিল। তাহাতে শ্রোতা ব্যক্তির মনোহরণ হইল। সকলে কহে যে এমত নাচ বাবুদের ঘরে আর কোথাও হয় নাই।'

তবে উনবিংশ শতাব্দীতে সবচেয়ে বড় রাস উৎসব ও মেলা হত খড়দহে শ্যামসুন্দর ঠাকুরের মন্দির প্রাঙ্গণে। বিশ-ত্রিশ মাইল দূর থেকে হাজার হাজার নরনারী এই মেলায় যোগদান করত। কলকাতা থেকে বহু নরনারী পানসি করে এই মেলায় সমবেত হত। এই মেলার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল জুয়াখেলা। সে যুগের জুয়াখেলা এক ভীষণ ব্যাপার ছিল। জুয়ার নেশায় মত্ত হয়ে লোক নিজ স্ত্রীকে পর্যন্ত বন্ধক রাখত। সমসাময়িক সংবাদপত্রে আমরা পড়ি যে খড়দহের মেলায় জুয়াখেলা নিবারণার্থ সরকার বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন। টালিগঞ্জে মণ্ডলদের রাসের মেলাও খুব বিখ্যাত ছিল। ওখানে বাইজী ও খেমটাওয়ালীদের নাচও হত।

সে যুগের কলকাতায় রাসলীলা উৎসব যে মাত্র বাবুদের বাড়িতেই হত, তা নয়। যেসব গৃহস্থদের বাড়িতে নারায়ণশিলা বা কোন বৈষ্ণবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তারাও রাসলীলা উৎসব করতেন। বড়দিনের সময় খ্রীষ্টানরা যেমন রঙিন কাগজের পতাকাদি দিয়ে গৃহসজ্জা করে, হিন্দু গৃহস্থরাও তেমনি শোলার তৈরি রঙিন শোভনদ্রব্য দিয়ে তাদের ঘরদোর সজ্জিত করত। সেকালের লোকের কাছে রাসলীলা যে একটা খুব জনপ্রিয় ও আনন্দের ব্যাপার ছিল, তা বুঝতে পারা যেত, কালীঘাটে রাসলীলার পট কেনার আগ্রহ থেকে।

কলকাতায় রাসের দিনের একটা প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে পরেশনাথের মিছিল। তবে আজকের দিনে রাসের উৎসব যেমন স্তিমিত হয়ে এসেছে, পরেশনাথের মিছিলের জাঁকজমকও বহুল পরিমাণে কমে গিয়েছে। আমাদের ছেলেবেলায় পরেশনাথের মিছিল খুব বিরাট আকারের হত, এবং মিছিল অতিক্রম করতে একঘণ্টা সময় লাগত। আজকাল বিশ-পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই মিছিল শেষ হয়ে যায়।

সবশেষে কলকাতার এক বিচিত্র রাসের কথা বলব। এ রাস চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত হ'ত। আহিরীটোলার নিমাইচাঁদ গোস্বামী এই রাস করতেন। শ্রীকৃষ্ণের রাস যেমন কার্তিক মাসে হয়, বলরামের রাস তেমনি হয় চৈত্র মাসে। একমাত্র নিমু গোস্বামিই এই রাস করতেন। এ রাস সেকালের কলকাতায় এক দর্শনীয় ব্যাপার ছিল। নিমু গোস্বামী আর কোন পাল-পরব করতেন না। সেজন্যই বাঙলাদেশে প্রবচনের সৃষ্টি হয়েছে 'জন্মের মধ্যে কর্ম, নিমাইয়ের চৈত্র মাসে রাস'।

যাট-সত্তর বছর আগে গ্রামোফোন রেকর্ডে একটা জনপ্রিয় গান ছিল —'আজ ফাগুনে এলে কি শ্যাম খেলতে হোলি বৃন্দাবনে।' কিন্তু বৃন্দাবনে শ্যামের হোলি খেলার উল্লেখ কোন প্রাচীন গ্রন্থে নেই। এমনকি মধ্যযুগের জীমূতবাহন, বৃহস্পতি রায়মুকুট, শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি প্রমুখদের গ্রন্থসমূহেও নেই। বাঙলাদেশের লোক সাধারণ হোলিকে শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা বলে। কিন্তু স্কন্দপুরাণের 'ফাল্গুন মাহাত্ম্য' অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ নিজে অন্য কথা বলেছেন। ওই কাহিনী অনুযায়ী যুধিষ্ঠির দোলযাত্রার বিবরণ জানতে চাইলে, শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন- সত্যযুগে রঘু নামে এক ধার্মিক ও গুণবান রাজা ছিলেন। তাঁর রাজ্যে দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও অকালমৃত্যু ছিল না। কিন্তু একবার ঢুণ্ঢা নামে এক রাক্ষসীর প্রভাবে প্রজারা ব্যাধিগ্রস্ত হয়। প্রজারা রাজার শরণাপন্ন হলে, রাজা পুরোহিতের কাছে ঢুণ্ঢার বিবরণ জানতে চান। পুরোহিত বলেন, পুরাকালে মালিনীর কন্যা ঢুণ্ঢা কঠোর তপস্যা করে শিবকে তুষ্ট করে। শিবের কাছে সে অমরত্ব বর চায়। শিব বর দেন, মর্ত্য বা সুরলোকে কোন শক্তি তার অনিষ্ট করতে পারবে না। কেবল ঋতু পরিবর্তনের সময় উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি ও বালকগণ হতে তার বিশেষ ভয় থাকবে। বালকগণ তার বৈরী জানতে পেরে রাক্ষসী তাদের নানারূপে নির্যাতিত করতে থাকে। পুরোহিত বললেন ওই রাক্ষসীর হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে হলে হই হল্লা করে শুষ্ক কাষ্ঠ দ্বারা ওকে আগুনে পুড়িয়ে মারতে হবে। দোলের আগের দিন চতুর্দশী তিথিতে যে চাঁচর উৎসব হয়, সেটাই ঢুণ্ঢা বধের স্মৃতি।

এখন ঢুণ্ঢা রাক্ষসী মেণ্টাসুরে দাঁড়িয়েছে। একশ বছর আগে এটা খুব আনন্দের ব্যাপার ছিল। গ্রামের আবালবৃদ্ধ সকলে খড় বাঁশ ইত্যাদি দ্বারা মেণ্টাসুরের নরমূর্তি তৈরি করে সন্ধ্যার সময় বিপুল হর্ষধ্বনি সহ ওই মূর্তি অগ্নিযোগে ভস্মীভূত করত। এটাই চাঁচর।

কিন্তু লোক কাহিনী অনুযায়ী দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু নিজ ভগিনী হোলিকা রাক্ষসীকে তাঁর পুত্র হরিভক্ত প্রহ্লাদকে বধ করবার জন্য নিযুক্ত করে। হোলিকা এক বিরাট আগুন জ্বেলে তার মধ্যে প্রহ্লাদকে ফেলে দেয়। কিন্তু বিষ্ণুর কৃপায় প্রহ্লাদ রক্ষা পায়, এবং হোলিকা নিজেই ওই আগুনে পুড়ে মারা যায়। এই হোলিকা রাক্ষসীর নাম থেকেই 'হোলি' নামের উৎপত্তি হয়েছে।

দোলযাত্রার উদ্ভব হয়েছিল সূর্যের উত্তরায়ণের সূচনায় বসন্ত ঋতুর আগমন থেকে। উত্তরায়ণ শুরু হয়, চন্দ্র যখন ফাল্গুনী নক্ষত্রের পাশ দিয়ে যায়। এটা ঘটে ফাল্গুনী পূর্ণিমায়। এই সময় বসন্ত ঋতুর উদগম হয়। মানুষ তখন শীতের হাত থেকে রক্ষা পায়। প্রকৃতি নূতন রূপ ধারণ করে। মানুষের মন তখন উল্লসিত হয়ে ওঠে। হর্ষে মানুষ উৎসবে মেতে ওঠে।

মনে হয় বসন্তের উদগমে দেশের নানা প্রান্তে লোকসমাজে যে সব উৎসব পালিত হত, সেগুলোই কালক্রমে হোলি উৎসবে পরিণত হয়েছে। উত্তর ভারতের লোক অবশ্য একে 'হোলি' বলে। কিন্তু বাঙলা ও ওড়িশার লোকরা 'দোলযাত্রা' বলে। দাক্ষিণাত্যে এর নাম 'সিঙ্গা'। আর একেবারে দক্ষিণাঞ্চলের লোকরা বলে 'কমনন হব্ব'।

হিন্দুরা এ সময় পরস্পরের গায়ে রঙ দিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে। তবে বাঙলায় ও

ওড়িশায় এটা ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনই পালিত হয়। কিন্তু উত্তর ভারতে এটা পালিত হয় পূর্ণিমা কেটে গেলে প্রতিপদে।

হোলিতে পরস্পরের গায়ে রঙ দিয়ে রঙ্গরস করা এক সময় মুসলমান সমাজেও প্রচলিত ছিল। এটা আমরা জানতে পারি সম্রাট আকবরের অন্তঃপুরে হোলি খেলার এক চিত্র থেকে। বঙ্কিমের 'রাজসিংহ' ও রবীন্দ্রনাথের 'কথা' তার প্রতিধ্বনি বহন করছে।

কলকাতার বাঙালী সমাজে হোলি এখন ম্রিয়মাণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমাদের ছেলেবেলায় এটা এক বেশ বড় উৎসব ছিল। তার চেয়েও বড় উৎসব ছিল আরও একশ বছর আগে। তখনকার লোক কোনও বর্ধিষ্ণু পরিবারের উল্লেখ করতে গিয়ে প্রায়ই বলতে 'ওদের বাড়ি দোল-দুর্গোৎসব হয়।' তার মানে, এটা দুর্গোৎসবের মতই একটা বড় উৎসব ছিল। এর আমরা সমর্থন পাই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের সরকারি ছুটির তালিকা থেকে। অন্যান্য পরবে সরকারি আপিস যেখানে দু-একদিন বন্ধ রাখা হত, দুর্গোৎসবে বন্ধ রাখা হত আটদিন ও দোলযাত্রায় পাঁচদিন। সে সময় দোল উপলক্ষে সঙও বেরুত। মিছিল করে লোক এমন কুৎসিত সঙ প্রকাশ্যে বের করত ও অশ্রাব্য গান গাইত যে আজকালকার লোক তা কল্পনাও করতে পারে না। মেয়ে-পুরুষ যাকে সামনে পেত, তারই গায়ে রঙ দিত। কারুর গায়েই রঙ ছাড়া কাপড় থাকত না। তাছাড়া, আবির ও রঙে পথঘাট লাল হয়ে যেত। লোক তা নিয়ে খুব আমোদ করত।

কলকাতার বড়লোকদের বাড়ি খুব ঘটা করেই দোলোৎসব হত। বেশ সমারোহের সঙ্গেই দোলোৎসব হত রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম হয়ে গেলেও, ঠাকুরবাড়িতে দোলে বেশ মাতামাতি হত। বাগবাজারে ভুবন নিয়োগীর বাড়িতেও খুব ঘটা করে দোলোৎসব হত।

বর্তমান শতাব্দীর ত্রিশের দশকের আরম্ভ পর্যন্ত প্রতি গৃহস্থকে জামাইবাড়ি দোলের 'তত্ত্ব' করতে হত। কাপড়-জামা, মিষ্টান্ন, পিতলের পিচকারি, পিতলের বালতি, রঙের বাক্স, আবির, সাদা বাতাসা, সাদা ও রঙিন 'মঠ', চিনির মুড়কি, ফুটকড়াই, তিলেখাজা ইত্যাদি পাঠাতে হত। এখন এটা বন্ধই হয়ে গিয়েছে।

আমাদের ছেলেবেলায় দোলের দিন সকালে যেরকম মাতামাতি হত, তার বর্ণনা ভাষায় ফুটিয়ে তোলা কঠিন। তখন জারমানি থেকে সস্তার রঙ আসত, সেজন্য রঙ ছোড়াটা খুব বেশি রকমের হত। তাছাড়া, একটা পিচকারির দামও ছিল খুব সস্তা। বাঁশের পিচকারি এক পয়সা। টিনের পিচকারি সাইজ অনুযায়ী দু-পয়সা থেকে দু-আনা ও পিতলের ছ-আনা থেকে দশ আনা। অন্তঃপুরে মেয়েরাও রঙ নিয়ে খুব মাতামাতি করত। আর বাইরে রাস্তায় ছেলেরা যাকে পেত তার গায়ে রঙ দিত। সেজন্য সেকালে দোলের দিন লোক ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে রাস্তায় বেরুত। তবে কনিষ্ঠরা কখনও নিজ গুরুজনদের গায়ে রঙ দিত না। মাত্র কপালে কি পায়ে আবির দিত। যদিও মুসলমানরা এটা পছন্দ করত না, তার ফলেও ছেলেরা মুসলমানদের গায়েও রঙ দিত। সেজন্য দোলের দিন মুসলমানরা হিন্দুপাড়ার ভেতর দিয়ে যাতায়াত করত না। সকালে রঙের খেলা শেষ হয়ে গেলে, বিকালে আবির খেলা হত। বিকালে কনসার্ট পার্টি ও গানও বেরুত।

## সেকালের শিবরাত্রি

আমার জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত, এই সময়কালের মধ্যে তিন-চার পুরুষের ব্যবধান ঘটেছে। এই ব্যবধানের অন্তরালে বাঙালীর লৌকিক জীবনে ঘটে গিয়েছে অভূতপূর্ব পরিবর্তন। সেজন্য আমার ছেলেবেলার, তার মানে শতাব্দীর মুখপাতের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, পাল-পরব, আমোদ-প্রমোদ বর্তমান প্রজন্মের লোকের কাছে বিচিত্র ঠেকবে। যেমন তখনকার দিনে দোকান থেকে কিছু জিনিসপত্তর কিনলে, দোকানদার একটা ফর্দ দিতো। তাতে জিনিসের নাম পরিমাণ ও মূল্য লেখা থাকতো। আর সকলের তলায় লেখা থাকতো বৃত্তির পরিমাণ। প্রতি ক্রেতাকেই বৃত্তি দিতে হতো, ক্রীত মালের মোট পরিমাণের ওপর প্রতি টাকায় এক পয়সা হারে। এক বছরের জমানো বৃত্তির টাকাতেই সেকালে ব্যবসায়ীরা বারোয়ারি পূজা করতো। এভাবেই হতো চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পূজা ও কলকাতার কোন কোন বাজারে শিবরাত্রি পূজা।

আমার জন্ম কলকাতার শ্যামবাজারে। সেকালে উত্তর কলকাতায় শ্যামবাজারের বাজারের মত বাজার আর দ্বিতীয় ছিল না। সুতরাং শ্যামবাজারের দোকানদারদের ঘরে বিপুল পরিমাণ বৃত্তির টাকা জমতো। সেই টাকায় খুব ঘটা করে শ্যামবাজারের বাজারে শিবরাত্রি পূজা-উৎসব হতো। একতলা সমান উঁচু একটা প্রতিমা আসতো। বাজারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে এসময় প্রকাশ পেত প্রচণ্ড উৎসাহ ও উত্তেজনা। তিন-চার দিন উৎসবের এই উৎসাহ ও উত্তেজনার মধ্যেই তারা মেতে থাকতো। উদ্যম, উৎসাহ ও উত্তেজনা চরমে উঠত রাত্রিকালে। কেননা, প্রতিদিন রাত্রিকালে হতো যাত্রাভিনয়। ছেলেবেলায় এই যাত্রাভিনয় দেখবার জন্য আমরা বাজারে গিয়ে জমা হতাম। ভীষণ ভীড় হতো। ওই ভীড়ের মধ্যেই সুবিধামত একটা স্থান করে নিতাম। সমস্ত রাত্রি জেগে যাত্রাভিনয় দেখতাম। তবে বেশ মজা লাগতো যেদিন 'উড়ে যাত্রা' হতো। সেকালের আমোদ-প্রমোদ ও বিনোদনের ক্ষেত্রে, 'অবশ্য' অঙ্গ হিসাবে 'উড়ে যাত্রা'র একটা স্থান ছিল। 'উড়ে যাত্রা' হচ্ছে ওড়িশাবাসীদের দ্বারা অভিনীত যাত্রাভিনয়। উড়ে যাত্রার সঙ্গে বাঙালি যাত্রার অনেক প্রভেদ ছিল—যদিও এ দু'রকম যাত্রার অভিনয়ই মেঝের ওপর পাতা আসরের ওপর এ দুরকম যাত্রাতেই পুরুষরা মেয়ে সেজে অভিনয় করতো। উড়ে যাত্রার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নানা রকম বর্ণাঢ্য পোশাক পড়তো। অবশ্য বাংলা যাত্রাতেও অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নানা রকম বর্ণাঢ্য পোশাক করতো, কিন্তু আলোর ঝলমলানিতে উড়ে যাত্রার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাছে তা হার মানতো। সবচেয়ে বেশি মজা লাগতো ওড়িয়া ভাষার কথোপকথন ও গান—যদিও উড়ে যাত্রায় গানের প্রাধান্য বাংলা যাত্রার মত হ'ত না।

কোথাও কোথাও আবার তিনদিনের যাত্রাভিনয়ের সঙ্গে পুতুল-নাচও হতো। যাত্রাভিনয়ে যেমন সজীব মানুষরা অভিনয় করতো পুতুল-নাচে অভিনয় করতো নির্জীব কাঠের পুতুল। কিন্তু নির্জীব হলে কি হবে। প্রতি পুতুলের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে নেমে আসত ঝুলানো দড়ি, আর সামনে মানুষ-প্রমাণ পর্দার আড়ালের পিছন থেকে প্রতি

পুতুল-ধারী মানুষ ওই দড়ির সাহায্যে কাঠের পুতুলগুলোর সঞ্চালনায় একটা সজীবতা দিতো। তবে পুতুল-নাচের নায়ক-নায়িকারা কথা বলতো না। অভিনয়টা অনেকটা নির্বাক যুগের সিনেমার মতো হ'ত। সামনের পর্দার আড়ালের পিছন থেকে যারা দড়ির সাহায্যে এই অভিনয় দেখাতো, তারা যথেষ্ট কলা-কৌশলী শিল্পী ছিল। মোরগের ও বাজার লড়াই, কবির গান ইত্যাদির মত, উড়ের যাত্রা ও পুতুল নাচও আজকের শহরের চিত্তবিনোদন ক্ষেত্র থেকে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

এবার শিবরাত্রি উপলক্ষে বারোয়ারী পূজা-উৎসব ছেড়ে, জনসমাজে প্রচলিত শিবরাত্রি ব্রত পালনের কথায় আসছি। হিন্দুদের পালপার্বণগুলো চান্দ্র মাসের তিথি অনুযায়ী পালিত হয়। কিন্তু মুখ্য চান্দ্রমাস অনেক সময়েই পরবর্তী সৌরমাস পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। যেমন ঘটেছে এ বৎসর। সেজন্য শিবরাত্রি যদিও মুখ্য মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে পালনীয় ব্রত, তা হলেও এবার মুখ্য চান্দ্র মাঘ মাস সৌর ফাল্গুন মাস পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে বলে, শিবরাত্রি ফাল্গুন মাসেই পড়েছে।

হিন্দুদের যে সকল পূজাপার্বণে পুরোহিতের কোন মুখ্য ভূমিকা নেই সেগুলো অধিকাংশই আদিম অনার্য যুগ থেকে পালিত হয়ে এসেছে। শিবরাত্রিও তাই। শিব এমনি তো অনার্য দেবতা, সুতরাং শিবের উৎসব হিসাবে শিবরাত্রি আদিম অনার্য যুগের উৎসব। এটা শিবরাত্রি ব্রত পালন সম্পর্কে যে কাহিনী প্রচলিত আছে, সেটা বিশ্লেষণ করলেই পরিষ্কার বুঝতে পারা যাবে। কাহিনীটা আমি এখানে বিবৃত করছি। একদিন পার্বতী শিবকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কিসে সবচেয়ে বেশি তুষ্ট হও?' শিব বললেন, 'শিবরাত্রির দিন যদি কেউ উপবাস করে আমার মাথায় জল দেয়, তা হলে আমি খুব তুষ্ট হই।' তখন মহাদেব পার্বতীকে একটা কাহিনী বলেন। বারানসীতে এক ব্যাধ ছিল। একদিন সে বহু পশু শিকার করে এবং তার ফিরতে রাত্রি হয়ে যায়। বাঘ-ভাল্লুকের ভয়ে সে এক গাছের উপরে আশ্রয় নেয়। ওই গাছের তলাতেই এক শিবলিঙ্গ ছিল। রাত্রিতে ব্যাধ যখন ঘুমোচ্ছিল, তখন তার এক ফোঁটা ঘাম (মতান্তরে নীহারকণা) মহাদেবের মাথায় পড়ে। সেদিন শিবরাত্রির দিন ছিল এবং ব্যাধও সারাদিন উপবাসী ছিল। মহাদেব তার ওই এক ফোঁটা ঘামেই তুষ্ট হন। যথাসময়ে যখন ব্যাধের মৃত্যু হয়, যমদূত এসে তাকে নরকে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু শিবদূত তাকে বাধা দিয়ে তাকে শিবলোকে নিয়ে যায়। এইভাবে শিবরাত্রি ব্রতের প্রচলন হয়। এই কাহিনীটাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এই কাহিনীটা এমন এক যুগের যে যুগের মানুষের সাধারণ বৃত্তি ছিল পশুশিকার করা। সেটা প্রস্তর যুগের ব্যাপার।

সে যাই হোক শিবরাত্রিটা হচ্ছে একটা খুব জনপ্রিয় ব্রত-উৎসব, বিশেষ করে বাঙলাদেশে। বাঙলাদেশে এর জনপ্রিয়তার কারণ, বাঙলা শিবের দেশ। কেননা বাঙলাদেশে যত শিবমন্দির দেখা যায়, আর ভারতের কোথাও তত নয়।

শিবরাত্রি এক পঞ্চাঙ্গ ব্রতপালন। কেননা, এই ব্রত পালনের 'অবশ্য' অঙ্গ হচ্ছে— উপবাস, গঙ্গাস্নান, নিশিজাগরণ, ব্রতকথা শ্রবণ ও পারণ।

আগেকার দিনে শিবরাত্রি ব্রতপালন খুব নিষ্ঠার সঙ্গে করা হতো। আজকাল এটা একটা হুজুগে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে অল্প বয়স্কা মেয়েদের কাছে। উপবাস করতেই হয়,

কিন্তু মনে হয় আজকালকার মেয়েরা উপবাসের চেয়ে দলবেঁধে সাড়ম্বরে গঙ্গাস্নানে যাওয়াটার ওপরই বেশি জোর দেয়। এই ব্রতপালনে নিশিজাগরণ অবশ্য করণীয়, তবে পরদিন দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ। উপবাসান্তে পরদিন প্রাতে শিবের মাথায় জল ঢালা হয়। এরপর ব্রতকথা শুনে উপবাস ভঙ্গ করা হয়। এটাকেই 'পারণ' বলা হয়।

বলা হয় শিবরাত্রি ব্রতপালন উপলক্ষে গঙ্গাস্নানে বহুশত সূর্যগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানের সমান ফল পাওয়া যায়। নিষ্ঠাবান লোকেরা গঙ্গাস্নানের সময় একটা মন্ত্রও পাঠ করে। মন্ত্রটা হচ্ছে—'করতোয়া সদানীরে সরিচ্ছেষ্ঠে সুবিশ্রুতে পৌণ্ড্রান প্লাবয়সে নিতং পাপং হর করোদ্ভবে।'

শিবরাত্রি উপলক্ষে অনেক জায়গায় মেলা বসে। কলকাতার কাছে খুব সমারোহের সঙ্গে বড় মেলা হয় তারকেশ্বরে। বাঙলাদেশের আরও যেসব জায়গায় বিরাট মেলা বসে তার মধ্যে উল্লেখনীয় মুর্শিদাবাদ জেলার কাঞ্চনতলা গ্রামে ও ওই জেলারই বক্রেশ্বর গ্রামে, বীরভূম জেলার তারাপীঠে ও বক্রেশ্বরে, হাওড়া জেলার জগদ্বল্লভপুরে ও মেদিনীপুর জেলার জাড়া গ্রামে।

বাঙালির আছে বারো মাসে তেরো পার্বণের ঘটা। এই তেরো পার্বণের নির্ঘণ্ট থেকে বছরের শেষ মাসটাও বাদ যায়নি। বৈশাখে মেষ রাশি থেকে শুরু করে বর্ষ রাশিচক্রের শেষ ঘর মীন রাশিতে গিয়ে পৌছয় চৈত্র মাসে। ('[illegible] সংবৎসরঃ')। সুতরাং রাশিচক্র পরিক্রমণের দিক দিয়ে বর্ষ চৈত্র মাসে তার পরিক্রমণের শেষ সীমায় গিয়ে পৌছয়। কিন্তু তা বলে বছরের শেষ মাসের নেই কোনও পার্বণের জীর্ণতা। অন্যান্য মাসের মতো বর্ষশেষের শেষমাস চৈত্রেও (পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র চিত্রা বা সন্নিহিত কোনও নক্ষত্রে থাকে বলে এর নাম 'চৈত্র') বাঙালির জীবন মুখরিত হয়ে থাকে (বা এককালে থাকত) আনন্দ উৎসবের সমারোহে।

'লক্ষ্মীছাড়া'র চেয়ে বড় গালাগাল, বাঙালির কাছে আর কিছু নেই। সেজন্য প্রতি বাঙালি লক্ষ্মীকে ঘরে বেঁধে রাখতে চায়। প্রতি বৃহস্পতিবারে মেয়েরা লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়ে। লক্ষ্মীর বড় পূজা করে বছরে তিনবার—ধানসমেত লক্ষ্মীর ঝাঁপি বসিয়ে। তার মধ্যে চৈত্র মাসের লক্ষ্মীপূজা অন্যতম। তা ছাড়া, চৈত্র মাসের শুক্লা সপ্তমীতে হয় বাসন্তী পূজা তা দুর্গাপূজারই সামিল, কেননা প্রতিমা একই। দেবতাদের পঞ্জিকা অনুযায়ী চৈত্রমাসে অনুষ্ঠিত বাসন্তী পূজাই হচ্ছে আসল দুর্গাপূজা। কেননা, এটাই হচ্ছে দেবতাদের জাগ্রত কালের মধ্যে অনুষ্ঠিত পূজা। রামচন্দ্র কর্তৃক অনুষ্ঠিত শারদীয় পূজা হচ্ছে 'অকালবোধন' বা অকালের পূজা। দেবতারা তখন নিদ্রিত থাকেন। এছাড়া চৈত্র মাসের শুক্লা অষ্টমীতে হয় অন্নপূর্ণা পূজা। দেবী তখন মর্ত্যে আবির্ভূতা হন অন্ন বিতরণের জন্য।

বাসন্তীই বলুন, আর অন্নপূর্ণাই বলুন, সবই হচ্ছে শিব ও শিবানীর পূজা। আবার লক্ষ্মী তাঁদের মেয়ে। সুতরাং চৈত্র মাসটা হচ্ছে শিবেরই পরিবারের পূজা। এটা আবার শিবের বিয়েরও মাস। বাঙালির ধারণা শিবের জন্ম হয়েছিল শ্রাবণ মাসে আর বিবাহ হয়েছিল চৈত্র মাসে—নীলচণ্ডিকা বা নীল পরমেশ্বরীর সঙ্গে।

এটা তো সকলের জানাই আছে যে শিব হচ্ছেন অনার্য দেবতা। শিব কত প্রাচীন দেবতা, তা আমাদের জানা নেই। তবে মহেঞ্জোদরোতে আমরা শিবের প্রতিরূপ মূর্তি পেয়েছি। তা থেকে বোঝা যায় যে অন্তত পাঁচ হাজার বছর ধরে আমরা শিবের পূজা করে আসছি।

বাসন্তী, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী প্রভৃতি পূজা হচ্ছে ব্রাহ্মণশাসিত পুরোহিত প্রধান পূজা। কিন্তু অনার্য সমাজের পূজাপার্বণে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কোনও স্থান নেই। চৈত্র মাসে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত বর্জিত শিবের যে উৎসব হয়, তাকে 'গাজন' বলা হয়। মালদহে বলা হয় গম্ভীরা। গাজন আরম্ভ হয় চৈত্র মাসের শেষে, নীলের উপবাসের দিন থেকে। অবশ্য অনেক জায়গায় গাজন তার আগে থেকেও শুরু হয়। জাতিনির্বিশেষে সকল হিন্দুরমণীই নীলের উপবাস করেন। সেদিন তাঁরা গঙ্গাস্নান করে শিবের মাথায় জল ঢালেন ও শিবকে ফল উৎসর্গ করেন।

গাজনটা অনার্য সমাজ থেকেই এসেছে। প্রথম আসে হিন্দু সমাজের নিম্নকোটির

লোকের মধ্যে, পরে প্রবেশ করে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে। একশো বছর আগে বাঙলার প্রতি গ্রামে গ্রামে গাজন হত। শহরেও হত। ঊনবিংশ শতাব্দীর সংবাদপত্রসমূহ থেকে জানতে পারা যায় যে কলকাতায় তখন অসংখ্যক গাজন হত। এসকল গাজন সাধারণতঃ বড়-লোকের বাড়িতে হত। হুতোম তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র প্রথম নকশা 'বাবুদের বাড়ির গাজন'-এ কলকাতার বড়লোকের বাড়ির গাজনকে অমর করে রেখে গেছেন। বাবুদের বাড়ির গাজনের মধ্যে সাতু-বাবু লাটুবাবুদের বাড়ির গাজন ছিল প্রসিদ্ধ। সমকালীন সংবাদপত্রসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি যে কলকাতার গাজনসমূহের সন্ন্যাসীরা দলে দলে বাণ-ফোঁড়া অবস্থায় কালীঘাট থেকে শহরের বিভিন্ন পাড়ায় নিজ নিজ গাজনতলায় আসত।

অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে গাজনের প্রভাব প্রসারিত হলেও, গাজন মুখ্যত ছিল গ্রামের উৎসব। জানি না, এটা গ্রাম-জনের উৎসব বলেই এটার নাম 'গাজন' হয়েছিল কিনা। তবে অভিধানকাররা বলেন 'গাজন', 'গর্জন' শব্দের অপভ্রংশ।

গাজনের ঘটা ও আনন্দ-উৎসবের সমারোহ অনেক হ্রাস গেলেও গাজন এখনও গ্রামের পাল-পার্বণের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। একজন বিদগ্ধ লেখক বলেছেন—'শারদীয়-পূজা যেমন বাঙলার মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে ঘরে এক আনন্দের উচ্ছ্বাস আনয়ন করে, গাজনও সেই রূপ বাঙলার দরিদ্র অনতিপরিচিত সাধারণ লোকের মধ্যে একটা অপূর্ব উৎসাহ ও মাদকতার সৃষ্টি করে। সমস্ত বৎসর ধরিয়া, তাহারা এই উৎসবের অপেক্ষায় উদগ্রীব হইয়া থাকে— সংসারের নানা আধিব্যাধি অভাব-অভিযোগ প্রপীড়িত ও জর্জরিত হইয়া তাহারা গাজন সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার জন্য দেহ বাণ ও বঁড়শির দ্বারা বিদ্ধ করিবার ও চড়কে ঘুরিবার জন্য মানত করে। তাহাদের আশা, এই রূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহারা পূর্ণ শান্তি লাভ করিতে পারিবে—সাংসারিক দুঃখ-দৈন্য অন্তত কিছুদিনের জন্য আর তাহাদিগকে বিব্রত করিয়া তুলিবে না। তাই চৈত্রের প্রারম্ভে যখন গ্রামপ্রান্তে কর্ণকঠোর ঢক্কানিনাদ এই উৎসবের শুভ সূচনা করে, তখন ইহাদের প্রাণে এক নূতন ভাবের সাড়া পড়িয়া যায়—নবীন ভাবের আবেগ ইহাদিগকে অভিভূত করিয়া ইহাদের মধ্যে অভিনব কর্মপ্রেরণা জাগরি করে।'

গাজনের সময় যাঁরা ব্রত গ্রহণ করে 'সন্ন্যাসী' বা 'ভক্ত' হন তাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণ হতে চণ্ডাল বাউরি পর্যন্ত সকল জাতকেই দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ যাঁরা শিবের কাছে কিছু মানত করেন, তাঁরাই 'সন্ন্যাস' গ্রহণ করেন। তিনদিন থেকে পনেরো দিন পর্যন্ত ব্রত গ্রহণের নিয়ম। অনেকে আবার সমগ্র চৈত্র মাসটাই ব্রত পালন করেন। ব্রতধারীর পক্ষে দিনের বেলায় উপবাস ও স্নানান্তে সন্ধ্যার পর ফলমূল ভোজন। ব্রতধারীর চিহ্ন লটকানে রঞ্জিত ধূতি বা শাড়ি পরিধান, কাঁধে 'উত্তরী' ধারণ ও হাতে বেত্রদণ্ড। সমগ্র মাসই তাঁদের সংযমের মধ্য দিয়ে কাটাতে হয়। চৈত্র সংক্রান্তির কাছাকাছি সময় ব্রতধারীর দল যখন গাজনতলার দিকে অগ্রসর হন, তখন অঞ্চলভেদে তাঁরা উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে বলতে থাকেন 'বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে', 'মহাদেব', 'ব্যোম ব্যোম শিবশঙ্কর', 'শিবনাথ কি মহেশ' ইত্যাদি।

গাজনের একটা প্রধান অঙ্গ হচ্ছে মেলা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিশু'তে লিখেছেন 'মেলা

বসাত গাজনতলার হাটে'। এখন অনেক জায়গায় গাজন উঠে গেলেও মেলাটা বসে। যেমন সাতুবাবু-লাটুবাবুদের বাড়ির সামনের ফুটপাতে এখনও চড়কের দিন মেলা বসে। কলকাতার উপকণ্ঠে সিঁথির গাজনও লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু মেলা এখনও বসে। গাজনের আর একটা আনুষঙ্গিক অঙ্গ ছিল ব্যঙ্গাত্মক সঙের শোভাযাত্রা। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ এপ্রিল তারিখের 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা থেকে আমরা জানতে পারি যে এ রকম সঙ গাজনের দিন চিৎপুরের রাস্তায় অসংখ্য ঢাকের মহাশব্দের সহিত বের হত। ওই বৎসরের এক সঙে দেখানো হয়েছিল যে একজন ইষ্টদেবতাকে সামনে রেখে মালা জপছে, আর রাস্তার দুধারে বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েছেলের মুখ দেখছে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদে এরূপ সঙ বৌবাজারের জেলেপাড়া থেকে বের করা হত। বছরের পর বছর এ সঙ আমি দেখেছি। যে যে ভূমিকায় আবির্ভূত হত, সে সেই ভূমিকার পোশাক পরত। সমসাময়িক সামাজিক, প্রশাসনিক ও পুরসংস্থা প্রভৃতির দুর্নীতি, ধর্মীয় ও শিক্ষায়তনের অনাচার ইত্যাদি অবলম্বন করেই সঙগুলি পরিকল্পিত হত। প্রতি সঙেই একটা করে গীত গাইত। ব্যঙ্গ করে গীতগুলির মাধ্যমে অনাচারীদের চাবুক মারা হত। উদাহরণ স্বরূপ একটা গীত এখানে বিধৃত করছি। এটা পুরসংস্থাকে উপলক্ষ করে রচিত। "হামরা নাম হরি মেথরাণী; মুনসিপালকো হোতা নানী। বেগর হামলোগকো কভি না চলবে কাম, হাম লোগকো ছোটা জবান যব কই বলে। কাম ছোড়দি সবকই মিলে, হামারা জানমে এই সব মিল হোতা। লেকেন বাবু লোককো দুসরা বাত, উঠনে বইঠনে খাতা লাথ। বেসরমী বাবুলোক চটিতা ঝুটাপাত। ফিন বলে ছোঁ মাত মেথরাণী, [illegible] কি ছিঁতা গোবর পানি, জিতা বাহাদুর প্যাটেল ঠাকুর, হাম সাদি করেগা [illegible] বাবুকা লেড়কা সাথ, দে বাবুকা লেড়কীকা সাদি দেব।"

এরপর আরও কিছু অংশ ছিল, কিন্তু আমার তা মনে নেই।

গাজন এখন ম্রিয়মাণ হলেও কলকাতার কাছাকাছি দুটো জায়গায় গাজন এখনও সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে একটা হচ্ছে হুগলী জেলার তারকেশ্বরে। গাজন উপলক্ষে এখানে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয় ও মেলা বসে। আর দ্বিতীয় জায়গাটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার সীমান্তে চন্দনেশ্বর গ্রামে। চন্দনেশ্বর হচ্ছে দীঘার তিন-চার মাইল উত্তর-পশ্চিমে। এখানে চন্দনেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে গাজন উৎসব খুব জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। বাঙালি ও ওড়িয়ারা সমান উৎসাহের সঙ্গে এই উৎসবে যোগদান করে। কয়েক সহস্র লোকের সমাগম হয়।

গাজনের শেষ দিনে অনুষ্ঠিত হয় চড়ক। এই উপলক্ষে একটা কাষ্ঠস্তম্ভের মাথায় আড়ভাবে একটা বাঁশ এমন করে বাঁধা হয় যে তাতে পাক খাওয়া যায়। পিঠে বঁড়শির মতো একটা লোহার শলাকা বিঁধিয়ে সন্ন্যাসীরা ওই আড়ের দিকের বাঁশের শেষ অংশ হতে ঝুলে চড়কগাছে পাক খেতেন। বোধ হয় হঠযোগের সাহায্যে তাঁরা এটা করতে সক্ষম হতেন। কলকাতার বাগবাজার পল্লীর চড়ক বিখ্যাত ছিল। এই চড়কটা হত সেই মাঠে, পরবর্তীকালে যেখানে নন্দলাল বসু ও পশুপতিনাথ বসু তাঁদের বিরাট বসতবাটী তৈরী করেছিলেন। এটার নাম ছিল রামধন ঘোষের চড়ক। একে ১৬ চড়কী বলা হত, কেননা ১৬ জন পিঠ ফুঁড়ে এখানে চড়ক গাছে ঘুরত। কিন্তু চড়ক প্রথাটাকে 'অমানুষিক'

দাবি করে খ্রিষ্টান মিশনারিরা বাঙলা সরকারকে এ প্রথা রহিত করার অনুরোধ করে। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ছোটলাট বিডন এক ইস্তাহার জারি করে এই প্রথা আইন অনুসারে দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করেন। তদবধি সন্ন্যাসীরা পিঠে গামছা বেঁধে তার সাহায্যে চড়ক গাছে পাক খায়।

উপরে বর্ষশেষে বাঙালি জীবনে পালপার্বণের একটা বর্ণনা দিলাম; কিন্তু আজ বাঙালি তার অতীতের এসব পালপার্বণ হারিয়ে ফেলেছে। এমনকি বছরের শেষদিনে যবের ছাতু খাওয়া এবং জলপূর্ণ কলসীদান করে যে 'সর্বপাপক্ষয়ফলম' অর্জন করত, সেটাও সে ভুলে গিয়েছে। অথচ কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাঙালির পালপার্বণসমূহ মাত্র তার জীবনকেই যে আনন্দময় করে তুলত তা নয়, তার গ্রামীণ অর্থনীতিকেও ক্রিয়াশীল রাখত।

## কালী কলকাত্তেওয়ালী

'কালী কলকাত্তেওয়ালী'। উত্তর ভারতের লোকদের কাছে কালীঘাটের কালীর এটাই হচ্ছে অভীধা। এই অভীধা থেকেই কালীঘাটের কালীর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। কালীঘাটের কালীই হচ্ছে কলকাতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মন্দিরটির এখন যেখানে অবস্থান, জনশ্রুতি অনুযায়ী মন্দিরটি আগে ওখানে ছিল না। এখন মন্দিরটি আদিগঙ্গার তীরে অবস্থিত। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মন্দিরটি নাকি ভবানীপুরে ছিল। তবে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল রচনার সময় মন্দিরটি যে আদিগঙ্গার তীরেই অবস্থিত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কালীঘাটকে একান্ন পীঠের অন্যতম পীঠ বলে ধরা হয়। কিন্তু আমার 'কলকাতা' বইয়ে (পৃষ্ঠা ৩৬) দেখিয়েছি যে পীঠস্থান হিসাবে কালীঘাটের স্বীকৃতি খুব আধুনিক কালের। সকলেরই জানা আছে যে পীঠস্থানসমূহের উদ্ভবের সঙ্গে বিষ্ণু কর্তৃক শিবের স্কন্ধস্থিত সতীর শবদেহ বহুখণ্ডিত হবার কাহিনী জড়িত। কিন্তু সতীর দেহখণ্ড যেখানে যেখানে পড়েছিল, সেই সব স্থান এক একটা পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল, এ কাহিনী আমরা সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত 'কালিকাপুরাণ'-এ প্রথম পাই। আগেকার পুরাণসমূহে আমরা দক্ষযজ্ঞের যে কাহিনী পাই, তাতে এটা নেই। কালিকাপুরাণেই এ কাহিনী প্রথম স্থান পায়। তবে 'কালিকাপুরাণ'-এ মাত্র সাতটি পীঠস্থানের নাম আছে। এ সাতটি পীঠস্থান হচ্ছে দেবীকূট, উড্ডিয়ান, কামরূপ, জলন্ধর, পূর্ণগিরি ইত্যাদি। তারপরে রচিত 'রুদ্রযামল' তন্ত্রে ১৮টি, কুব্জিকাতন্ত্রে ৪২টি ও জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে ৫০টি পীঠের নাম পাই। ৫১ টি পীঠের উল্লেখ আমরা তন্ত্রসার, পীঠমালা ও অন্যান্য অর্বাচীন গ্রন্থসমূহে পাই। এগুলো সবই সপ্তদশ শতাব্দী বা তার পরে রচিত। পীঠমালা অনুযায়ী কালীঘাটে দেবীর দক্ষিণ পদাঙ্গুলি পড়েছিল।

মনে হয় কালীঘাটের কালীমাতা প্রথমে এক চালা ঘরের মধ্যে অধিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বেহালার সাবর্ণ চৌধুরীদের সন্তোষ রায় বর্তমান মন্দির তৈরী করে

দেন। বর্তমান মন্দিরটি ৭৫ ফুট চতুষ্কোণ আয়তন বিশিষ্ট এবং পাদপীঠের ওপর দণ্ডায়মান এবং উচ্চতায় ৯০ ফুট। দক্ষিণ দিকে একটি প্রশস্ত নাটমন্দির আছে ও মন্দিরের মধ্যে আরও অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির আছে, যাদের মধ্যে শ্যামরায়ের মন্দির প্রসিদ্ধ। মোট আয়তন এক বিঘা এগার কাঠা তিন ছটাক।

যেখানে কালী, সেখানেই শিব। সেজন্য প্রতি পীঠস্থানেই শক্তি মন্দিরের কাছে, একটি করে শিব বা ভৈরবের মন্দির থাকে। কালীঘাটের ভৈরব নকুলেশ্বর। নকুলেশ্বরের মন্দির কালীমন্দিরের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। নবনির্মিত বড় রাস্তা এটাকে কালীমন্দির থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। নকুলেশ্বরের বর্তমান মন্দির ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তারাসিং নামে এক পাঞ্জাবী বণিক তৈরী করে দিয়েছিল। শিবরাত্রির ও নীলষষ্ঠীর দিন এখানে পূজা দেবার জন্য বহু নরনারীর সমাগম হয়। আগে মহাসমারোহে এখানে গাজন উৎসব হত। ফ্যানী পার্কস্ বলে গেছেন যে শহরের বারবনিতারাও কেরাঞ্চী গাড়ী করে এই উৎসবে যোগদান করতে যেত।

কালীঘাট ছাড়া কলকাতার আর এক পুরানো কালীমন্দিরের কথা আমরা ইতিহাসে পড়ি। এটা হচ্ছে কলকাতার কালেকটর সাহেবের সহকারী গোবিন্দরাম মিত্র কর্তৃক নির্মিত মন্দির। বৈধ ও অবৈধ উপায়ে গোবিন্দরাম প্রভূত অর্থ উপার্জন করে কলকাতার সমাজে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়েছিলেন। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গঙ্গার ধারে কুমারটুলিতে বসতবাড়ী ও নবচূড়াবিশিষ্ট এক সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির স্থাপন করেছিলেন। উচ্চতায় এই মন্দির (১৬৫ ফুট) পরবর্তীকালীন শহীদ মিনারের (উচ্চতা ১৫২ থেকে ১৫৮ ফুট) চেয়েও বড় ছিল। এই মন্দিরটাই কলকাতার এক দিকচিহ্ন ছিল, এবং জাহাজের নাবিকরা এটাকে 'দি প্যাগোডা' বলে অভিহিত করত। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ঝড়ে, এর শিখরের খানিকটা পড়ে যায়। সেটা মেরামত করে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ঝড়ে মন্দিরটা ধ্বসে পড়ে। তারপর এর আর বিশেষ সংস্কারের চেষ্টা হয় নি। এখানে উল্লেখনীয় যে গোবিন্দরামের মন্দির সম্বন্ধে এক বিতর্ক আছে। অনেকে বলেন যে গোবিন্দরামের মন্দিরটা ছিল শিব মন্দির, আর বনমালী সরকার তৈরী করেছিলেন সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির। কোনটা কি, তা এখন বলা খুবই মুস্কিল। কেননা, আমরা জানি যে কাছাকাছি স্থানে, বাগবাজারে বর্তমান সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের ঠিক বিপরীত দিকে চিৎপুর রোডের ওপর একটা জোড়-বাংলা মন্দির ছিল, যেটাকে লোকে 'ডাকাতে কালী'র মন্দির বলত। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ঝড়ে এই মন্দিরটা ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছিল।

তবে পুরানো কলকাতার অনেক কালীমন্দির এখনও বিদ্যমান আছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নিমতলার আনন্দময়ীর মন্দির, বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী কালীর মন্দির, ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, বৌবাজারের ফিরিঙ্গি কালী প্রভৃতি। যদিও খাস কলকাতার মধ্যে অবস্থিত নয়, তা হলেও চিত্তেশ্বরী কালীর উল্লেখও এখানে প্রয়োজন।

বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী কালী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে। পুরানো মূর্তিটি পাথরের তৈরী ছিল। সেটা এখনও মন্দিরের মধ্যে রক্ষিত। কিন্তু বর্তমান মূর্তি মাটির তৈরী ও উচ্চতায় ৭ ফুট। পুরানো মন্দিরটা নাকি গঙ্গার ধারে ছিল। তার আকার

আমাদের জানা নেই। বর্তমান মন্দিরটি দালান রীতিতে গঠিত ও অনেক পরে নির্মিত হয়েছিল। কালীর দুপাশে দুটি শিবলিঙ্গ আছে।

নিমতলার আনন্দময়ীকে শ্মশান কালী বলা হয়, কেননা এক সময় এটা শ্মশানের মধ্যেই অবস্থিত ছিল। কথিত আছে যে এক মোহন্ত এটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ওই মোহন্তর জগন্নাথ নামে এক শিষ্য ছিল। তার খড়ের ব্যবসা ছিল। মোহন্ত তাঁর মৃত্যুর সময় দেবীকে জগন্নাথের হাতে সমর্পণ করে যান। কিছুদিন পরে অর্থসঙ্কটের সম্মুখীন হলে জগন্নাথ নারায়ণ মিশ্র নামে এক ভক্তকে সংলগ্ন জমিসমেত মূর্তিটি বেচে দেন। নারায়ণ মিশ্রের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে হরদেব মিশ্র মন্দিরের অধিকারী হন। হরদেবের মৃত্যুর পর মন্দিরটি তার ভাগিনেয় ও নিমতলা স্ট্রীটের জমিদার মাধবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের হাতে আসে। মাধবচন্দ্রের মৃত্যুর পর তস্য পুত্র শিবকৃষ্ণ ও তারপর তার পুত্র ননীলাল ও তারপর বন্দোপাধ্যায় পরিবারের অন্যান্যরা মন্দিরের স্বত্বাধিকারী হন। মা আনন্দময়ীর মূর্তি শবের ওপর আরূঢ় ও কালো পাথরের তৈরী। উচ্চতায় দু ফুট। রাস্তা উঁচু হওয়ায় মূর্তিটি এখন অনেক নীচে নেমে গেছে। বহু চেষ্টা করেও মূর্তিটিকে ওপরে তোলা সম্ভবপর হয় নি।

যে শ্মশানের মধ্যে মা আনন্দময়ীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আগে এটা গঙ্গার ধারেই ছিল। তারপর গঙ্গায় চড়া পড়বার পর যখন স্ট্র্যাণ্ড রোড তৈরি হল, তখন এটা শ্মশান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

নিমতলার প্রাচীন শ্মশানটি জলমগ্ন হওয়ায় শহরবাসী হিন্দুদের শবদাহ সম্বন্ধে ক্লেশের পরিসীমা ছিল না। এ সম্বন্ধে ১ জুলাই ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের 'সংবাদচন্দ্রিকা'য় লেখা হয়—'এ শহরে হিন্দু লোক দুই লক্ষ হইতে পারে। প্রতিমাসে আন্দাজ তিন শত লোক মরিয়া থাকে। কাশি মিত্রের ঘাটে গড়ে দশ জনের দাহ হয়। কোন কোন সময়ে প্রতিদিন ২০ কুড়ি ২৫ পঁচিশ জন মরে। আর ওলাউঠা হইলে ইহার দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুর্গুণ মরিয়া থাকে।...যত লোক মরে বা যত শব কলিকাতার ঘাটে জালায় তাদের উপর নিশ্চিত কর স্থাপন করিয়া তদুৎপন্ন অর্থ সংগ্রহ করিয়া গঙ্গাতীরে রাস্তার ধারে জলের ভিতর ভিত্তি উঠাইয়া তিন দিকে দেওয়াল দেওয়াইয়া দুইটি চত্বর নির্মিত করা যায় তাহাতে পশ্চিম দিক খোলা থাকে পোতা মৃত্তিকাতে ভরাট হয় তাহাতে ঐ শবদাহ কার্য হয়।" তারপর ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জানুয়ারী তারিখের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে 'নিমতলা হইতে বাগবাজার পর্যন্ত তিনটা শবদাহের নিমিত্ত স্থান হইবেক ও তাহা সম্পূর্ণার্থে এই শহরের ভাগ্যবান লোকদিগের মধ্যে একটা চাঁদা হইয়াছে।' ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২ মার্চ তারিখের শেষ সংবাদে প্রকাশ—'অবগত হওয়া গেল যে মোং নিমতলার ঘাটে যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্থান নির্মিত হইতেছিল, তাহা এক্ষণে প্রস্তুত হইয়াছে বিশেষতঃ গত সোমবার অবধি ঐ স্থানে শবের সংকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে অনেকের পরিশ্রম দূর হইয়াছে।' এই সংবাদ হতে বুঝতে পারা যায় যে বর্তমান নিমতলা ঘাটে ইংরেজি ১৭ মার্চ ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ বা ৬ চৈত্র ১২৩৪ সন হতে শবদাহ শুরু হয়েছে। পরবর্তীকালে বহু অর্থব্যয়ে পোর্ট কমিশনাররা নিমতলা ঘাটের ইমারত তৈরী করে দেয়। রানী রাসমণির স্বামী রাজচন্দ্র ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এখানে গঙ্গাযাত্রীদের জন্য একটা ঘর তৈরী করে দেন। ১৯৭৭

খ্রীষ্টাব্দের ‘ঐতিহাসিক’ পত্রিকায় (পৃষ্ঠা [illegible]) শ্রীরাধারমণ মিত্র মশায় লিখেছিলেন যে কাশী মিত্রের ঘাটে বিভিন্ন হাসপাতালের কাটাছেঁড়া মড়া পোড়ানো হয়। প্রকৃতপক্ষে এরূপ মড়া পোড়ানো হয় নিমতলা ঘাটে। আমি রাধারমণ বাবুর ঐ ভুল সংশোধন করে দিই। (‘গঙ্গার ঘাট’ পৃষ্ঠা ৬৯ দ্রষ্টব্য)

১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে চিত্তেশ্বরী মন্দির নির্মিত হয় বলে মন্দিরের মাথায় লেখা আছে। মন্দিরটা গান ফাউণ্ডারী রোডে অবস্থিত। পূর্বে ডাকাতরা চিত্তেশ্বরী আরাধনা করে তবে ডাকাতি করতে বেরুত। ডাকাতদেরই এক সরদারের নাম ছিল চিতে। জনশ্রুতি তার নাম থেকেই চিত্তেশ্বরী নামের উদ্ভব। কিন্তু কিংবদন্তী অনুযায়ী মনোহর ঘোষ ওরফে মহাদেব ঘোষ চিত্তেশ্বরী দেবী প্রতিষ্ঠা করেন। মনোহর ঘোষের মৃত্যু হয় ১৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে। এই চিত্তেশ্বরীর নাম থেকেই চিৎপুর নামের উৎপত্তি। কলিকাতা কালেক্টরের ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের এক পাটা অনুযায়ী চিৎপুর ছিল আমিরাবাদ পরগণার অন্তর্ভুক্ত। সম্প্রতি বীরেন রায় মশায় তাঁর ‘ক্যালকাটা’ বইয়ে ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দের চিত্তেশ্বরী মন্দিরের একটা ছবি দিয়েছেন। ১৬১৬-তে ইংরেজরা বাঙলা দেশে আসে নি। সুতরাং ওটা কোন ইংরেজ শিল্পীর আঁকা ছবি নয়। ছবিটা কোন্ দেশীয় শিল্পীর আঁকা এবং তাঁর নাম কি এটা না জানা পর্যন্ত ওই ছবিটার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

ঠনঠনিয়ায় অবস্থিত সিদ্ধেশ্বরী কালী উদয়নারায়ণ নামে এক ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তিনিই দেবীর পুরোহিত ছিলেন। বর্তমান মন্দিরের গায়ে ১১১০ সাল লেখা আছে। ইংরেজি হিসাব অনুযায়ী এ তারিখ দাঁড়ায় ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দ। অনেকে এটাকেই মন্দির নির্মাণের তারিখ ধরে নিয়েছেন। তা যদি হয় তা হলে বলতে হবে যে গোবিন্দরাম মিত্রের কুমারটুলির নয় চূড়া বিশিষ্ট সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের (আগে দেখুন) চেয়েও এটা পুরানো। কিন্তু আমার মনে হয় তারিখটা সন্দেহজনক। বোধ হয় এটা কোন রকমে গুলিয়ে গেছে, শঙ্কর ঘোষ যখন বর্তমান মন্দির তৈরী করে দেন তার সঙ্গে। কেননা, বাংলা সন ১২১০ সালে ঠনঠনিয়ার শঙ্করচন্দ্র ঘোষ (যার নাম থেকে শঙ্কর ঘোষ লেনের নাম হয়েছে) দেবীর বর্তমান মন্দির তৈরী করে দিয়েছিলেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দ-মুসলমান দাঙ্গার সময় মন্দিরটাকে সুরক্ষিত করা হয়েছে। ঠনঠনিয়ার দেবীমূর্তি মাটির তৈরী। এর গায়েই এক শিব মন্দির আছে।

২৪৪ নং বৌবাজার ষ্ট্রীটে (এখন বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট) ‘ফিরিঙ্গি কালীর মন্দির অবস্থিত। এখানেও কালী মন্দিরের গায়ে একটা শিবমন্দির আছে। এই কালীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নানারূপ জনশ্রুতি আছে। এক জনশ্রুতি অনুযায়ী শ্রীমন্ত নামে এক ডোম এই কালী প্রতিষ্ঠা করে, এবং নিজেই এর পূজারী ছিল। এই ডোম বসন্তের চিকিৎসা করত, এবং সেজন্য মন্দিরের মধ্যে একটি শীতলা মূর্তিও প্রতিষ্ঠা করেছিল। বসন্ত রোগাক্রান্ত স্থানীয় ফিরিঙ্গি বাসিন্দারা শ্রীমন্তের শরণাপন্ন হত, এবং নিরাময় হলে দেবীর পূজা দিত। সেজন্যই এর নাম ফিরিঙ্গি কালী। অপর জনশ্রুতি অনুযায়ী কবিয়াল অ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গি এই কালী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং সেজন্যই এর নাম ফিরিঙ্গি কালী। বর্তমান সেবাইতরা ব্রাহ্মণ।

উত্তর কলকাতায় আরও অনেক কালীমন্দির আছে। যথা,

১। বরানগরে জয় মিত্রের কালীমন্দির,

২। বাগবাজারে চিৎপুর খালের পুলের নিকট ব্যোমকালী মন্দির,

৩। বাগবাজার ষ্ট্রীটের শেষে বাগবাজারের কালী,

৪। শ্যামবাজার বাজারের গায়ে জয়কালীর মন্দির,

৫। শ্যামপুকুর থানার পশ্চিমে কম্বুলিয়াটোলার কালী,

৬। চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যু ও রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটের সংযোগস্থলে লাল মন্দিরের কালী ইত্যাদি।

উপকণ্ঠে অবস্থিত দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী কালী ইদানীংকালে এত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে যে, ওর সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার । ১২৬২ বঙ্গাব্দের ১২ জ্যৈষ্ঠ স্নানযাত্রার দিন এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন জানবাজারের রাজচন্দ্র মাড়ের বিধবা রানী রাসমণি। এর প্রতিষ্ঠার ইতিহাসটা খুব চমকপ্রদ। রানী যাচ্ছেন কাশী, দর্শন করতে অন্নপূর্ণাকে ও মহাভিক্ষুক বিশ্বনাথকে। যাচ্ছেন রাজরানীর মত। সঙ্গে একশখানা নৌকা, নানা সামগ্রীতে ভরা। রানী দুহাতে সে সব বিলোবেন। সঙ্গে আরও যাচ্ছে শত শত দাসদাসী ও আত্মীয় পরিজন। উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম পর্যন্ত এসেছেন,—স্বপ্ন দেখলেন রানী রাসমণি। দেখলেন দেবী ভবতারিণী নিজে এসে দাঁড়িয়েছেন। বলছেন, 'কাশী যাবার দরকার নেই। এই ভাগীরথীর পারেই আমাকে প্রতিষ্ঠা কর। আমাকে অন্নভোগ দে।' রানীর আর কাশী যাওয়া হল না। এক লপ্তে কিনলেন ষাট বিঘে জমি। জমিটা ছিল হেষ্টি নামে এক সাহেবের, আর বাকীটায় ছিল মুসলমানদের এক কবরখানা ও গাজী পীরের থান। জমির গড়নটা ছিল কচ্ছপের পিঠের মত। তন্ত্র মতে নাকি ওরকম জমিই শক্তি সাধনার অনুকূল। এরকম জমি পাওয়াতে, রানী নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করলেন। মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন বটে, কিন্তু এক সঙ্কট দেখা দিল। কলকাতার পণ্ডিতসমাজ পাতি দিল শূদ্রাণীর অধিকার নেই দেবতাকে ভোগ দেবার। সে সঙ্কট থেকে, রানীকে বাঁচান ঝামাপুকুর চতুষ্পাঠীর রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি বিধান দিলেন প্রতিষ্ঠার আগে রানী যদি দক্ষিণেশ্বরের যাবতীয় সম্পত্তি কোন ব্রাহ্মণকে দান করেন, তবে অন্নভোগ চলতে পারে। এই পাতি পাবার পর রানী ঠিক করলেন তাঁর গুরুর নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু পূজক হবে কে? তাঁর গুরু বংশের কেউ পূজা অর্চনা করে, এটা রানীর অভিপ্রায় ছিল না। কেননা, তাঁরা সবাই অশাস্ত্রজ্ঞ, আচার সর্বস্ব। কিন্তু কোন ব্রাহ্মণই পূজা করতে রাজী হল না। সে বিপদেও উদ্ধার করলেন রামকুমার। তিনি বললেন, পূজকের অভাবে মন্দির যখন প্রতিষ্ঠা হয় না, তখন বেশ আমিই পূজক হব। রামকুমারই পূজক হলেন ও তারপর তাঁর ভাই গদাধর—রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। এখানে বলা দরকার যে দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণী পাষাণময়ী।

## ৩৩। কলকাতার শিবমন্দির

কালীমন্দিরের মত কলকাতায় শিবমন্দিরেরও ছড়াছড়ি। মনে হয়, কলকাতার সবচেয়ে প্রাচীন শিবমন্দির হচ্ছে, হয় নন্দরাম সেনের আর তা নয় তো বনমালী সরকারের। বনমালী সরকারের শিব মন্দিরের হদিশ পাওয়া এখন কঠিন। একটি জীর্ণ ভাঙা মন্দিরকে বনমালী সরকারের মন্দির বলে অভিহিত করা হয়, কিন্তু সে অভীধা সন্দেহজনক। বনমালী সরকার ছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডেপুটি ট্রেডার। আর নন্দরাম সেন ছিলেন কলকাতার প্রথম কালেকটর র‍্যালফ শেলডনের সহকারী। নন্দরাম সেন প্রতিষ্ঠিত রামেশ্বর শিবের মন্দির নন্দরাম সেন স্ট্রীটে অবস্থিত। মন্দিরটার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা তারিখ একটা বিতর্কিত ব্যাপার। মন্দিরের মাথায় লেখা আছে ১০৬১ বঙ্গাব্দের ৩১ চৈত্র নন্দরাম সেন কর্তৃক মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ইংরেজি হিসাবে এই তারিখ দাঁড়ায় ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস। কিন্তু এই তারিখটাকে কেউ কেউ চ্যালেঞ্জ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে নন্দরাম সেন র‍্যালফ্ শেলডন সাহেবের সহকারী হবার পরেই তিনি মন্দিরটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

কলকাতার শিব মন্দিরগুলির মধ্যে বৌবাজারে কেণ্ডারডাইন লেনে অবস্থিত কলকাতা দুর্গের দেওয়ান ত্রিলোকরাম পাকরাশী স্থাপিত মন্দিরগুলিও খুব প্রাচীন। এদের মধ্যে একটি হচ্ছে নবরত্ন ও আর দুটি পঞ্চরত্ন মন্দির। কলকাতার নূতন দুর্গনির্মাণের সময় যে সকল মাল মশলা ব্যবহৃত হয়েছিল, এই মন্দিরগুলি সেই সেই মালমশলায় নির্মিত। সেজন্য মনে হয় এগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর ষাটের দশকে তৈরী হয়েছিল।

তবে কলকাতায় অন্যান্য যে সব শিব মন্দির দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলি বাঙলার চিরাচরিত আটচালা রীতিতে গঠিত মন্দির। এ সব মন্দিরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১২৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার জমিদার জয় মিত্র মশায় গঙ্গার ধারে বরানগরে যে কালী মন্দির তৈরী করেছিলেন তার সংলগ্ন ১২টি শিব মন্দির। আরও উল্লেখযোগ্য হচ্ছে হাটখোলার বণিক মদন দত্তের দুইপুত্র প্রতিষ্ঠিত দুর্গেশ্বর শিবমন্দির, দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী মন্দিরের প্রাঙ্গণে অবস্থিত ১২টি শিবমন্দির, নন্দরাম সেন স্ট্রীটের রামেশ্বর শিবমন্দির (আগে দেখুন), ঠনঠনিয়ার শিবমন্দির, বাগমারীর শিবমন্দির, শ্যামবাজারে কৃষ্ণরাম বোস স্ট্রীটের শিবমন্দির, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট ও আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ের শিবমন্দির, বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট ও চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যুর মোড়ের শিবমন্দির, দক্ষিণ কলকাতায় বাওয়ালীর মণ্ডলদের নির্মিত শিবমন্দিরসমূহ, টালিগঞ্জ স্টুডিওর কাছে সীতারাম ঘোষ ও বাবুরাম ঘোষ নির্মিত এগারটি শিবমন্দির, আদিগঙ্গার পশ্চিমে অবস্থিত সাবর্ণ চৌধুরীদের প্রতিষ্ঠিত মা করুণাময়ী কালীমন্দিরের সংলগ্ন ১২টি শিবমন্দির। এ ছাড়া বড়িশাতে সাবর্ণ চৌধুরীদের বসত বাড়ীর চৌহদ্দীর মধ্যে অনেক আটচালা শিবমন্দির ও পঞ্চরত্ন মন্দির আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে আটচালা মন্দির যে মাত্র শিবমন্দিরই হয় তা নয়। আদিগঙ্গার পূর্ব পারে টালিগঞ্জ রোডে একটা বড় আটচালা রাধামোহনের মন্দির আছে। এটা ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে বাওয়ালীর উদয়নারায়ণ মণ্ডল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে আরও

বারোটা আটচালা শিবমন্দির আছে। এরই কিছু উত্তরে আরও কয়েকটি মন্দির আছে। এর মধ্যে দশটা আটচালা মন্দির, একটা নবরত্ন মন্দির ও দুটি পঞ্চরত্ন মন্দির। এগুলি ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বাওয়ালীর উদয়নারায়ণ মণ্ডল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এরই কাছাকাছি সাম্প্রতিককালে তৈরী একটা বড় আটচালা ল ীনারায়ণের মন্দির আছে। পুরানো আটচালা মন্দিরের মধ্যে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত ভূকৈলাস রাজবাড়ীর শিবগঙ্গা জলাধারের উত্তর দিকের ঘাটের দুই পাশে দুটা বড় শিবমন্দির আছে। সমসাময়িক কালের কতকগুলি আটচালা শিবমন্দির বাগবাজারেও ছিল। এগুলি দুর্গাচরণ মুখুজ্জে মশায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এগুলো সবই গিরিশ অ্যাভেন্যুর গর্ভে গিয়েছে। মাত্র একটা পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। কলকাতায় ভাল বৈষ্ণব মন্দিরও আছে। তার মধ্যে পড়ে বাগবাজারের গৌড়ীয় মঠ ও রামকান্ত বোস স্ট্রীটের নববৃন্দাবন মন্দির ও কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীটের গোবিন্দজীর মন্দির। সম্প্রতি গড়িয়াহাটায় এক জোড়া সুন্দর রাধাকৃষ্ণের মন্দির তৈরী হয়েছে। (লেখকের 'কলকাতার চালচিত্র' হতে গৃহীত।)

## সে আর এক কলকাতা

'সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।' এ বচনটা আজকের কলকাতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে খাটে। আজকের কলকাতা দেখে কেউই অনুমান করতে পারবে না, আমার ছেলেবেলার কলকাতার চেহারা কি রকম ছিল। আমার ছেলেবেলার কথা বলতে আমি ৮০/৮৫ বছর আগেকার কথা বলছি।

আমার ছেলেবেলায় ছেলেরা পড়াশুনায় আজকালকার ছেলেদের চেয়ে বেশী মনোযোগী ছিল। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে তারা পড়াশুনায় মন দিত। সকালে ঘুম থেকে উঠবার জন্য তাদের এলারম ঘড়ির দরকার হত না। ভোরবেলা পথে লোকজন বেরুবার আগেই করপোরেশনের ঝাড়ুদাররা রাস্তা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে দিত। এই ঝাড়ুদারদের ঝাঁট দেবার শব্দটাই আমাদের কাছে এলারম্ ঘড়ির কাজ করত। রাস্তা দিনে দু'বার ঝাঁট দেওয়া হত। একবার ভোরবেলা, আর একবার দুটো/তিনটার সময়। ঝাঁট দিয়ে আবর্জনাগুলো এক নির্দিষ্ট স্থানে জড় করে রাখত।

ঝাড়ুদারদের কাজ শেষ হবার আগেই শব্দ হত আবর্জনা নিয়ে যাবার গাড়ির। এগুলি ছিল ঘোড়ায় টানা লোহার গাড়ি। তবে গলিঘুঁজির ভিতর গাড়িগুলি যেত না। গলিঘুঁজির ভিতর থেকে ঝাড়ুদাররা তিন চাকার ঠেলাগাড়ি করে আবর্জনা বড় রাস্তার নির্দিষ্ট স্থানে এনে রাখত। সেখান থেকে ঘোড়ায় টানা আবর্জনা-বাহী গাড়িগুলি সেগুলিকে উঠিয়ে নিয়ে যেত। আমাদের শ্যামবাজার-বাগবাজার অঞ্চলে আবর্জনা-বাহী ঘোড়ার গাড়িগুলি আবর্জনা দু'জায়গায় নিয়ে গিয়ে জড়ো করত। একটা জায়গা ছিল বাগবাজারে অন্নপূর্ণা ঘাটের সামনে একটা সরু গলির ভিতর। আর একটা ছিল সারকুলার রোড ও উল্টাডাঙ্গ রোডের মোড়ের সামান্য দক্ষিণে। ওখানে একটা উঁচু পাকা প্লাটফরম ছিল, তার দু'দিক ছিল ঢালু, যাতে গাড়ি প্লাটফরমের ওপর উঠে আবার বিপরীত দিক দিয়ে নেমে আসতে পারে। ওই প্লাটফরমের ওপর শহরের যত আবর্জনা জড় করা হত।

শহরের ভিতর দিয়ে করপোরেশনের একটা রেলপথ ছিল। এই রেলপথটা তৈরী করা হয়েছিল ১৮৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। তার মানে করপোরেশন গঠিত হবার পাঁচ বছর পরে। এটা বাগবাজারের অন্নপূর্ণা ঘাটের সামনে থেকে শুরু করে সমস্ত বাগবাজার স্ট্রীটের উত্তরাংশ দিয়ে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে এসে সারকুলার রোড ধরে ধাপা পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। আগে সারকুলার রোড ও উল্টাডাঙ্গার মোড়ের কাছে যে প্লাটফরমের কথা বলেছি রেলগাড়িটা ওই প্লাটফরমের গা ঘেঁষে যেত। প্লাটফরমের ওপর থেকে সমস্ত আবর্জনা রেলগাড়িতে ভরতি করে দেওয়া হত। অনুরূপ প্লাটফরম ছিল, রাজাবাজারের কাছে; সেখানেও আবর্জনা ওই রেলের মালগাড়িতে ভরতি করা হত। এ রকম ভাবে আবর্জনা নিতে নিতে রেলগাড়িটা ধাপা পর্যন্ত যেত। সেখানে গাড়িগুলি খালাস করা হত।

রেলগাড়িটা করপোরেশনের আর এক রকম কাজেও লাগত। রেলপথটার সংযোগ ছিল ইষ্টার্ন রেলের (তখন নাম ছিল ইষ্টার্ন বেঙ্গল ষ্ট্রেট রেলওয়ে।)চিৎপুর রেল ইয়ার্ডের সঙ্গে। কলকাতার রাস্তাঘাট মেরামতের জন্য ফুটপাতের ধারে ও নর্দমায় বসাবার জন্য করপোরেশনের দরকার হত অনেক পাথরকুচি ও পাথরের থান বা স্ল্যাব (slab) । এগুলি রেলপথে বাইরে থেকে আসত, এবং মালগাড়িগুলি চিৎপুর রেল ইয়ার্ডে এসে পৌছলে, এগুলোকে টেনে আনা হত পোর্ট ট্রাস্টের রেলপথ দিয়ে অন্নপূর্ণা ঘাটের সামনে। তারপর করপোরেশনের রেল ওগুলিকে টেনে এনে খালাস করত করপোরেশনের মেটাল ইয়ার্ডে। মেটাল ইয়ার্ড ছিল আজ যেখানে বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব হয় সেখানে। প্রথম যখন পুজা হয়, জায়গাটা তখন আরও বিস্তীর্ণ ছিল। এখন এটাকে সঙ্কুচিত করে আনা হয়েছে। এ জায়গাটার একটা ঐতিহাসিক পটভূমিকা আছে। ইংরেজরা যখন প্রথম কলকাতায় আসে, তখন খালধার পর্যন্ত উত্তর পার্শ্বস্থ জমি সমেত ওখানে ছিল পেরিন সাহেবের বাগানবাড়ী ও জাহাজ ঘাটা। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজদ্দৌলা যখন কলকাতা আক্রমণ করে, তখন ইংরেজরা এখানেই স্থাপন করেছিল একটা তোপমঞ্চ (battery), এবং এখানেই হয়েছিল দুই পক্ষের প্রথম সংঘর্ষ। পরে এটা ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর শ্বশুর মহাশয় কিনে নিয়েছিলেন, এবং সেই উপলক্ষ্যে ওয়ারেন হেষ্টিংস মাঝে মাঝে বাগবাজারের ওই বাগানবাড়ীতে এসে বাস করতেন।

আমার ছেলেবেলার রাস্তাঘাট ঠিক এখনকার মত ছিল না। তবে সে যুগের মান অনুযায়ী রাস্তাঘাট ভালই ছিল। প্রতি বৎসর নিয়মিত সময়ে রাস্তাঘাট মেরামত করা হত। প্রথমে রাস্তার তলায় ঝামা দেওয়া হত, তার ওপর দেওয়া হত পাথরের খোয়া ও তার ওপর ছোট পাথর কুচি। ঝামাই বলুন, আর ছোট বড় পাথর কুচিই বলুন, প্রত্যেক মালটাই ষ্টীম রোলার দিয়ে ভাল করে পেষণ করা হত। করপোরেশনের অনেকগুলি পেষণকারী ষ্টীম রোলার ছিল। এগুলির চালক বা ড্রাইভাররা ছিল সব ফিরিঙ্গি সাহেব। রাস্তা ঠিক ভাবে পেষণ করা হচ্ছে কিনা, তা দেখবার জন্য করপোরেশনে নিযুক্ত ইওরোপীয়ান সাহেব পরিদর্শনকারীরা আসতেন। তাদের মধ্যে ইংরেজিতে কথাবার্তা বলা আমরা ছেলেবেলায় অবাক হয়ে শুনতাম। পাথর কুচি পেষণ করে যখন রাস্তা একেবারে সমতল ও মসৃণ করা হত, তারপর তাকে আরও মসৃণতর করা হত তার ওপর সুরকি

বা রাবিশচূর্ণ দিয়ে। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কাজটাই ষ্টীম রোলার দিয়ে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে করা হত।

রাস্তার একেবারে ওপরটা রাবিশচূর্ণ দিয়ে মসৃণ করা হত বলে, সেগুলো শুকিয়ে গেলে ধুলো হত। যাতে ধুলো না ওড়ে, সেজন্য দিনে দু'তিনবার জল দেওয়া হত। রাস্তায় জল দেবার জন্যে ফুটপাতের ধারে গঙ্গাজলের চাপা কল বসান থাকতো। দু'জন লোক রাস্তায় জল দেবার জন্য তাদের সরঞ্জাম নিয়ে একটা চাপা কল থেকে আর একটা চাপা কলে ছুটে যেত। সরঞ্জামের মধ্যে ছিল একটা ক্যানভাসের চার-ইঞ্চি ব্যাস পরিমিত মোটা (hose) পাইপ। তার এক দিকে লাগানো থাকত একটা তামার তৈরী সরু লম্বা-নল, আর অপর দিকে থাকতো প্যাঁচ দিয়ে রাস্তার চাপা কলের সঙ্গে সংযুক্ত করবার জন্য একটা পিতলের প্যাঁচকল। ওই অংশটায় লাগিয়ে দিয়ে, একটা ইংরেজি "T" আকারের রেঞ্চ দিয়ে কলটার চাবি খোলা হত, যাতে কল থেকে খুব তোড়ে জল বেরোয়। তারপর অপর ব্যক্তি লম্বা নলবিশিষ্ট অংশটি ধরে রাস্তাটাকে বেশ করে ভিজিয়ে দিত। কোথাও আগুন লাগলে জলের জন্য দমকল-বাহিনী রাস্তার এই কলের জলই ব্যবহার করত। তবে প্রসঙ্গত পাঠকদের জানিয়ে রাখি, তখনকার দিনে দমকলের গাড়ী ঘোড়ায় টানতো। কিন্তু তারা খুব তৎপরতার সঙ্গে অকুস্থলে এসে উপস্থিত হত।

তবে চৌরঙ্গী অঞ্চলে রাস্তায় জল দেওয়া হত না। সেখানে রাস্তা কেরোসিন তেল দিয়ে পালিশ করা হত। (তখনকার দিনে প্রত্যেক সওদাগরী অফিসের সব ঘরও কেরোসিন তেল দিয়ে পালিশ করা হত)। সাহেব পাড়া আর দেশী পাড়ার মধ্যে এই বিষয়েই যে তফাৎ ছিল তা নয়; আর একটা বিষয়েও তফাৎ ছিল। সেটা হচ্ছে ফুটপাতের! কলকাতায় প্রথম ফুটপাত তৈরী হয় ওলড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটে ১৮৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দে। সাহেব পাড়ার ফুটপাতগুলো ঢাকা ছিল বড় বড় চৌকো পাথরের থান* দিয়ে। (যে সময়ের কথা বলছি সেটা আমার ছেলেবেলার, তখনও সিমেণ্টের প্রচলন হয় নি)। আর দেশী পাড়ার ফুটপাতগুলি ছিল একেবারে কাঁচা মাটির। তার ফলে বর্ষাকালে ফুটপাত দিয়ে হাঁটলে (না হাঁটলে আদালতে শাস্তি পেতে হত, পরে দেখুন) পায়ে এক গোছ কাদায় ভরে যেত। তখনকার দিনের দেশীপাড়া বলতে বৌবাজার ষ্ট্রীটের উত্তরাংশ বুঝাতো। দেশী-পাড়ার একমাত্র জায়গা যেখানে ফুটপাত পাথরের থান দিয়ে বাঁধানো ছিল, সেটা হচ্ছে হেদুয়ার ধারে বেথুন কলেজের সামনে ও তার অপর দিকের ফুটপাতে। এটা আমার মনে হয় জেনারেল এমব্রিজ ইনষ্টিটিউশন-(পরে স্কটিশ চার্চেস কলেজ)-এর সাহেব মেমেদের ও বেথুন কলেজের মেয়েদের সুবিধার জন্যে। দেশীপাড়ার ফুটপাতগুলি প্রথম সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো হয় প্রথম মহাযুদ্ধের সময়।

ফুটপাত সম্বন্ধে প্রসঙ্গত আর একটা কথা এখানে বলা দরকার। প্রতি রাস্তার মোড়ে চার ভাষায় লিখিত কমিশনার অফ পুলিশের বিজ্ঞপ্তি ছিল—"যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যতীত ফুটপাত ব্যতীত রাস্তা দিয়া চলিলে, অপরাধী অভিযুক্ত হইবে ও শাস্তি পাইবে।" রাস্তা দিয়ে যারা হাঁটতো, পুলিশ তাদের ধরে নিয়ে যেত। সেজন্য সকলকেই ফুটপাত দিয়ে হাঁটতে হত। তখনকার দিনে ফুটপাত ভাড়া দেওয়া করপোরেশন অত্যন্ত গর্হিত ও জঘন্য কাজ বলে মনে করত।

তবে কলকাতায় তখন এত রাস্তাঘাট ছিল না। গলিঘুঁজি অবশ্য অনেক ছিল। দক্ষিণ থেকে উত্তরে আসতে হলে কলকাতার মাত্র একটা রাস্তাই ব্যবহৃত হত। সেটা হচ্ছে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট (বর্তমান বিধান সরণী) ও তার দক্ষিণে কলেজ স্ট্রীট ও ওয়েলিংটন স্ট্রীট। অবশ্য কলকাতায় আরও দুটি রাস্তা ছিল—সারকুলার রোড যার আধখানা দখল করে রেখেছিল ময়লা ফেলা রেলগাড়ি, আর চিৎপুর রোড যেটা কলকাতার সবচেয়ে পুরানো রাস্তা ও অতি সঙ্কীর্ণ। এর কোনওটাই কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের মত প্রশস্ত ও সুন্দর রাস্তা ছিল না। বস্তুতঃ এ রাস্তটার সৌন্দর্য ছিল অপূর্ব। রাস্তার দুধারে ছিল দশ বিশ হাত অন্তর কৃষ্ণচূড়ার গাছ। গাছগুলিতে যখন ফুল ফুটতো, তখন মনে হত রাস্তার দুধারের মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে লাল ফুলের ঢেউ।

সেজন্য যখনই ছোটলাট (গভর্ণর) বা বড়লাট। (ভাইসরয় ও গভর্ণর-জেনারেল) কলকাতা (তখন দুজনেই কলকাতায় থাকতেন) থেকে ব্যারাকপুরের লাটবাড়ীতে যেতেন, তখন এই রাস্তা দিয়েই যেতেন। তাছাড়া, এই রাস্তা প্রতি রবিবার কেল্লার (ফোর্ট উইলিয়ামের) গোরা সৈন্যরা দলবদ্ধ হয়ে মার্চ করতে করতে দমদম ও ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেণ্টে যেত।

আর পূব থেকে পশ্চিমে যাবার বড় রাস্তাগুলি ছিল যথাক্রমে ধর্মতলা স্ট্রীট, বৌবাজার স্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, (এটা আমি জন্মাবার কয়েক বছর আগে ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে তৈরী হয়েছিল) বিডন স্ট্রীট, গ্রে স্ট্রীট, বাগবাজার স্ট্রীট ও শ্যামবাজার স্ট্রীট। বিডন স্ট্রীট তৈরী হয় ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ও গ্রে স্ট্রীট ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। এদের মধ্যে বিডন স্ট্রীট ও শ্যামবাজার স্ট্রীটের একটা ঐতিহ্য ছিল, কেননা এই দুটি রাস্তা দিয়েই রাসপূর্ণিমার দিনে পরেশনাথের মিছিল যেত। (এখন সে মিছিলের আর প্রাচীন সমারোহ নেই)। একবার মিছিলের সময় শ্যামবাজার স্ট্রীট মেরামত হচ্ছিল। সেজন্য পরেশনাথের মিছিল গ্রে স্ট্রীট দিয়ে ঘুরে যায়। তারপর থেকে মিছিলটা ওই রাস্তা দিয়েই যেতে থাকে।

সাহেব পাড়ার সঙ্গে দেশী পাড়ার রাস্তাঘাটের তফাৎ থাকলেও একথা স্বীকার করতে হবে যে ইংরেজ আমলে, করপোরেশন কলকাতার রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবার জন্য যতটা সচেষ্ট ছিল, পরবর্তী যুগে আর সেটা লক্ষ্য করি নি। আমার ছেলেবেলার যুগে যদি পণ্ডিত নেহেরু কলকাতায় এসে এটাকে "নোংরা শহর" বলতেন, তা হলে বলতে বাধ্য হতাম যে তিনি সত্যের অপলাপ করছেন।

পাছে লোকে রাস্তার যেখানে সেখানে প্রস্রাব করে, তা নিরোধের জন্য প্রতি ২৫০ গজ অন্তর একটা করে সাধারণের প্রস্রাবাগার ছিল। এ ছাড়া, প্রতি গলির মুখে দুভাষায় লেখা থাকত "Commit No Nuisance, এখানে প্রস্রাব করিও না।" পুলিশও ওঁত পেতে থাকতো; প্রস্রাব করলেই ধরে নিয়ে যেত। সাজা একরাত্রি হাজত বাস ও পরদিন আদালতে তিন টাকা থেকে পাঁচ টাকা জরিমানা। এখন সাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রস্রাবাগারগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে পথচারী, ফেরিওয়ালা, দোকানদার প্রভৃতি রাস্তাতেই প্রস্রাব করে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। আজ শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে যেখানে নেতাজীর অশ্বারোহী মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে, ওখানে আগে ছিল সাধারণের ব্যবহারের জন্য একটা প্রস্রাবাগার।

এছাড়া শহরের বহু জায়গায় ছিল বড় বড় হামাম। এগুলিকে আমার ছেলেবেলায় 'হৌস' বলা হত। এগুলো ছিল সাধারণের স্নান করবার ও কাপড় কাচবার জায়গা। মেয়ে ও পুরুষদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা ছিল। আমাদের শ্যামবাজারে একটা হৌস ছিল শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর পাশে। ওখানে ছিল একটা বিরাট বস্তি। ওই বস্তিটাকেই উচ্ছেদ করে মল্লিকরা তাদের বিশাল বাড়ী তৈরী করে।

ওই সময়েই ওই 'হৌস'টাকে বিলুপ্ত করা হয়। এ রকম 'হৌস' কলকাতা শহরে কয়েক শত ছিল। সেগুলি আর নেই। তবে এখনও নজরে পড়ে দু-তিনটা হৌস। একটা শ্যামবাজারের পোস্ট অফিসের সামনে মোহনবাগান লেনে ঢুকতে বাম দিকে, একটা রাজাবাজারের সামনে আর একটা প্রিনসেপ ষ্ট্রীটে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকে শহরে প্রথম মাটির তলায় জলনিকাশের জন্য ড্রেন পাইপ বসানো হয়। আমি জন্মাবার কয়েক বছর আগে এক ভীষণ ভূমিকম্প হয়েছিল। আমি ছেলেবেলায় শুনেছিলাম যে পানীয় জলের পাইপ ও ড্রেন পাইপ —এদুটো পাশাপাশি থাকার দরুন এই ভূমিকম্পে মাটির তলার দুটি পাইপই চিড় খেয়ে যায়। তার ফলে সেই সময় থেকে একটার জল আর একটাতে অনবরত আনাগোনা করছে। সেটাই নাকি এই শহরে সংক্রামক ব্যাধির কারণ।

মাটির তলায় জলনিকাশের ব্যবস্থা হবার পর করপোরেশন শহরবাসীদের পাকা পায়খানা নির্মাণ করতে পরামর্শ দেন। তবে আমার ছেলেবেলায় পায়খানার সিস্টার্নের জন্য ব্যবহার করা হত গঙ্গোদক। আর অন্যান্য কাজের জন্য ব্যবহৃত হত পরিশোধিত পানীয় জল। তবে পাকা পায়খানা হওয়া সত্ত্বেও, আমি আমার ছেলেবেলায় বহু বাড়ীতে খাটা পায়খান থাকতে দেখেছি। বিশেষ করে বস্তির বাড়ীগুলোতে তো ছিলই। এ সকল খাটা পায়খানার মল পরিষ্কার করবার জন্য করপোরেশনের বহু মেথর ও মেথরাণী ছিল। তাদের বসবার জন্য করপোরেশন বহু ঘরবাড়ীও তৈরী করে দিয়েছিল।

শহরে পানীয় জল সরবরাহের জন্য প্রথম কতকগুলি পুষ্করিণী ছিল, যেমন—লালদীঘি, গোলদীঘি, হেদুয়া প্রভৃতি। তবে সে সব একশো বছর আগেকার কথা। তারপর যখন নলের সাহায্যে জল সরবরাহ শুরু হল, তখন করপোরেশন কতকগুলি জলাধার সৃষ্টি করল। শহরের ভিতর এ রকম জলাধার ছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ার ও বিডন স্কোয়ারে। এ দুটি পার্কের মধ্যে এখন যেখানে উঁচু জায়গা দেখতে পাওয়া যায়, জলাধারগুলি সেখানেই ছিল। তারপর ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে টালার ওপর-তলার জলাধার নির্মিত হবার পর, করপোরেশন খুব বৃহদাকার (আট ফুট ব্যাস) নল শহরের রাস্তায় বসালেন। এই বৃহদাকার নল বসান আছে সারকুলার রোডের নীচে। এই বৃহদাকার নল থেকেই অন্য রাস্তার নল শাখা-প্রশাখা হিসাবে বেরিয়ে গেছে। এ সব আমার চোখে দেখা জিনিস। কেননা তখন আমি সারকুলার রোডের ওপর অবস্থিত এক স্কুলে পড়তাম, এবং স্কুলে বসেই এই বৃহদাকার নল বসানো দেখতাম। তারপর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ পলতার জলাধার ও পাম্পিং ষ্টেশন প্রসারিত করা হল। এই জমিটার ওপরই আমার শ্বশুরদের ১০৮-কামরা বিশিষ্ট বসতবাড়ী ও তৎসংলগ্ন বাগান ছিল। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান একেবারেই প্রত্যক্ষ। এ ছাড়া শহরের নানা স্থানে ছক্কর গাড়ীর ঘোড়াদের খাবার জন্য ফুটপাতের ধারে অবস্থিত ছিল লোহার তৈরী জলাধার।

শহরের লোকের আর একটা ভুল ধারণা আমি এখানে দূর করতে চাই। সকলেরই ধারণা যে শহরের জল আসছে টালার ওপরতলার জলাধার থেকে। তা নয়। টালার পাম্পিং ষ্টেশনের উত্তরে মাটির তলায় আছে বহু জলাধার। এগুলি আনুমানিক ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তৈরী করা হয়েছিল। এগুলির ওপরই টালার পাম্পিং ষ্টেশনের উত্তরে মনীন্দ্র রোড পর্যন্ত বিস্তৃত পার্কটা অবস্থিত। সাম্প্রতিককালে দক্ষিণদিকেও মাটির তলায় কয়েকটি জলাধার তৈরী করা হয়েছে।

সে যুগে শহরবাসীদের স্বাস্থ্যটার প্রতি করপোরেশন বিশেযভাবে অবহিত ছিল। যাতে শহরে ভেজাল দ্রব্য বা পচা মাছ বা জলমেশানো দুধ না বিক্রয় হয়, তার জন্য ছিল করপোরেশনের ডাক্তার। তারা রাস্তায় রাস্তায় ও বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়াত। রাস্তায় গোয়ালাদের ধরে ল্যাকটোমিটার যন্ত্র দুধের মধ্যে ফেলে দিত। তারপর যদি দুধে জল আছে দেখা যেত, তা হলে সে দুধ ফুটপাতের ধারে ফেলে দিত। (আমার ছেলেবেলায় কলকাতায় টাকায় আট-দশ সের দুধ পাওয়া যেত)। এ রকম বাজারসমূহের বাহিরের নর্দমার ধারে গাদা গাদা পচা মাছ হামেশা দেখতে পাওয়া যেত। সবই করপোরেশনের ডাক্তার কর্তৃক বাতিল করা মাছ। এ সব কাজে করপোরেশনের ডাক্তারদের সাহায্য করত করপোরেশনের পুলিশ। হ্যাঁ, করপোরেশনের নিজস্ব পুলিশ ফোর্স ছিল। এদের পোযাক ছিল খাঁকি রঙের ইউনিফরম ও নীল রঙের পাগড়ি। আর সাধারণ পুলিশের পোশাক ছিল সাদা রঙের ইউনিফর্ম ও লাল রঙের পাগড়ি। সকলেরই হাতে থাকত লম্বা লাঠি। করপোরেশনের পুলিশের মুখ্য কাজ ছিল শহরের যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা। তারা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখত যানবাহনটানা গরু ঘোড়াকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে কিনা। তখন কলকাতা পুলিশের কোন ট্রাফিক পুলিশ ছিল না। পরে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের পর করপোরেশনের পুলিশ ফোর্স তুলে দেওয়া হয়। করপোরেশনের এই বিভাগের কাজ গ্রহণ করে কলকাতা পুলিশের ভেহিকলস ডিপার্টমেণ্ট ও সোসাইটি ফর দি প্রিভেনশন অভ্ ক্রুয়েলটি টু অ্যানিমেলস্।

তখন শহরের যানবাহন বলতে ছিল ঘোড়ার গাড়ি ও পালকি, আর মালবহন করবার জন্য ছিল গরু ও মহিষের গাড়ি। খুব বড়লোকদের দু-চার খানা মোটরগাড়ি ছিল। এই সকল গাড়ি-ঘোড়া ইত্যাদির লাইসেন্স করপোরেশন প্রদান করত। এখনকার মত পুলিশ নয়। সাহেবসুবো ইওরোপীয়নরা ঘোড়ার গাড়িই ব্যবহার করত।

শহরে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে মাত্র করপোরেশনের নিযুক্ত ডাক্তার ছিল, তা নয়। তখন কলকাতা শহরের বহু জায়গায় ছিল গোয়ালাদের খাটাল। বাগবাজারের রাজবল্লভপাড়ায় ও গোয়াবাগানে এ রকম বহু খাটাল ছিল। খাটালসমূহে গরুগুলিকে যাতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে রাখা হয়, তা প্রদর্শনের জন্য করপোরেশন একটা আদর্শ গোশালা স্থাপন করেছিল। এটা অবস্থিত ছিল বাগবাজারে নন্দলাল বসু লেনে। পরে গোশালাটা উঠে যাবার পর, ওই জমিটাই করপোরেশন লীজ স্বত্বে দেয় মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিট্যুটকে। ওইখানেই এখন ওই স্কুলটা অবস্থিত। আমি যখন ওই স্কুলের সেক্রেটারী ছিলাম, তখন সেই গোশালার ঘরটাই ব্যবহৃত হত হাতের কাজ

(technical subjects) শিক্ষা দেবার জন্য। এখন এটা তুলে দেওয়া হয়েছে।

আমার ছেলেবেলায় শহরের বড় রাস্তাগুলোয় ছিল গ্যাসের আলো। গলিঘুঁজির ভিতর তখনও তেলের আলো জ্বলত। আর লোকের বসত বাড়ীতে? তখনও হারিকেন লানটার্ন আমদানী হয় নি। আমরা পড়াশুনা করতম রেড়ির তেলের প্রদীপের আলোতে। আর তখনকার দিনের লেখা-পড়ার সাজসরঞ্জামের বিষয় বললে, এখনকার অনেক ছেলে আশ্চর্য হয়ে যাবে। ফাউনটেন পেনের তো তখন প্রচলন হয়নি। নিব লাগানো কলমে লিখলেও, সেদিন আর অক্ষত হাতে বাড়ি ফিরতে হত না। যতক্ষণ না হাতের পাতা ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত মাষ্টারমশাইরা বেত্রাঘাত করে যেতেন। বাংলা লিখতে হত খাগের কলমে, আর ইংরেজি হাঁসের পালকের কলমে। এ সব আজকালকার দিনে অনেকের কাছে রূপকথা বলে মনে হবে। তবে যারা সে যুগের কথা জানতে চান তাঁরা এই লেখকের 'কালের কড়চা ঃ চন্দ্রাবতী' বা 'শতাব্দীর প্রতিধ্বনি' বই দুটি পড়তে পারেন।

## ৩৩ স্ত্রীশিক্ষা ও গঙ্গাবাঈ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে কলকাতার স্ত্রীশিক্ষার আঙিনায় ঘটেছিল এক বিপ্লব। এক রাজকুমারী কলকাতায় স্থাপন করেছিলেন এক আদর্শ স্ত্রীশিক্ষা বিদ্যায়তন, বাঙালী মেয়েদের স্কুলের সাধারণ পাঠক্রমের সঙ্গে হিন্দুর পূজা-অর্চনা শিক্ষা দেবার জন্য। তিনি ছিলেন রায় বেলুড়ের রাজা নারায়ণ রায়ের কন্যা গঙ্গাবাঈ। ওঁর মাসিমা ছিলেন ইতিহাস প্রসিদ্ধা ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ। দু'জনে ছিলেন অল্পবিস্তর সমবয়স্কা। ছেলেবেলায় দু'জনেই অশ্বারোহণে অসিচালনা করতেন প্রান্তরে প্রান্তরে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় লক্ষ্মীবাঈয়ের পাশে অশ্বারোহণে থেকে এই রমণী দেখিয়েছিলেন অসামান্য সাহস ও তেজস্বিতা। বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর নানাসাহেবের সঙ্গে তিনি পালিয়ে যান নেপালে। সেখানে আত্মগোপন করেছিলেন ত্রিশ বৎসর।

আশির দশকের শেষে তিনি আবির্ভূতা হন ভারতের রাজধানী কলকাতায়। দুর্গাপূজার বিজয়ার দিন পথে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা। পাশে কতগুলি স্কুলের মেয়েকে বলতে শুনলেন, 'প্রতিমা পূজার কোন সার্থকতা নেই।' বুঝলেন খ্রীষ্টান স্কুলের শিক্ষা থেকেই এসব বিরূপ ধারণা হয়েছে হিন্দু মেয়েদের মনে। হিন্দু মেয়েদের মনে হিন্দু ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাবার জন্য নিজেই একটা স্কুল খোলার সঙ্কল্প করলেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ এপ্রিল তারিখে মাতাজী মহারানী গঙ্গাবাঈ (সেই নামেই তখন তিনি পরিচিত) 'মহাকালী পাঠশালা' নামে এক অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন কাশিমবাজারের মহারানী স্বর্ণময়ীর আপার সারকুলার রোডের বাড়িতে। কিন্তু ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্কুলটি স্থানান্তরিত করলেন চোরবাগানে রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ির পূর্বদিকের এক বাড়িতে। তারপর সুকিয়া স্ট্রীটে (বর্তমানে কৈলাস বোস স্ট্রীট) এক বিঘা এগার কাঠা জমি কিনে স্কুলের চিরস্থায়ী ভবন নির্মাণ করলেন। স্কুল আরম্ভ করেছিলেন মাত্র কয়েকটি ছাত্রী নিয়ে। নূতন ভবনে স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা হল প্রায় দু'শ। বেথুন কলেজের মত মাতাজীর স্কুলেরও দুটো বলবান ঘোড়ায় টানা দু'খানা বাসগাড়ি ছিল, দূরের মেয়েদের আনবার জন্য। তাছাড়া, মেয়েদের হিন্দু ধর্ম বিষয়ক শিক্ষা দেবার জন্য বই ছাপার নিমিত্ত ছিল একটা ছাপাখানা। একটা পত্রিকাও ছিল।

ছেলেবেলায় যদিও ওই স্কুলের গাড়ি কলকাতার রাজপথে প্রত্যহ দু'বেলাই দেখতাম, তা হলেও পরে ওই স্কুলের কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। সম্প্রতি ওই স্কুলের কথা মনে আবার জাগ্রত হল, এক প্রাক্তন ছাত্রীর স্মৃতিচারণ পড়ে। তিনি হচ্ছেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা ভগিনী জীবনতারা দেবী। জীবনতারা ও তাঁর জ্যেষ্ঠা জীবনচণ্ডী, দুজনেই ওই স্কুলের গোড়ার দিকের ভাল ছাত্রী ছিলেন।

জীবনতারা লিখেছেন সাধারণ পাঠক্রম ছাড়া ওই স্কুলের বৈশিষ্ট্য ছিল বারো মাসে তের পার্বণ করা, রন্ধন শিক্ষা করা ইত্যাদি। তিনি লিখেছেন যে ওই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণী হতে প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস ছিল। পাঠ্যপুস্তক ছিল বোধোদয়, সীতার বনবাস, যদুগোপালের পদ্যপাঠ, কবিতা প্রসঙ্গ, রঘুবংশ, অষ্টাঙ্গ গীতা, চণ্ডীপাঠ, মহাভারতে

'সতীধর্ম, মনু হতে 'সাধ্বী সদাচার' ধর্মশিক্ষার জন্য নানা বই, নিত্যপাঠ্য স্তবের বই ইত্যাদি। এছাড়া পড়তে হত দীনেশ সেনের 'সতী', 'বেহুলা', 'ফুল্লরা' ও 'রামায়ণী কথা'।

পূজা-অর্চনার মধ্যে বোশেখ মাসের প্রথম দিন হতে প্রত্যহ এক মাস প্রতি মেয়েকে নিজ হাতে শিবঠাকুর তৈরি করে শিবপূজা করতে হত। দুপুরে কুমারী ভোজন চলত চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়ের সঙ্গে। আষাঢ় মাসে গুরুপূর্ণিমার দিন খুব উৎসব হত। আশ্বিন মাসে তিনদিন দুর্গাপূজা ও মহাষ্টমীতে বিরাট ভোগ রাগ, আর খাওয়ানো হত। বসন্ত পঞ্চমীতে সরস্বতী পূজাও ছিল এক বিরাট উৎসব। সব উৎসবেই মধ্যাহ্নে পরিপাটিরূপে ভোজের ব্যবস্থা ছিল। দুধের পায়েস, ক্ষীরের মিষ্টান্ন অঢেল পরিমাণে তৈরি করা হত। বছরের শেষের দিকে প্রতি বৎসর পুরস্কার বিতরণ করা হত। বর্ধমানের মহারাজা, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা, ছোটলাট, বড়লাট ও সেকালের অনেক পদস্থ ব্যক্তিরা পুরস্কার বিতরণী সভায় পৌরোহিত্য করতেন। পুরস্কার ছিল সোনার মেডেল, রূপার মেডেল, সোনার গহনা, বই, পূজার বাসন, বাক্স, ভাল সিল্কের কাপড় ইত্যাদি। সকলেই পুরস্কার পেত, তা সে পরীক্ষা দিক, আর না দিক। স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা সকলেই এই স্কুল পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। বোধ হয় নিবেদিতা এখান থেকেই প্রেরণা পেয়েছিলেন নিবেদিতা স্কুল স্থাপনে।

মাতাজী সব সময়ই পুরুষের বেশে থাকতেন, পরতেন ধুতি, পাঞ্জাবি, পাগড়ি ইত্যাদি। বোধ হয় আত্মগোপনের সময় এই বেশই তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

মাতাজীর স্কুল আজও জীবিত আছে। তবে তার নতুন নাম হয়েছে 'আদি মহাকালী পাঠশালা'।

## বাবুসমাজের বাজির লড়াই

ধর্মীয় সামাজিক উৎসবে আনন্দ প্রকাশের জন্য বাজির ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে এসেছে। কালীপূজার দিন এর ব্যবহার তুঙ্গে উঠত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এর ব্যবহার খুবই বেড়ে গিয়েছিল। তার কারণ ইংরেজরা আমোদ-প্রমোদের জন্য যখন তখন আতসবাজি ব্যবহার করতো। সেজন্য বাজির ব্যবসাটা সে যুগে খুব লাভজনক ছিল। এর জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে লাইসেন্স নিতে হত।

১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ময়নুদ্দীন বারুদওয়ালাকে বাজি তৈরি করবার জন্য লাইসেন্স দিয়েছিল। আবার ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আতসবাজির কারখানার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল কালীচরণ সিংহকে। প্রতি বৎসরই এরকম লাইসেন্স দেওয়া হত।

কথায় বলে কারোর পৌষ মাস আর কারোর সর্বনাশ। অষ্টাদশ শতাব্দীর কলকাতায় কোঠাবাড়ির সংখ্যা ছিল খুবই কম। অধিকাংশই ছিল কাঁচা চালাবাড়ি। ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে শহরে পাকা বাড়ি ছিল মাত্র আট খানা, আর কাঁচা চালাবাড়ি ছিল ৮০০০। ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে এই সংখ্যা যথাক্রমে ছিল ৪০ ও ১৩,৩০০, ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে ১২১ ও ১৪,৭৪৭ এবং ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ৪৯৮ ও ১৪,৪৫০। প্রায়ই আতসবাজিসমূহ এইসব চালাবাড়ির

ওপর পড়ে সেগুলোকে ভস্মীভূত করে দিত। সেজন্য তাদের নিরাপত্তার জন্য ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানি এক আদেশ জারি করে। সে আদেশের ভাষা—'শহরের মধ্যে আতসবাজি ছোঁড়ায় অনেক স্থানের চালাঘরে আগুন লেগে পাড়াকে পাড়া ভস্মীভূত করে দিয়েছে। পেরিন পয়েন্ট ও শহরের মধ্যে আমাদের যেসব বারুদখানা আছে—এরূপ আতসবাজির দ্বারা তারও বিপদ ঘটতে পারে। এজন্য আদেশ করা যাচ্ছে, কলকাতার মধ্যে আর আতসবাজি ছুঁড়তে দেওয়া হবে না। বাজির দোকানগুলো তুলে দেওয়া হবে।'

মনে হয় এরূপ নিরাপত্তামূলক আদেশ বিশেষ কার্যকর হয়নি। কেননা, আমরা দেখি এর দু'বছর পরে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কালীচরণ সিংহকে আতসবাজি তৈরি করবার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে। তার মানে শহরে আতসবাজি ছোঁড়া, বিশেষ করে কালীপূজার সময় পূর্ণোদ্যমেই চলেছিল।

সেযুগে কালীপূজার সময় বাজি ছোঁড়া একটা সার্বজনীন ব্যাপার ছিল। সাধারণ গৃহস্থরা তো আতসবাজি ছুঁড়তোই, ধনীসমাজে এটা আবার অনেক সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াতো। এ সমাজের লোকদের 'বাবু' বলা হতো। বাবুরা ছিল এক অদ্ভুত জাত। 'এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, পায়রা উড়াইয়া, বুলবুলের লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীণা ইত্যাদি বাজাইয়া, কবি হাফ-আখরাই, পাঁচালী প্রভৃতি শুনিয়া রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত এবং খড়দহের মেলা, মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতির সময় কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগকে লইয়া দলে দলে নৌকোযোগে আমোদ করিয়া আসিত।' এদের বাপ-ঠাকুরদারা নানারূপ অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জন করে কলকাতার অভিজাত পরিবারসমূহের প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিল এবং তাদের বংশধররাই 'বাবু' হয়ে সে টাকার অপব্যয় করতো। এমনকি পুতুলের বিয়েতে, বিড়ালের বিয়েতে তারা হাজার হাজার টাকা খরচ করতো। আর মদ ও মেয়ে-মানুষের পেছনে টাকা ব্যয় করেই এরা নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল।

এহেন বাবুরা কালীপূজার সময় আতসবাজি নিয়ে হই-হুল্লোড় করবার জন্য বারাঙ্গনাদের গৃহে সমবেত হতেন। সারা বছরে যেসব মেয়ে-মানুযদের বাবু জুটতো না, কালীপূজার দিন তাদের ঘরেও লোক আসতো। তখন তারা দুটো ভালোমন্দ জিনিস পেটভরে খেতে পেতো। মাংস হতো, ভালো ভালো মদ আসতো—ভালো জামাকাপড় পেতো। স্নানযাত্রা, রাসযাত্রা, কালীপূজা, কার্তিক পূজা—এ সময়গুলোই ছিল ওদের মরসুম।

যাঁরা বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম' পড়েছেন, তাঁরা তো জানেন একবার কালীপূজার দিন রাত্রে বড়বাজারের বড়বাড়ির ছোটকর্তার রক্ষিতা চুনীদাসীর জানবাজারের বাড়িতে কি ঘটেছিল। ছোটকর্তার রক্ষিতার বাড়ির দক্ষিণেই ছিল কতকগুলো বাজারের মেয়ে-মানুষের বাড়ি। ও-বাড়িতে মেয়ে-মানুষ ছিল চল্লিশটা, আর কালীপূজার দিন হুল্লোড় করতে বাবু এসেছে একশো জন। বাবুরা মেয়েগুলোকে ছাদের ওপর নিয়ে গিয়ে হইহুল্লোড় করে তুবড়ি ছুঁড়ছে। চুনীদাসী ছোটকর্তার সঙ্গে বাজি দেখবার

জন্য ছাদে উঠেছে। একটা বাজি এসে পড়লো চুনীদাসীর উঠোনে। সেখানে ছিল চুনীদাসীর এক পোষা টিয়া পাখি। বাজিটা শেষ করে দিল চুনীদাসীর টিয়া পাখিটাকে। রেগে আগুন হয়ে উঠলো ছোটকর্তা। রাগলে ওঁর জ্ঞান থাকে না। হুকুম দিলেন চাকর বৃন্দাবনকে—এখুনি তুবড়ি কিনে আনো—হাজার টাকার তুবড়ি। বড়বাড়ির বাবুদের তো হাজার ছাড়া কথাই নেই। বৃন্দাবন তুবড়ি কিনতে গেল। কিন্তু হাজার টাকার তুবড়ি তো চাট্টিখানি কথা নয়। কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা পাওয়া গেল, তাই নিয়ে হাজির হলো বৃন্দাবন। ছোটকর্তা হুকুম দিলো—ছোঁড়ো সবাই ওদের দিকে। ও বাড়ির মেয়েরা আর বাবুরাই বা ছাড়বে কেন। তারাও ছোটকর্তার তুবড়ি কাটার সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরু করলো। ও-বাড়ির ছাদের আলসের ওপর সার-সার চল্লিশটা তুবড়ি বসিয়ে চল্লিশটা মেয়ে একসঙ্গে আগুন ধরিয়ে দিলো। চল্লিশটা তুবড়ি আকাশের দিকে মুখ করে শোঁ শোঁ শব্দে ফুলের তোড়ার মতো উড়ে চলেছে। একসঙ্গে চল্লিশটা মেয়ের হল্লোড়। আর তাদের একশো বাবু। [illegible] মদ খেয়ে [illegible]। ছাদের ওপরেই মাদুর পেতে হারমনিয়াম নিয়ে নাচ-গান চলেছে। একশো বাবু একসঙ্গে চিৎকার করে উঠছে—কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ। হঠাৎ এদিক থেকে বৃন্দাবন ছুঁড়লো তুবড়ি। তুবড়ির ঝাঁক। ও-মা-গো বলে ছিটকে পড়লো মেয়েদের দল। গান-বাজনা মাথায় উঠলো তাদের। শাড়িতে সেমিজে আগুনের ফুলকি লেগেছে। উদ্দাম হয়ে উঠলো আসর। তারপর আরো তুবড়ির ঝাঁক গিয়ে পড়লো আবার। ছোটকর্তা বলে—দে বৃন্দাবন, সব মাগীদের পুড়িয়ে মার, পাঁচ গণ্ডা তুবড়ি নিয়ে বাড়ি পোড়াতে আসে। এক একটা তুবড়ি শোঁ শোঁ করতে করতে যায় আর ওদের ছাদে পড়ে ছত্রখান হয়ে যায়। আগুনের ফোয়ারা ছোটে। কিলবিল করে ওঠে মাগীগুলো। মাগীরা বলে—এ কী কাণ্ড মা, পালিয়ে যাই নিচে। কিন্তু বাবুরা ছাড়বে কেন? তারা পয়সা খরচ করে ফূর্তি করতে এসেছে, এত সহজে মাটি হবে সব! দু' একটা মাগী মরলো কি গেল, তাতে তাদের কী। তারপর একটা তুবড়ি এসে পড়লো একেবারে ছোটকর্তার গায়ে। চুনীদাসী ছুটে গিয়ে, ছোটকর্তার গায়ের সে আগুন না নেভালে, ছোটকর্তা তো আগুনে পুড়ে একাকার হয়ে যেত। কালীপূজার দিন বাবুসমাজের হুল্লোড়ের এ একটা বিশস্ত বর্ণনা।

বাবুরা যেমন মেয়ে-মানুষের বাড়ি গিয়ে বাজি পুড়িয়ে হইহুল্লোড় করতো, বড়বাড়ির ছেলেমেয়েরাও তেমনি কালীপূজার রাত্রে হাজার হাজার টাকার বাজির শ্রাদ্ধ করতো।

সব লোকের বাড়ির ছেলেমেয়েরাই অন্য বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিত নানারকম বাজি ছুঁড়ে, যেগুলো আকাশে গিয়ে নানারকম ফুলের জ্বলন্ত মালা বা অন্য আকৃতির জিনিস সৃষ্টি করতো। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় বাজি বলে গণ্য হতো, যা আকাশের গায়ে লিখে দিত—God save the King!

## ১৩০ কলকাতার ঠাকুর রামকৃষ্ণ

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কলকাতারই মানুষ হতেন, যদি না আকস্মিকভাবে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পড়তেন।

ছেলেবেলাতেই বাবা মারা যান। জ্যেষ্ঠ রামকুমার সংসারের অনটন অভাবে পীড়িত হয়ে কলকাতায় আসেন, একটা টোল খুলবেন বলে। সঙ্গে নিয়ে আসেন ছোটভাই গদাধরকে। ওকে দিয়ে যজমানদের পূজা-আর্চা করাবেন। তাতে আয় কিছু বাড়বে। গদাধরের বয়স তখন ষোল কি সতেরো।

প্রথম এসে ওঠেন সুরতিবাগানে। তারপর যান ঝামাপুকুরে। সেখানেই টোল স্থাপন করেন। গদাধর ঝামাপুকুরের মিত্তিরদের বাড়ি পূজা-আর্চা করতে থাকে।

কলকাতার পণ্ডিতসমাজে তখন উঠেছে এক ঝড়। জানবাজারের রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে প্রতিষ্ঠা করেছেন মা ভবতারিণীর মন্দির। ঠিক করেছেন সেখানে মাকে অন্নভোগ দেবেন। পণ্ডিত সমাজ বলে উঠল, শূদ্রাণীর অধিকার নেই অন্নভোগ দেবার। কেউই মন্দিরের পূজারী হতে চাইল না।

রামকুমার বিধান দিলেন, রানী যদি তাঁর গুরুদেবের নামে মন্দির উৎসর্গ করেন, তবে তাঁর মন্দিরে অন্নভোগ নিশ্চয়ই হতে পারবে। রানী তাই করলেন। কিন্তু পূজার ব্যাপারে তাঁর গুরুবংশের শাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে রানীর কোন আস্থা নেই। রামকুমারই পূজারী হলেন। চলে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। সঙ্গে এল গদাধর।

মন্দিরের পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয়েছে রানীর জামাই মথুর বিশ্বাসের ওপর। গদাধরের মধ্যে তিনি পেলেন অলৌকিক শক্তির সন্ধান। কিছুদিন পরে রামকুমারের মৃত্যু হলে, গদাধরই নিযুক্ত হ'ল মায়ের মন্দিরের পূজারী।

গদাধর মন্তর-তন্তরের ধার ধারে না। নিজের ইচ্ছামত মাকে সাজান। মায়ের সঙ্গে কথা বলেন। মাকে নিবেদন করবার আগেই নিজে মায়ের ভোগ খেয়ে ফেলেন। রানী একদিন মাকে দর্শন করবার জন্য মন্দিরে এসেছেন। ঠাকুর রানীকে মেরেই বসলেন এক চড়। বললেন, মায়ের কাছে এসেও বিষয়-সম্পত্তির কথা ভাবছিস্। রানী মুগ্ধ। জামাই মথুরও তাই।

হিন্দু স্কুলে মথুরের সহপাঠী ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথ তখন মহর্ষি। একদিন গদাধর (ঠাকুর রামকৃষ্ণ) মথুরকে ধরে বসল, মহর্ষির কাছে নিয়ে চল। মথুরের সঙ্গে একজন খালি গায়ে আগত ব্যক্তিকে দেখে মহর্ষি তো হতভম্ব। তারপর মুগ্ধ। ঠাকুরকে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন আগামী মাঘোৎসবের অনুষ্ঠানে।

অনেকদিন পরের কথা মথুর তখন গত হয়েছেন। রামকৃষ্ণ চলেছেন -ম'র সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বাড়ি। বিদ্যাসাগর অভ্যর্থনা করে পরম সমাদরে ঠাকুরকে নিয়ে গিয়ে বসালেন তাঁর দোতলার বসবার ঘরে। ঠাকুর বললেন, আজ সাগরে মিললাম। এতদিন খালবিল, হদ্দ নদী দেখেছি। এইবার সাগর দেখছি। বিদ্যাসাগর সহাস্যে বলছেন তবে নোনাজল খানিকটা নিয়ে যান। ঠাকুর বলছেন, না গো। নোনা জল কেন? তুমি তো

অবিদ্যার সাগর নও। তুমি ক্ষীরসমুদ্র। তুমি বিদ্যাদান করছো, অন্নদান করছো। এসব তো নিষ্কাম কাজ। এসব কাজ করলেই তো ভগবান লাভ হয়। আর তুমি তো সিদ্ধ আছোই। বিদ্যাসাগর বললেন, সিদ্ধ কি রকম? ঠাকুর বললেন। আলু, পটল, সিদ্ধ হলে তো নরম হয়, তুমি তো খুব নরম। তোমার এত দয়া। বিদ্যাসাগর বললেন, মশাই কলাই-বাটা তো সিদ্ধ হলে শক্তই হয়! ঠাকুর বলছেন, তুমি তা নয় গো। শুধু পণ্ডিতগুলো দরকচা পড়া। না এদিক, না ওদিক। শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে, কিন্তু তার নজর থাকে ভাগাড়ে। যারা শুধু পণ্ডিত, শুনতেই পণ্ডিত, কিন্তু তাদের কামিনীকাঞ্চন আসক্তি—শকুনির মত পচা মড়া খুঁজে বেড়ায়। আসক্তি অবিদ্যার সংসারে। দয়া, ভক্তি, বৈরাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য। ব্রহ্মবিদ্যাও অবিদ্যার পার। তিনি মায়াতীত। ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়দর্শন, সব এঁটো হয়ে গেছে। মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ করা হয়েছে, তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটা জিনিস কেবল এঁটো হয়নি, উচ্ছিষ্ট হয়নি, সে জিনিসটা হচ্ছে ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্যন্ত কেউ মুখে বলতে পারেনি। বিদ্যাসাগর বললেন, বা, এটি তো বেশ কথা। আজ একটি নতুন কথা শিখলাম ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হয়নি।

গিরিশ ঘোষ তখন নাট্যজগতের মধ্যাহ্ন গগনে। শুনেছেন এক পরমহংস আসছেন বোসপাড়ার দীননাথ বসুর বাড়িতে। কৌতূহলবশে দেখতে গেছেন। গিরিশ লিখেছেন— 'তথায় শ্রদ্ধার পরিবর্তে অশ্রদ্ধা লইয়া আসিলাম'। বহুবার তাঁকে ব্যঙ্গও করেছেন। তারপর গিরিশ পরমহংসদেবকে দেখলেন বলরাম বসুর বাটিতে, মধু রায়ের গলিতে রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে। গিরিশের যে কি হল, সে গিরিশ জানে। গিরিশ ঠাকুরের পরম ভক্ত হয়ে উঠল। দক্ষিণেশ্বরে ছোটে দিনের পর দিন। গিরিশ লিখেছেন,—'আমি পতিত, কিন্তু ভগবানের অপার করুণা, আমার কোন চিন্তার কারণ নেই। জয় রামকৃষ্ণ'। এরপর ঠাকুর এসেছেন গিরিশের বাড়িতে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ এপ্রিল তারিখে। ঠাকুরকে নিয়ে গিরিশ সেদিন উৎসব করছেন। অনেক জ্ঞানী-গুণী লোকের সেদিন সেখানে সমাগম হয়েছে। কীর্তন চলেছে। গিরিশ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করছে, মহাশয় একাঙ্গী প্রেম কাকে বলে? ঠাকুর বলছেন, একাঙ্গী কিনা, ভালবাসা একদিক থেকে। যেমন মতী। কৃষ্ণসুখে সুখী, তুমি সুখে থাক, আমার যাই হোক।

ওই সালেরই ১ সেপ্টেম্বরের কথা। গিরিশ কাঁদতে কাঁদতে দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত। গিরিশ হাতজোড় করে ঠাকুরকে বলছে, তুমিই পূর্ণব্রহ্ম, তা যদি না হয়, সবই মিথ্যা। বড় খেদ রইল তোমার সেবা করতে পেলুম না। ভগবন্ তুমি আমাকে পবিত্রতা দাও যাতে কখনও একটু পাপচিন্তা না হয়। ঠাকুর বলছেন—তুমি পবিত্র তো আছোই— তোমার যে বিশ্বাসও ভক্তি।

মহেন্দ্রলাল সরকার মস্ত বড় বিজ্ঞানী। খ্যাতনামা চিকিৎসকও বটে। তিনিই ঠাকুরের শেষদশায় চিকিৎসা করেছিলেন। ঠাকুরের ঐশ্বরিক শক্তিই তাঁকে ঠাকুরের কাছে টেনে এনেছিল।

ঠাকুর কলকাতায় এসেছিলেন তিনবার থিয়েটার দেখতে। তিনবারই স্টার থিয়েটারে। প্রথমবার 'চৈতন্যলীলা' দেখতে ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ সালে। দ্বিতীয়বার ওই সালের

১৪ ডিসেম্বর তারিখে 'প্রহ্লাদচরিত্র' দেখতে। আর তৃতীয়বার ওর পরের সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'বৃষকেতু'র অভিনয় দেখতে। ঠাকুর এমনই অলৌকিক শক্তি যে 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয়ের সময় নটী বিনোদিনী হবিষ্যান্ন করত। থিয়েটার দেখবার দু'বছর আগে ১৮৮২ সালে ১৫ নভেম্বর ঠাকুর কলকাতায় উইলসনের সার্কাস দেখতেও এসেছিলেন।

দাদা রামকুমারের সঙ্গে ঠাকুর যখন প্রথম কলকাতায় আসেন, তখন তিন-চার বৎসর তিনি কলকাতারই অধিবাসী ছিলেন। তাঁর তিরোধানের শেষের কয়েক বছরও তিনি কলকাতায় অনবরত এসেছেন। এ যেন কল্লোলিনী কলকাতার তাঁর প্রতি আবেদন ও আহ্বান।

কলকাতায় তিনি এসেছেন ঠনঠনিয়ার ঈশান মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি, শ্যামপুকুরে প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও 'শ্রী-ম'র বাড়ি। অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ি, সিমুলিয়ায় মধু রায়ের গলিতে রামচন্দ্র দত্তের বাড়ি, কেশব সেনের কমল কুটিরে, শোভাবাজারের বেনেটোলায় অধর সেনের বাড়ি (এখানেই বঙ্কিমচন্দ্র ঠাকুরকে দেখতে এসেছিলেন; ঠাকুর বঙ্কিমকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি যে বঙ্কিম বা বাঁকা গো; বঙ্কিম বলেছিলেন, সাহেবের জুতায়; ঠাকুর বলেছিলেন, না গো না, তুমি কৃষ্ণপ্রেমে বঙ্কিম বা বাঁকা), পাথুরিয়াঘাটায় যদু মল্লিকের বাড়ি, খেলাত ঘোষের বাড়ি, বাগবাজারে নন্দলাল বসুর বাড়ি ও ওই বাড়ির নিকটে এক বিধবা ব্রাহ্মণীর বাড়ি, মনোমোহনের বাড়ি, সিমুলিয়ায় রাজমোহনের বাড়ি ও বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ি। বলরাম ভবনে ঠাকুর বহুবার এসেছেন। এছাড়া, তিনি সিন্দুরিয়াপটির ব্রাহ্ম সমাজ, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, নন্দনবাগান ব্রাহ্ম সমাজ ও সিঁথির ব্রাহ্ম সমাজেও এসেছেন। আরও এসেছেন, মারোয়াড়ি ভক্তমন্দিরে, কাঁসারিপাড়ার হরিভক্তি প্রদায়িনী সভায় ও গরাণহাটায় ষড়ভুজদর্শনে। কাশীপুরের উদ্যানবাটিতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করবার পূর্বে শেষের কয়েক মাস পীড়িত অবস্থায় কলকাতার শ্যামপুকুরেই থেকে গিয়েছেন।

## ৩৩০ কলকাতার আড্ডা ও মেয়ে মজলিস

অভিধানে দেখি 'আড্ডা' শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন মিলনস্থল যেখানে কিছু লোক দলবদ্ধ হয়ে গল্পগুজব ও রঙ্গ-তামাশা করে কালক্ষেপ করে। সেদিক থেকে কলকাতা বরাবরই আড্ডাবাজ শহর। শহরের প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্ণকই ছিলেন প্রথম আড্ডাবাজ ব্যক্তি। প্রত্যহ নিমতলা থেকে শিয়ালদহ-বৈঠকখানায় তিনি যেতেন তামাক খেতে খেতে আড্ডা দিতে। তারপর সাহেবদের আড্ডা হত লালবাজার ও কসাইটোলার সরাইখানা বা ট্যাভার্ণগুলোতে। কলকাতায় যখন 'বাবু' সমাজের উদ্ভব হল, তখন বাবুদের ফরাস পাতা বৈঠকখানায় আড্ডা চলত 'বাবু' ও তাঁর মোসাহেবদের। উনিশ শতকের কলকাতার এক বিখ্যাত আড্ডা ছিল বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখুজ্যের বাড়িতে। নাম ছিল 'পাখীর আড্ডা', কেননা সেখানে আড্ডাবাজরা এক একটা পাখীর বেশ ধারণ করে একখানা ইটের ওপর বসত। [illegible] আর একটা বিখ্যাত আড্ডার কথাও আমরা শুনি। এটা হচ্ছে 'হরি

খোসার গোয়াল'। এখানে পরিচিত অপরিচিত সবাই একত্রিত হয়ে আড্ডা দিত এবং দেশের অন্ন ধ্বংস করত। এছাড়া ছিল পারিবারিক আড্ডা, যেমন, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির আড্ডা, যেখানে পরিবারের সকলে মিলিত হয়ে সাহিত্য, সঙ্গীত ও নাট্যাভিনয় ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করত। বাগবাজারে ভুবন নিয়োগীর গঙ্গার ধারের বৈঠকখানার নাট্যাভিনয়ের মহড়া দেবার আড্ডাও বিখ্যাত, কেননা এরই পরিণতিতে কলকাতায় স্থাপিত হয়েছিল প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়। এছাড়া ছিল দুপুরে মেয়েদের আড্ডা। একে বলা হত 'মেয়ে মজলিস'। বর্তমান শতাব্দীর ত্রিশ-চল্লিশ দশকে আড্ডার মিলনস্থল ছিল চায়ের দোকান। উনিশ শতকের বাঙালী চা খেত না। তারা জানতই না, চা তরল পদার্থ না নীরেট বস্তু। শহরে চা খাওয়া শুরু হয় প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পর বিশের দশকের গোড়ার দিকে। 'ইণ্ডিয়ান টি সেস্ কমিটি' এক বিরাট অভিযান চালায় শহরের লোককে চা খাওয়া রপ্ত করাবার জন্য। পাড়ায় পাড়ায় তখন আবির্ভূত হয় 'ইণ্ডিয়ান টি সেস্ কমিটি'র সুদৃশ্য গাড়িগুলো লোককে চা খাওয়ায় দীক্ষিত করবার জন্য। ওই গাড়িতে চা তৈরি করে তারা লোককে বিনা পয়সায় চা খাওয়াতে লাগল। এরই পরিণতিতে কলকাতায় পয়সা দিয়ে চা পানের জন্য দু-চারটে চায়ের দোকান প্রতিষ্ঠিত হল। চা তখন অন্তঃপুরে ঢুকতে পারে নি। সেজন্য লোক চা পানের জন্য চায়ের দোকানেই যেত। তা থেকেই চায়ের দোকানের আড্ডার উদ্ভব হল। একটা নামকারা চায়ের দোকান ছিল নেবু চাটুজ্যে স্ট্রীটের শেষপ্রান্তে সিটি কলেজের বিপরীত দিকে। মালিক একজন নিরক্ষর ব্যক্তি। মেদিনীপুরে বাড়ি, নাম রাম মাইতি। কলেজের ছেলেরা তাকে 'রামবাবু' বলে ডাকত, কেননা রামের চায়ের দোকানটাই ছিল কলেজের পরীক্ষার সময় প্রশ্নপত্রের উত্তর-লেখা খাতা পাচার করবার কেন্দ্র। সেজন্যই ছেলেরা রামকে 'রামবাবু' বলে সম্মান করত। রামের দোকানটাই ছিল ছেলেদের দুপুরবেলা আড্ডা দেবার জায়গা। এখানে উল্লেখ করি যে আমাদের স্কটিশ চার্চেস কলেজের কাছে একরকম কোন চায়ের দোকান ছিল না।

আমাদের বাগবাজারে কোন চায়ের দোকানই ছিল না। ছিল একটা শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর পাশে [illegible] ঘরে পাল মশায়ের চায়ের দোকান। তবে সেখানে আড্ডা বড় একটা [illegible] বিক্রির চেয়ে পাল মশাইয়ের বড় 'ইনকাম' ছিল এজেনসী কমিশন থেকে, কেননা, উত্তর কলকাতায় পাল মশায় ছিলেন একমাত্র এজেন্ট গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের 'হস্তেরা স্পৃষ্ট নয়' লেখা 'পাউরুটি' বিক্রির জন্য।

সালটা বোধ হয় ১৯২৯ হবে। একদিন সকালে পথে বেরিয়ে দেখি আমাদের বাগবাজারে একটা চায়ের দোকান হয়েছে। উঁকি মেরে দেখি দোকানের ভেতর রাম মাইতি রয়েছে। ঢুকে পড়লাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কি হে রাম, বাগবাজারেও একটা দোকান খুললে। রাম বলল, না বাবু, কলেজ কর্তৃপক্ষ পিছনে লাগায় ও দোকানটা তুলে দিলাম। বাগবাজারেই একটা দোকান খুললাম। কিন্তু রামের দোকানের আড্ডা জমল না। রাম দোকানটা তুলে দিল। ওই ঘরেই এক বুড়ো ভদ্রলোক একটা চায়ের দোকান খুললেন, নাম দিলেন 'স্বরাজ কেবিন'। কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তখন আমাদের পাড়াতেই থাকতেন। বোধ হয় দোকানটার নামের মাহাত্ম্য হেতু তারাশঙ্করবাবু

'স্বরাজ কেবিন'-এ-ই চা খেতে লাগলেন। কিন্তু ওই দোকানের অন্যান্য খরিদ্দাররা সবই নিম্নস্তরের লোক। সুতরাং ওখানে চায়ের দোকানের আড্ডার আর কোন লক্ষণই দেখা দিল না।

ভীষণভাবে চায়ের দোকানের আড্ডাটা জমল বাগবাজার স্ট্রীট ও আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের গলির মুখে অবস্থিত বিপিন নিয়োগীর বাড়ির তলায় 'নিশানাথ কেবিন'এ। এ বাড়িটাতে আগে সিনেমা জগতের ডি.জি.বা ধীরেন গাঙ্গুলী থাকতেন। ওই ঘরটাই ছিল ওঁর বৈঠকখানা। ডি. জি. উঠে যাবার পর যশোর জেলার তিন যুবক ভাই ওই ঘরটা ভাড়া নিয়ে 'নিশানাথ কেবিন' নামে এক চায়ের দোকান খুলল। গোড়া থেকেই রমরমা বিজনেস্। আড্ডা দেবার ওটা একটা মহাপীঠ হয়ে দাঁড়াল। 'নিশানাথ কেবিন'-এর একটা বিশদ বিবরণ আমি দিয়েছি আমার 'শতাব্দীর প্রতিধ্বনি' নামক বইয়ে। ওই বইয়ে ত্রিশের ও চল্লিশের দশকের আরও আড্ডার কথা আছে। তা থেকেই কতকগুলো বাক্য আমি এখানে উদ্ধৃত করছি 'নিশানাথ কেবিন' সম্বন্ধে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকমণ্ডলীর সব কর্মীই 'নিশানাথ কেবিন'-এ আসত চা খেতে। তখন ওদের সঙ্গে বেশ মজলিশ হত। ওই 'নিশানাথ কেবিন'-এ আরও আসতেন আমার পাড়ার বন্ধুরা ও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি।...'নিশানাথ কেবিন'-এ দুবেলা চা খেতে আসতন বিখ্যাত দ্বিকণ্ঠী গায়ক অনাথ বসু ও সেতারী মুস্তাক আলি খান। মুস্তাক তখন অনাথদার বাড়িতেই থাকতেন। বহুদিন মুস্তাক অনাথদার বাড়িতেই থেকেছে। কতলোক যে 'নিশানাথ কেবিন'-এ আনাগোনা করত, তার ইয়ত্তা নেই। খুব জমাটি করে আমাদের সঙ্গে আড্ডা দিত সেই মোটা জারমান সাহেবটা যে এখানে এসেছিল 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র বিরাট রোটারি মেশিনটা ফিট করতে।...আমরা বন্ধুরা যারা দু'বেলা 'নিশানাথ কেবিন'-এ জড় হতাম, তাদের মধ্যে ছিল শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য, হীরেন মল্লিক (ওরফে চণ্ডী), মদন দত্ত, কেদার সর্বাধিকারী ও তার দাদা প্রভাত সর্বাধিকারী। শ্যামাচরণ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র স্পোর্টস্ এডিটর। হীরেন মল্লিকদের ছিল খড়ের ব্যবসা। শান্তিনিকেতন-এর সে প্রাক্তন ছাত্র। মদন দত্ত পরে 'যুগান্তর' পত্রিকার চীফ অ্যাকাউন্টটেণ্ট হয়েছিল। কেদার টেলিগ্রাফ ডিমার্টমেণ্টে চাকরি করত। ওরই দাদা হচ্ছে প্রভাত সর্বাধিকারী। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। তিনটা বিষয়ে এম.এ.—ম্যাথামেটিকস্, ফিজিকস্ ও ইকনমিকস্। পরে প্রভাত ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে অধ্যাপক হয়েছিল। একদিন 'নিশানাথ কেবিনে'-এ খুব জমাটি আড্ডা বসেছে। চণ্ডী জানালার ভেতর দিয়ে বাইরে রাস্তায় কাকে দেখেছে। দেখামাত্রই ঘরের ভেতর থেকে চিৎকার করে ডাকতে লাগল, অঃ সাগর, অঃ সাগর। চণ্ডীর ডাক শুনে চকিতের মধ্যে আমার মনে পড়ে গেল 'দেবী চৌধুরাণী'র সাগরের কথা। সুতরাং প্রথম বুঝতে পারলাম না চণ্ডী যাকে ডাকছে, সে মেয়ে কি পুরুষ। চণ্ডী বেরিয়ে গিয়ে যখন ঘরের ভেতর নিয়ে এল, তখন বুঝতে পারলাম ও যাকে ডাকছে সে মেয়ে নয়, একজন তরুণ পুরুষ। চণ্ডী তাকে চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসিয়ে আমাদের বলল, এ আমাদের শান্তিনিকেতন-এর সহপাঠী সাগরময় ঘোষ, কালীমোহন ঘোষের ছেলে।'

চায়ের দোকানের আড্ডা ছাড়া ছিল রকের আড্ডা। 'নিশানাথ কেবিন'-এর উলটো

দিকেই রাস্তার অপর পারে শিশির কুমার ইনস্টিট্যুট-এর নিচের তলার রকে বসতো আর একটা আড্ডা। ওরা সকলেই শিশির ইনস্টিট্যুট-এর সদস্য। ওই রকে সমবেত হয়ে আড্ডার আসর বসাতো সুকোমল কান্তি ঘোষ, প্রফুল্লকান্তি ঘোষ (শত ঘোষ), ক্রিকেটিয়ার কমল ভট্টাচার্য ও ওর দাদা সঙ্গীতজ্ঞ অনিল ভট্টাচার্য, মিহির লাল গাঙ্গুলী, প্রভাতকুমার বসু (বসুদা), জ্যোতির্ময় নাগ (নাগু), সুধীর কুমার বসু, বগলা ভট্টাচার্য (বিধায়ক ভট্টাচার্য) ও আরও অনেকে। ওরা মাঝে মাঝে চিৎকার করে 'নিশানাথ কেবিন'-এ বলত, 'সাতটা হাফ্-কাপ্ চা দিয়ে যা'। ওরা নানা বিষয় নিয়ে গলা-ফাটিয়ে তর্ক-বিতর্ক করত। মাঝে মাঝে খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠত। (অবশ্য আমাদের 'নিশানাথ কেবিন'-এও আলোচনা মাঝে মাঝে খুব উত্তপ্ত হয়ে উঠত।)

কাছাকাছি আর একটা রক্ ছিল, আমার বাড়ির গলির মুখে রসিকমোহন বিদ্যাভূষণের রক। ওর নেতা ছিল মিনার্ভা থিয়েটারের কৌতুক অভিনেতা কুমার মিত্তির। ওটা ছিল পাড়ার যত 'বকা' ছেলের আড্ডা। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলাম আমি। একবার আমি হাজারিবাগ থেকে ফিরে এসে দেখি কুমার মিত্তিরের আড্ডায় জুটেছে এক নতুন যুবক। দেখলাম যুবকটিও বেশ মজাদার গল্পগুজব করে, এবং সেই কারণে সকলেরই প্রিয় হয়ে উঠেছে। তখন 'আগস্ট বিপ্লব' চলছে। আমাদের বাই লেনের দেওয়ালের গায়ে রাত্তিরে কে বা কারা হাতে লেখা সাইক্লোস্টাইল করা সংবাদপত্র লাগিয়ে দিয়ে যেত। তাতে মেদিনীপুরে যে সব অমানুষিক অত্যাচার ঘটছিল তার বিবরণ থাকত। একদিন আমাদের পাড়াতে একটা মিটিং হল। ওই মিটিং-এ কুমারদার আড্ডার ওই নতুন যুবকটি একটা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিল। তার পরের দিনই পুলিস এল, বাড়ি-বাড়ি সার্চ করতে। কিন্তু ওই যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। শুনলাম ও হচ্ছে রামমনোহর লোহিয়া। কুমারদার খিস্তিখেয়ুড়ের আড্ডার দিকে পুলিশ কোনদিন নজর দেবে না, এই ভেবেই ও ওভাবে ওখানে আত্মগোপন করেছিল। সব শুনে কুমারদা বলল, 'ব্যাটা আমার চেয়েও ভাল অভিনয় করে গেল'।

আর একটা আড্ডার কথা বলি। সেখানে আমার যাওয়া কুমারদার সূত্রেই ঘটেছিল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে মিনার্ভা থিয়েটার পুড়ে যাবার পর, ওখানে যে নূতন বাড়িটা তৈরি হচ্ছিল, তার অসমাপ্ত দোতলার ওপর একটা ঘরে সকালের দিকে থিয়েটারের নট-নটীরা আড্ডা দেবার জন্য জড় হত, এবং আমি তখন বাঁশের ভারা দিয়ে উঠে (তখনও সিঁড়ি হয় নি) ওই আড্ডায় যেতাম এবং সেখানে আঙুর নামে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার খুব সম্প্রীতি বন্ধুত্বও হয়েছিল। ওরই সঙ্গে বসে আমি একান্তে আড্ডা দিতাম। এছাড়া, ত্রিশের চল্লিশের দশকে দাবার ও তাসের আড্ডা, সাহিত্য বাসরও ছিল। আমাদের শ্যামবাজার পাড়ায় তাসখেলার বিখ্যাত আড্ডা ছিল মিত্রিদের বাড়িতে 'থেটা বেটা' ক্লাব। আর যে সব সাহিত্যবাসরে আমি যোগ দিতাম, তা হচ্ছে কাঁটাপুকুরে সরোজ মিত্তিরদের বাড়িতে ও যামিনদার (শিল্পী যামিনী রায়) বাড়িতে। এছাড়া ছিল 'শনিবারের চিঠি'র আসর, 'কালি-কলমে'র আসর, 'দেশ' পত্রিকায় ও এম.সি.সরকারের দোকানের আড্ডা। এগুলো, সবই সাহিত্যিকদের আড্ডা ছিল। এবার ওই যুগের আরও আড্ডার কথা বলি। আমাদের বাগবাজার বাই লেনের গলির মুখে ছেলেদের একটা আড্ডা হত। ওখানে

সকলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আড্ডা দিত। আবার ছেলেদের মধ্যে যারা প্রথম বিড়ি-সিগারেট খেতে আরম্ভ করত, তারা খালধারে গিয়ে নিরালায় ওই কাজটা সারত এবং ওখানেই আড্ডা দিত। আর বয়স্ক লোকরা যারা গাঁজা খেত (এ নিয়ে বাগবাজারের প্রসিদ্ধি অনেক কালের) বাগবাজারের বিচালি ঘাটে গিয়ে গাঁজার আড্ডা বসাত। গঙ্গার ঘাটের আরও আড্ডার কথা বলি। উনিশ শতকের যে 'মেয়ে মজলিস'-এর কথা বলেছি, সেটা পাড়ার কোন বাড়ির বর্ষিয়সী গৃহিণীর ঘরে বসত। তখনকার দিনের মেয়েরা সম্পূর্ণ অসূর্যম্পশ্যা ছিল বলে, বাড়ির পিছনের খিড়কির দরজা দিয়ে প্রবেশ করে ওই মজলিসে যোগ দিত। ঘরকন্নার কথা নিয়েই তারা আলোচনা করত। কিন্তু ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে পার্ক সার্কাসের কংগ্রেসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র যখন এক মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকার দল গঠন করলেন, তখন মেয়েরা আর অসূর্যম্পশ্যা রইল না। আগে মেয়েরা গঙ্গাস্নানে যেত ভোর রাতে এবং সূর্যোদয়ের পূর্বেই বাড়ি ফিরত। কিন্তু ত্রিশের দশকে মেয়েরা দিনের আলোতেই গঙ্গাস্নানে যেতে লাগল এবং গঙ্গার ঘাটে মজলিস বসাতে লাগল। এসব মজলিসে আলোচনা হতে লাগল নানা বাড়ির কুৎসা ও কেচ্ছা। তার মানে মেয়ে মজলিসের বিষয়বস্তু পালটে গেল। গঙ্গার ঘাটে আর এক রকমেরও আড্ডা বসত। বিকালে স্কুল কলেজের ছেলেরা জেটির ওপর বা গাধা বোটের ওপর বসে আড্ডা দিত।

বিকালে স্কুল-কলেজের ছেলেদের আড্ডা দেবার আর একটা জায়গা ছিল পার্কের মাঠে বা খেলার মাঠে। ময়দানে খুব জমাটি আড্ডা বসত ক্লাব ঘরে খেলোয়াড়দের ও অন্যান্য সদস্যদের। আর পার্কের মাঠে যে ছাউনিগুলো ছিল সেখানে পেনসনভোগী বা অবসরপ্রাপ্ত বুড়োদের আড্ডা বসত। এদের মধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল সংসার খরচ ও কোম্পানির কাগজের দরের ওঠানামা।

## সেকালের সার্কাস

এক মহাপুরুষকে অবলম্বন করে 'কলকাতার সার্কাস' প্রসঙ্গ আরম্ভ করছি। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের পনেরো তারিখ। বেলা তিনটার সময় একখানা ছ্যাকরা গাড়ি শ্যামপুকুর বিদ্যাসাগর স্কুলের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। গাড়ির মধ্যে আছেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও তাঁর কয়েকজন ভক্ত। স্কুলের প্রধানশিক্ষক ' ম' এসে গাড়িতে উঠলেন। গাড়ি চিৎপুর রোড ধরে গড়ের মাঠের দিকে চলল। ঠাকুর আজ উইলসন-এর সার্কাস দেখতে যাচ্ছেন।

গড়ের মাঠে গিয়ে টিকিট কেনা হল। আট আনা দামের শেষ শ্রেণীর টিকিট। ভক্তেরা ঠাকুরকে নিয়ে গিয়ে গ্যালারির উপরের এক সিটে বসালেন। ঠাকুর আনন্দে বললেন, 'বাঃ এখান থেকে বেশ দেখা যাচ্ছে।'

ঠাকুর নানারকম খেলা দেখতে লাগলেন। একটা খেলা ঠাকুরকে খুব আকৃষ্ট করল। সার্কাসের গোলাকার রাস্তায় একটা ঘোড়া দৌড়াচ্ছে। ঘোড়ার পিঠে এক বিবি এক পায়ে দাঁড়িয়ে। মাঝে মাঝে সামনের বড় বড় লোহার রিং বা বেড়। রিং-এর কাছে এসে ঘোড়া যখন রিং-এর নিচে দিয়ে দৌড়াচ্ছে, বিবি তখন ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে রিং-এর

ভেতর দিয়ে পুনরায় ঘোড়ার পিঠে আবার এক পায়ে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। ঘোড়া পুনঃ পুনঃ বন্ বন্ করে ওই গোলাকার পথে দৌড়াচ্ছে, এবং বিবি পুনরায় ওইরকম ভাবে রিং-এর ভেতর দিয়ে লাফিয়ে গিয়ে ঘোড়ার পিঠে এক পায়ে দাঁড়াচ্ছে।

সার্কাস দেখে ফেরবার পথে ঠকুর ম-কে বলছেন, 'দেখলে বিবি কেমন এক পায়ে ঘোড়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে, আর ঘোড়া বন্ বন্ করে দৌড়াচ্ছে। কত কঠিন, অনেকদিন ধরে অভ্যাস করেছে তবে তো হয়েছে। একটু অসাবধান হলে হাত-পা ভেঙে যাবে। আবার মৃত্যুও হতে পারে। সংসার করাও এরূপ কঠিন। অনেক সাধন-ভজন দরকার।'

তখনকার দিনে শীতকালে কোন না কোন একটা সাহেব দল এসে গড়ের মাঠে তাঁবু ফেলে সার্কাস দেখাত। ১৯১৩ সাল পর্যন্ত এ রকমই চলেছিল। তারপর ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর, সাহেব দল আর সার্কাস দেখাতে আসেনি। ১৯১৮ সালে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে আবার এল। এবার এল এক ইটালিয়ান সার্কাস। নাম 'রয়েল ইটালিয়ান সার্কাস।' ওই সার্কাসে দেখেছি এক অদ্ভুত খেলা। একেবারে গোড়ার দিকেই দেখানো হত ওই খেলাটা।

দেখি, সার্কাসের রিং-এর মধ্যে বসানো আছে একখানা টেবিল, একখানা চেয়ার, আর পাশে একটা আলনা। বসে ভাবছি, এই সরঞ্জাম দিয়ে কি খেলা দেখানো হবে। এমন সময় রিং-এর মধ্যে প্রবেশ করল এক শিম্পাঞ্জি, পুরো ইউরোপীয়ান বেশে, যেন কোন অফিসের বড় সাহেব। হাতে একটা বন্দুক। দর্শকদের মাথা নত করে অভিবাদন জানাল। তারপর বন্দুকটা রাখল টেবিলের ওপর। মাথার টুপিটা রাখল আলনার গায়ে হুকে। গায়ের কোটটা খুলে ফেলে আনলায় রাখল। গায়ে রইল শার্ট ও ওয়েস্ট কোট। ওয়েস্ট কোটের পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে টাইমটা দেখে নিল। ওর সঙ্গে সঙ্গেই রিং-এর মধ্যে প্রবেশ করল এক মেমসাহেব। মেম সাহেবের মাথায় ঠিক কপালের উপর পরিয়ে দিল একটা তারের বেড়, ঠিক টায়রার মত করে। ওই তারের বেড়-এর ওপর এক ইঞ্চি ব্যাস সাইজের খড়ি দিয়ে তৈরি দশটা চাকা লাগানো আছে। তাতে এক থেকে দশ নম্বর ইংরেজি হরফে লেখা।

রিং মাস্টার বলল, 'নম্বর ফাইভ'। শিম্পাঞ্জি বন্দুকটা নিয়ে ঠিক লক্ষ্য করে বন্দুক ছুড়ে পাঁচ নম্বর চাকতি খসিয়ে দিল। তারপর বলল 'নম্বর টু'। দু-নম্বর চাকাটা গেল। এইভাবে রিংমাস্টারের নির্দেশ অনুযায়ী দশটা চাকাই কপালের বেড়'-এর ওপর থেকে খসিয়ে দিল। দর্শকরা হাততালি দিতে লাগল। শিম্পাঞ্জিটা তারপর আবার নিজের কোটটা গায়ে দিল; এবং টুপিটা হাতে করে দর্শকদের নমস্কার করে চলে গেল। আমরা রুদ্ধশ্বাসে খেলাটা দেখছিলাম। প্রতি মুহূর্তেই আমাদের ভয় হচ্ছিল, যদি শিম্পাঞ্জিটার ভুল হয়, তাহলে মেয়েটার কপালে গিয়ে বন্দুকের গুলিটা বিদ্ধ হবে।

তবে লড়াইয়ের সময় গড়ের মাঠে তাঁবু ফেলা নিষিদ্ধ হলেও সার্কাস দেখা থেকে আমরা একেবারে বঞ্চিত হইনি। বরং আমাদের শ্যামবাজার পল্লীর লোকদের সার্কাস দেখার কিছু সুবিধাই হয়েছিল। কেননা, ওই সময় ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ের পূর্বদিকে শ্যামবাজর ব্রিজ রোড (এখন আর. জি. কর রোড) প্রসারিত করা ও ওর দক্ষিণে রাজা দীনেন্দ্র ষ্টীট ও দেশবন্ধু পার্কটা তৈরি করবার পরিকল্পনা করে।

সেজন্য বসতবাড়িগুলোকে ভূমিসাৎ করে ওই অঞ্চলটাকে মাঠ করে দিয়েছিল। সেখানেই 'ছাত্রেস্ সার্কাসি' এসে তাঁবু ফেলল। যদিও দেশী সার্কাস, তা হলেও ওই সার্কাসে মিস্ লুরেটা নামে একটি মেয়ে এক অদ্ভুত খেলা দেখাত। একটা টাঙানো তারের ওপর দিয়ে একখানা সাইকেলে করে, সে তারের একদিক থেকে অপরদিকে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করত। এবং মাঝে মাঝে তার থেকে লাফিয়ে পড়ে আবার তারের ওপর ফিরে আসত। খেলাটা খুবই আকর্ষণীয় ছিল।

এইবার ছাত্রেস্ সার্কাসের এক ঘটনার কথা বলি। ঘটনাটা আমি ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত আমার 'কালের কড়চা' বইয়ে বিবৃত করেছি। ওই বইয়ের একখানা কপি সত্যজিৎ রায়কে উপহার দিয়েছিলাম। কয়েক বছর পরে দেখি ওই ঘটনার ছায়া পড়েছে সত্যজিৎ রায়ের 'ছিন্নমস্তার মন্দির' গল্পের ওপর। সেই ঘটনাটা আমি আমার 'কালের কড়চা' বই থেকে উদ্ধৃত করছি। 'একবার সার্কাসে বাঘের খেলা দেখাবার জন্য সার্কাসের লোকরা বাঘটাকে আনতে গিয়ে দেখে যে, বাঘটা তার খাঁচার মধ্যে নেই। খাঁচার দরজা খোলা। এই খবর রাষ্ট্র হয়ে যাওয়া মাত্র দর্শকদের মধ্যে ভীষণ প্যানিক-এর সৃষ্টি হল। সবাই সার্কাসের তাঁবু ছেড়ে বাড়ির দিকে ছুটল। আশপাশের লোকেরা বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল, যদি বাঘটা ঢুকে তাদের ঘাড় মটকে দেয়। এদিকে সার্কাসের লোকেরা চতুর্দিকে বাঘ খুঁজতে বেরুল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুসন্ধান চলল। কিন্তু কোথাও বাঘটা নজরে পড়ল না। সেদিন, শ্যামবাজার পল্লীতে এক ত্রাসের সঞ্চার হল। রাত্রে নিশ্চিন্ত মনে কেউই ঘুমুতে পারল না। সকলেরই এক ভাবনা, যদি বাঘটা দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে পড়ে। পরের দিন সকালে বাঘটাকে পাওয়া গেল, সার্কাসের পাশেই এক হাঁড়ি-কলসির দোকানে, কয়েকটা বড় জালার আড়ালে। সার্কাসের লোক এসে কান ধরে বাঘটাকে নিয়ে গেল।' (কালের কড়চা, পৃষ্ঠা ২৩-২৪)।

পরের বছর ওই জায়গায় এসে তাঁবু ফেলল 'আগাসী সার্কাস'। আগাসী সার্কাসের ছিল দুই আকর্ষণ, 'ভীম ভবানী' ও নারান সুরের 'ব্ল্যাক বকস্'। ভীম ভবানীর মত শক্তির পরিচয় এদেশে খুব কম লোক দিয়েছে। ওঁর আসল নাম ভবেন্দ্রমোহন সাহা। 'ভীম ভবানী' নামটা দিয়েছিল নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু। উত্তর ভারতের লোক ওঁকে বলত 'ভীমমূর্তি'। উনি যেসব খেলা দেখাতেন তার মধ্যে ছিল দু'হাতে দু'টো চলন্ত মোটরগাড়ি ধরে অচল করে রাখা; সিমেন্টের পিপের ওপর পাঁচ-সাতজন লোককে বসিয়ে দাঁতের সাহায্যে শূন্যে ঘোরানো; বুকের উপর ৪০ মণ পাথর চাপিয়ে তার ওপর কুড়ি-পঁচিশজন দর্শককে খাম্বাজ খেয়াল গান করবার অবসর দেওয়া; বুকের ওপর দিয়ে হাতি চালানো ইত্যাদি। একবার ভরতপুরের মহারাজার অনুরোধে তিনটে চলন্ত মোটর গাড়িও উনি রুখে দিয়েছিলেন।

নারান সুরের খেলাটা ছিল, একটা কালো রঙের বাক্স। রিং-এর মধ্যে এনে দর্শকদের দিয়ে সেটা পরীক্ষা করে, তার হাতে হাতকড়া লাগানো। তারপর তার সমস্ত দেহটা দড়ি দিয়ে আষ্টে-পিষ্টে বেঁধে, তাকে দর্শকরা বাক্সের মধ্যে পুরে দিত, এবং বাক্সটায় চাবি তালা লাগিয়ে দিত। কিন্তু তালা-চাবি লাগানো মাত্রই, উনি রিং-এর অপর প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করে দর্শকদের অভিবাদন জানাতেন।

দেশী সার্কাসের জন্ম হয় উনিশ শতকের শেষে যখন প্রিয়নাথ বসু একটা সার্কাস দল গঠন করে। সার্কাসের নাম ছিল 'বোসেস্ সার্কাস'। এই সার্কাসের দলেই প্রথম এক বাঙালি মেয়ের আত্মপ্রকাশ ঘটে। নাম সুশীলাসুন্দরী। বাঘের মুখ হাঁ করিয়ে তার মধ্যে নিজের মাথাটা ঢুকিয়ে দিত। তার এই খেলায় 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা মুখর হত। একদিন 'ফরচুন' নামে এক নতুন বাঘের সঙ্গে খেলা করতে গিয়ে সে জখম হয়ে চিরকালের মত পঙ্গু হয়ে যায়। তাতেই পরে তার মৃত্যু ঘটে। প্রিয়নাথ বসুর সার্কাসের আর এক আকর্ষণ ছিল গণপতি চক্রবর্তীর 'ইলিউশন বক্স', 'ইলিউশন ট্রী' ও 'কংস কারাগার'। লোকের ধারণা ছিল তিনি 'ভৌতিক ক্ষমতা-সিদ্ধ'। মতান্তর হওয়ায় গণপতি পরে নিজেই এক সার্কাসদল গঠন করেছিল, এবং ভারতের বিভিন্ন জায়গায় খেলা দেখিয়ে সুনাম অর্জন করেছিল।

'বোসেস্ সার্কাস'-এর পরে হিঙ্গনবালা নামে আর একটি মেয়ে বাঘের খেলা দেখাত। তারপর থেকে বাঙালি মেয়েরা সার্কাস জগতে নিজেদের প্রতিভার অনেক ছাপ রেখে গেছে। আমি যে মেয়েটির খেলা শেষ দেখেছি, সে মেয়েটি আমার পাড়ার মেয়ে, নারান সুরের ভাগ্নী। ওর ট্রাপিজের খেলা ছিল এক রোমহর্ষণ ব্যাপার। মেয়েটি পরে সার্কাসের মালিককেই বিয়ে করেছিল।

সার্কাসে বাঙালি যে এ দেশেই নাম করেছিল, তা নয়। বিদেশেও। তার মধ্যে ছিল সুরেশ বিশ্বাস। বাবার সঙ্গে বিরোধ ঘটায়, বিদেশে পালিয়ে গিয়ে জার্মানিতে 'গাজেন বাক', 'জোগ কারল' প্রভৃতি সার্কাসদলে যোগ দিয়ে হিংস্র জন্তুর খেলার একজন দক্ষশিল্পী হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এক জার্মান সার্কাসের নারীঘটিত ব্যাপারে, তাঁকে জার্মানি ত্যাগ করতে হয়। আমেরিকায় গিয়ে 'উইলস'-এর সার্কাসে যোগ দেন। পরে ব্রেজিলে গিয়ে চিড়িয়াখানার রক্ষক নিযুক্ত হন। তারপর চিকিৎসাশাস্ত্রে পারঙ্গম হয়ে, শল্য চিকিৎসক হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। ব্রেজিলের নীথরয় শহরে ব্রেজিল সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহ মাত্র ৫০ জন সৈন্য নিয়ে দমন করে 'কর্ণেল' উপাধি পান, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রেজিলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

## কলকাতার থিয়েটার

কলকাতায় যত নাটক অভিনীত হয়েছে ভারতের আর কোথাও তত হয়নি। সে দিক থেকে কলকাতাকে নাটুকে শহর বলা যেতে পারে। এমন নাটক-পাগল শহর ভারতে আর দ্বিতীয় নেই। কলকাতার মত এত স্থায়ী রঙ্গমঞ্চও ভারতে বিরল। কলকাতায় স্থায়ী রঙ্গালয় স্থাপনের দিন থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় দু হাজার নাটক রচিত হয়েছে। তার মধ্যে হাজারের ওপর নাটক অভিনীতও হয়ে গিয়েছে। একেবারে সূচনায় কলকাতায় তিনটা রঙ্গমঞ্চ ছিল। আজ তাদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে কুড়ি। কলকাতার প্রতি রঙ্গমঞ্চে নাটকের অভিনয় দেখবার জন্য প্রতি রজনীতে সমবেত হয় ন্যূনপক্ষে দু হাজার নরনারী। কলকাতার এ রেকর্ড ভারতে অবিনশ্বর।

কলকাতায় স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত

কলকাতার রঙ্গমঞ্চ ও নাটক অভিনয়ের ইতিহাসকে মোটামুটি দু ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্বের ব্যাপ্তিকাল ছিল ১৮৭৩ থেকে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এটাকে গিরিশ যুগ বলা হয়। এর পরের যুগ ছিল শিশিরকুমার ভাদুড়ীর যুগ। প্রথম যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল সুরেলা অভিনয় ও নট-নটীদের একঘেয়ে বেশভূষা ও মলিন দৃশ্যপট। রূপস া করবার উপকরণও ছিল মামুলী, যথা আলতা, সিঁদুর হলুদগুঁড়ো, পিউরী, খড়ি, ভুষোর কালি। আর রঙ্গমঞ্চ আলোকিত করা হত পাদ-প্রদীপ দিয়ে। বেশভূষারও কোন কালোপযোগী বৈশিষ্ট্য ছিল না। আজ যে পোষাক পরে চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাব ঘটত, কাল সেই পোযাক পরেই জাহাঙ্গীরের ভূমিকা অভিনীত হত। তা ছাড়া এ যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল প্রতি রজনীতে তিন-চারখানা করে নাটকের অভিনয়। পাল-পার্বনে দশ-বারোখানা নাটকও অভিনীত হত। আজ সন্ধ্যায় অভিনয় শুরু হয়ে, কাল প্রভাতে সাতটা-আটটায় শেষ হত।

দ্বিতীয় যুগের উদ্বোধন করেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। সুরেলা অভিনয়ের অবসান ঘটে। তার পরিবর্তে আসে স্বাভাবিক অভিনয়। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বেশভূষা ও দৃশ্যপট কালোপযোগী করা হয়, এবং রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের ক্ষেত্রে নূতন টেকনিক অবলম্বিত হয়। পাদ-প্রদীপের পরিবর্তে আসে মঞ্চের ওপর আলোকসম্পাত। ১৯৩১-এর পর ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চের প্রবর্তন হয়। এককথায় নাট্যজগতে শিশিরকুমার এক বিপ্লব আনেন।

তবে নাট্যজগতের দীর্ঘ ইতিহাসে, কলকাতায় রঙ্গমঞ্চ পরিচালনার জন্য যাঁরা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে অর্থব্যয় করেছেন, তাঁরা কেউই টাকা পয়সার দিক দিয়ে লাভবান হন নি। অনেকেই নিঃস্ব হয়ে গেছেন। এমন কি শিশিরকুমার যিনি নাট্যশালার দ্বিতীয় পর্বের ইতিহাসে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন, তিনিও ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ঋণের চাপে বিপর্যস্ত হয়ে তাঁর ' রঙ্গম' নাট্যমঞ্চ বন্ধ করে দেন। বস্তুতঃ কয়েকজন নাট্যামোদী ধনী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতাতেই এদেশে নাট্যশালা চলেছে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা তো পায়নি, বরং পেয়েছে সরকারী বিরোধিতা। রঙ্গমঞ্চে নাটক অভিনয় নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার এক আইন প্রণয়ন করেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশ স্বাধীনতা লাভ করা সত্ত্বেও ওই আইন বলবৎ থাকে। অনেক আন্দোলনের পর ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওই আইনের বিলোপ সাধন করা হয়। তখন থেকেই নাটক অভিনয় স্বাধীনতা পেয়েছে। তার ফলে ইদানীংকালে বহু শৌখিন নাট্যসম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছে।

আধুনিককালের রঙ্গমঞ্চ বা থিয়েটার বিলাতী কালচার-এর অঙ্গ। ইংরেজরা যখন কলকাতায় বসতি স্থাপন করে, তখন তারা নাটক অভিনয়ের জন্য একটা রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করে। এটার নাম চিল 'প্লে হাউস'। পরে আর একটা থিয়েটার স্থাপিত হয়, নাম 'দ্য ক্যালকাটা থিয়েটার'। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে লেবেডফ নামে এক রুশ-দেশীয় ভদ্রলোক কলকাতার ডোমতলায় এক অস্থায়ী মঞ্চ স্থাপন করে, কলকাতায় প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয়ের আয়োজন করেন। দুদিন অভিনয়ের পর তিনি দেশে ফিরে যান।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরেজরা কলকাতায় 'এথেনিয়াম থিয়েটার', বৈঠকখানা থিয়েটার' 'চৌরঙ্গী থিয়েটার', 'সানস্ সুচি থিয়েটার' প্রভৃতি নামে আরও কতকগুলি থিয়েটার স্থাপন করে।

ইংরেজদের দেখাদেখি বাঙালীরাও নাটক অভিনয় করবার জন্য মেতে ওঠে। বড়

লোকের বাগানবাড়ি, বসতবাড়ি ও স্কুলবাড়িতে অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ বেঁধে বিলাতী কায়দায় নাটক অভিনয় শুরু হয়। এইসব অভিনয়ের মধ্যে কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রীটে (বর্তমান শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর পিছনে) নবীনচন্দ্র বসুর বসতবাড়িতে অনুষ্ঠিত 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয় উল্লেখযোগ্য, কেননা, এখানে স্ত্রীলোকের ভূমিকায় মেয়েরাই (রূপজীবিকারা) অভিনয় করেছিল। বিদ্যার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল ষোড়শবর্ষীয়া রাধামণি, রানী ও মালিনীর ভূমিকায় প্রৌঢ়া জয়দুর্গা ও বিদ্যার সহচরীর ভূমিকায় রাজকুমারী বা রাজু।

এরপর বেশ কিছুদিন স্কুল-কলেজের ছাত্রদের নাট্যাভিনয় ছাড়া, কলকাতায় আর কোন অভিনয়ের উদ্যোগ দেখা যায়নি। ১৮৫৪ থেকে ১৮৬৮ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে কলকাতায় আবার বড়লোকদের বাড়িতে রঙ্গমঞ্চ বেঁধে নাটক অভিনয় করবার একটা হুজুগ লেগে যায়। এই সূত্রে কয়েকটা নাট্যসমাজও স্থাপিত হয়েছিল, যথা 'শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি', 'বহুবাজার নাট্যসমাজ', 'বাগবাজার নাট্যসমাজ', 'আরপুলি নাট্যসমাজ' প্রভৃতি। তবে এদের মধ্যে 'বাগবাজার নাট্যসমাজ' ছিল সবচেয়ে বেশি উদ্যোগী, এবং পরে এদের চেষ্টাতেই কলকাতায় স্থায়ী রঙ্গালয় স্থাপিত হয়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, ধর্মদাস সুর, রাধামাধব কর, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী প্রমুখ। (কলকাতায় নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণের জন্য অতুল সুরের 'কলকাতার চালচিত্র' গ্রন্থ দ্রঃ)।

কলকাতার থিয়েটারের ইতিহাসে ১৮৭৩ সালটা সবচেয়ে স্মরণীয়। কেননা ওই বছরের গোড়ার দিকেই কলকাতায় এক সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত হয়। সাতুবাবুর দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ সাতুবাবুদের বাড়ির সংলগ্ন মাঠে এক খোলার ঘরে 'বেঙ্গল থিয়েটার' নামে এক থিয়েটার স্থাপন করেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওরই কাছে ৬নং বিডন স্ট্রীটে এক কাষ্ঠনির্মিত সুরম্যগৃহে বাগবাজারের বিখ্যাত ধনী ভুবন নিয়োগী কলকাতার প্রথম রঙ্গালয় 'দ্য গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' স্থাপন করেন। তিনিই বাগবাজার নাট্যসমাজকে রিহারসেলের জন্য তাঁর বৈঠকখানার প্রকাণ্ড হলঘরটা ছেড়ে দিয়েছিলেন। অমৃতলাল বসু তাঁর 'স্মৃতিকথা'য় লিখেছেন—'বড় মানুষ ভুবন নিয়োগী একটু আশ্রয় দিয়েছিল তাই গিরিশের মত অসাধারণ নাট্যকার কেরাণীগিরিতে জীবন পর্যবসিত করে নাই। স্কুল মাস্টারের কেদারাই অর্ধেন্দু মুস্তাফী ও ধর্মদাস সুরের মত কলাবিদদের প্রতিভার রঙ্গমঞ্চ হয় নাই, তাই নগেন্দ্র, মহেন্দ্র, কিরণ, মতি, বেলবাবু প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের নাম বঙ্গ নাট্যশালার ইতিহাসে অমর অক্ষরে লিখিত হয়েছে।'

(পরে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার অবস্থিত হয়েছিল, ওখানেই একটা খালি জমি বহুদিন ধরে পড়েছিল।) কেউ কেউ বলে ওখানে মহারাজ নন্দকুমারের বংশধর রাজা গুরুদাসের বাড়ি ছিল। ওই জমিটাই ভুবনমোহন নিয়োগী মহেন্দ্রনাথ দাসের কাছ থেকে লীজ নিয়ে এক কাঠের বাড়ি তৈরি করান ও তার নাম দেন 'দ্য গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে 'দ্য গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে' প্রথম অভিনয় হয়। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে গোড়ার দিকে স্ত্রীলোকের ভূমিকা পুরুষরাই করত কিন্তু ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে গ্রেট ন্যাশনাল

মেয়েদের ভূমিকায় মেয়ে অভিনয় করতে শুরু করে। প্রথম যে কজন মেয়ে গ্রেট ন্যাশনালে থিয়েটারে অভিনেত্রীরূপে যোগদান করে তাদের মধ্যে ছিল ক্ষেত্রমণি, কাদম্বিনী, যাঁদুমনি, হরিদাসী, রাজকুমারী, বিনোদিনী ও নারায়ণী। এদের সকলকেই সংগ্রহ করা হয়েছিল শহরের রূপজীবী মহল থেকে। আর পুরুষ অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, অমৃতলাল বসু, ধর্মদাস সুর, মতিলাল সুর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলবাবু, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ বসু, অবিনাশচন্দ্র কর, রাধামাধব কর, ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর (আর.জি.কর মেডিকেল কলেজ-এর প্রতিষ্ঠাতা) প্রমুখ। যেসব নাটক গ্রেট ন্যাশনালে মঞ্চস্থ হয়েছিল তার মধ্যে চিল নীলদর্পণ, বিধবা বিবাহ, প্রণয় পরীক্ষা, কৃষ্ণকুমারী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, কমলে কামিনী, সধবার একাদশী, হেমলতা, কুসুমকুমারী, সতী কি কলঙ্কিনী, পুরুষবিক্রম, রুদ্রপাল, আনন্দকানন, শত্রুসংহার। শরৎসরোজিনী, নবীন তপস্বিনী, জামাইবারিক, নয়শো রূপেয়া, তিলোত্তমা সম্ভব, বিষবৃক্ষ, পদ্মিনী, অপূর্ব সতী, ডাক্তারবাবু, কণকপদ্ম, বৃত্রসংহার, হীরকচূর্ণ, বিদ্যাসুন্দর, কর্ণাটকুমার, ভীমসিংহ, সুরেন্দ্র-বিনোদিনী ও গজদানন্দ। শেষের দুখানা নাটকের অভিনয় নিয়ে গ্রেট ন্যাশনাল সরকারী রোষের সামিল হয়। রঙ্গমঞ্চে নাটক অভিনয় নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার আইন প্রবর্তন করেন (১৮৭৬)। এখানেই থিয়েটারের স্বাধীনতা পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

সুরেন্দ্র-বিনোদিনী ও গজদানন্দ নাটকের অভিনয়ের পদাঙ্কে যে মাত্র সরকারি নিয়ন্ত্রণ এল তা নয়। ভুবন নিয়োগী নানারকম মামলা-মকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ল। এতে ভুবন নিয়োগীর অজস্র অর্থব্যয় হল। তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন। তা সত্ত্বেও তিনি কয়েক মাস নাটক মঞ্চস্থ করেন। মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স বাকী পড়ায়, মিউনিসিপ্যালিটি থিয়েটারটা নীলাম করে দেয়। প্রতাপ জহুরী নামে এক মাড়োয়ারী নীলাম থেকে থিয়েটারটা কিনে নেয়। স্থাপনের দিন থেকে নীলামের দিন পর্যন্ত গ্রেট ন্যাশনালে ৯৯ রজনী অভিনয় হয়েছিল।

তারপর প্রতাপ জহুরীর পরিচালনায় থিয়েটারটা চলতে থাকে। কিন্তু প্রতাপ জহুরী দু-চার বছরের বেশী থিয়েটারটা চালাতে পারে না। প্রতাপ জহুরী আর থিয়েটার ব্যবসা করবে না জেনে, ভুবন নিয়োগী থিয়েটারটা তার স্ত্রী ভুবনমোহিনী দেবীর নামে লীজ নেয়। কিন্তু ভুবন নিয়োগী নিজেকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করে স্ত্রীর নামে বেনামীতে লীজ নিয়েছে, এই অভিযোগে প্রতাপ জহুরী ভুবন নিয়োগীর নামে মামলা করে। বিচারে প্রতাপ জহুরী জয়লাভ করে। তখন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার আবার নীলামে বিক্রি হয়ে যায়। স্টার থিয়েটার সম্প্রদায় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারটা কিনে নিয়ে বাড়িটাকে ভেঙে ফেলে।

স্টার থিয়েটারের জন্মের কথাটা এখানে বলা যাক। তার অভিনয় চাতুর্যের জন্য নটী বিনোদিনী সে যুগে নাট্যসম্রাজ্ঞী অভিধা পেয়েছিল। থিয়েটারের মালিকদের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার না পাওয়ার জন্য তার মনে সাধ ছিল সে নিজে একটা থিয়েটার করবে। গুরুমুখ নামে এক ধনী সুপুরষ সে সময় বিনোদিনীর সংস্পর্শে আসে। তার সহায়তায় ৬৮নং বিডন স্ট্রীটের জমিটা শ্যামবাজারের প্রখ্যাত ধনী কীর্তি মিত্রের কাছ থেকে লীজ

নেওয়া হয়। থিয়েটার নির্মাণের কাজ চলতে থাকে। এদিকে গিরিশচন্দ্র নাটক লিখে রিহারসেল দিতে থাকেন। প্রথমে ঠিক হয় যে থিয়েটারটার নাম হবে 'বি-থিয়েটার'। কিন্তু চক্রান্তের ফলে থিয়েটারটার নামকরণ করা হয় 'স্টার থিয়েটার'। তা সত্ত্বেও নিজের মনের অন্তর্বেদনা চাপা দিয়ে বিনোদিনী সেখানে অভিনয় করে যেতে থাকে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জুলাই তারিখে স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় 'দক্ষযজ্ঞ',যা ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ আগস্ট তারিখে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দেখতে আসেন। বঙ্গীয় নাট্যসমাজ এতে ধন্য হয়। ওই সালের ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি আবার ওখানে 'চৈতন্যলীলা' নাটকের অভিনয় দেখেন। ঠাকুর ওখানে আরও দুখানা নাটকের অভিনয় দেখেছিলেন— ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর তারিখে 'প্রহ্লাদচরিত্র' ও ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'বৃষকেতু'। কথিত আছে যে 'চৈতন্যলীলা' নাটক অভিনয়ের সময় বিনোদিনী হবিষ্যান্ন করত। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে চিন্তামনির ভূমিকায় অভিনয়ের পর মাত্র ২৫ বছর বয়সে বিনোদিনী মঞ্চজীবন ত্যাগ করে সংসার জীবনে প্রবেশ করে।

এর কয়েক বছর আগে নাট্যজগতে আর এক স্মরণীয় ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মবান্ধব কেশবচন্দ্র সেন চিরঞ্জীব শর্মা ছদ্মনামে 'নব বৃন্দাবন' নামে এক নাটক রচনা করে স্বয়ং উক্ত নাটকে পাহাড়ীবাবা ও বাজীকরের ভূমিকায় অভিনয় করেন। আরও উল্লেখনীয় উক্ত নাটকে নরেন্দ্রনাথ (পরে স্বামী বিবেকানন্দ) দণ্ডী শিষ্যের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

এরপর স্টার থিয়েটার বিডন স্ট্রীট থেকে উঠে এসে হাতিবাগানে এক নতুন রঙ্গশালা নির্মাণ করে। বিডন স্ট্রীটে স্টার থিয়েটারের শেষ অভিনয় ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ জুলাই তারিখে 'বুদ্ধদেব চরিত' ও 'বেল্লিক বাজার' এবং হাতিবাগানের নূতন বাড়িতে প্রথম অভিনয় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ মে তারিখে 'নসীরাম' নাটক।

এদিকে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় বিডন স্ট্রীটে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের জমিতে মিনার্ভা থিয়েটার স্থাপন করেন। ওখানে গিরিশচন্দ্রের অনূদিত সেকস্পীয়ারের 'ম্যাকবেথ' নাটক প্রথম মঞ্চস্থ হয়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জুলাই 'প্রফুল্ল' নাটক স্টার ও মিনার্ভা উভয় রঙ্গমঞ্চেই অভিনীত হয়। মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্র যোগেশের ভূমিকায় অভিনয় করেন, আর স্টারে ওই ভূমিকায় অমৃতলাল মিত্র অভিনয় করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মিনার্ভা থিয়েটারে তিনকড়ি লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকায় অভিনয় করে বিখ্যাত হন। (এখানে উল্লেখনীয় যে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে মিনার্ভা থিয়েটার আগুনে ভস্মীভূত হবার পর ওখানে নূতন মঞ্চগৃহ নির্মিত হয়)।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ও অ্যাটর্নী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভ্রাতা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত বিডন স্ট্রীটে স্টার থিয়েটারের পুরানো বাড়িতে ক্লাসিক থিয়েটার স্থাপন করে নাট্যজগতের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করেন। তিনিই থিয়েটারে মঞ্চ ব্যবস্থাপনা, ঠ্যালা সীন প্রভৃতি প্রবর্তন করে নাট্যশালার দৃশ্যপট ও সাজস   ায় নূতনত্ব আনেন। নাট্যাভিনয় প্রচারের জন্য তিনি নানাবর্ণে মুদ্রিত প্ল্যাকার্ড ও হ্যাণ্ডবিল প্রভৃতিরও প্রবর্তন করেন। এছাড়া দর্শকদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য তিনি নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর ভাষায় 'তিনি ছিলেন রঙ্গজগতের নেপোলিয়ান'। বস্তুত

অমরেন্দ্রনাথের সময়কালটাই ছিল শিশির-পূর্ব যুগের রঙ্গালয়ের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। নাটক অভিনয় দর্শন এ সময় বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। সাধারণ রঙ্গালয়ের সংখ্যাও এ সময় বেড়ে যায়।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ এপ্রিল তারিখে ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনয় শুরু হয় গিরিশচন্দ্রের 'নলদময়ন্তী' ও বেল্লিকবাজার' নিয়ে। (অনেকের মতে প্রথম নাটক ছিল 'হারানিধি')। অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্লাসিক থিয়েটারে যাঁরা যোগদান করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী, নয়নতারা, সরোজিনী, মহেন্দ্রলাল বসু, অঘোরনাথ পাঠক, গোবর্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ দাস, ধর্মদাস সুর, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, হরিভূষণ ভট্টাচার্য, চুনীলাল দেব ও নৃপেন্দ্র চন্দ্র বসু বা ন্যাপা বোস। ক্লাসিক থিয়েটার অসামান্য সাফল্য অর্জন করে জেনারেল এসেমব্রীজ ইনস্টিটিউশনের রসায়নের অধ্যাপক ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলিবাবা' নাটক মঞ্চস্থ করে ( ১৮৯৭)। এই নাটকে আবদাল্লার ভূমিকায় ন্যাপা বোসের ও মর্জিনার ভূমিকায় কুসুমকুমারীর অভিনয় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়। ন্যাপা বোসের পরিকল্পিত নাচের গুণে নাটকটি অল্পদিনের মধ্যে এমনই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে এই নাটকটির অভিনয় থেকে ক্লাসিক থিয়েটারের লক্ষাধিক টাকা আয় হয়েছিল। ন্যাপা বোসের সঙ্গে আমাদের পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, এবং সেই সূত্রে আমি আমার ছেলেবেলায় শতাধিকবার 'আলিবাবা'র অভিনয় দেখেছি। আবদাল্লার ভূমিকা ছাড়া, আরও যে সব ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ন্যাপা বোস যশস্বী হয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল 'ফকড়ে', 'দেলদার' ও 'নিমচাঁদ'।

অমরেন্দ্রনাথের অভিনয়ও আমি বহুবার দেখেছি। 'আলিবাবা'য় তিনি হুসেনের পার্ট করতেন। আরও যে সব ভূমিকায় তাঁকে অভিনয় করতে দেখেছি তা হচ্ছে 'পলাশীর যুদ্ধ'-এ সিরাজ, 'পাণ্ডব গৌরব'-এ ভীম, 'হারানিধি'-তে অঘোর, 'প্রফুল্ল'-তে ভজহরি, 'ভ্রমর'-এ গোবিন্দলাল ( এই নাটকের অভিনয়কালে তিনি অশ্বপৃষ্ঠে মঞ্চে আবির্ভূত হতেন এবং রোহিনীকে জল থেকে তুলে ভিজে কাপড়ে মঞ্চে উঠে আসতেন) ও 'রঘুবীর', 'হরিবাজ', 'সীতারাম' প্রভৃতি নাটকে নাম ভূমিকায়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর তারিখে স্টার থিয়েটারে 'সাজাহান' নাটকে ঔরঙ্গজেবের ভূমিকায় অভিনয় করাকালীন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এটাই তাঁর শেষ অভিনয়। এখানে উল্লেখনীয় যে, যে বৎসর অমরেন্দ্রনাথ অভিনয়কালে অসুস্থ হয়ে পড়েন, ঠিক তার আগের বছরে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুলাই তারিখে গিরিশচন্দ্রও 'বলিদান' নাটকে করুণাময়ের ভূমিকায় অভিনয়কালে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেটাই তাঁর শেষ মঞ্চাবতরণ। অমরেন্দ্রনাথই ছিলেন স্টার থিয়েটারে প্রাণপুরুষ এবং তাঁর মৃত্যুর পর স্টার থিয়েটারের অবনতি ঘটে।

গিরিশচন্দ্রের অভিনয় নৈপুণ্যের ঐতিহ্য বজায় রেখেছিলেন তাঁর পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ বা দানীবাবু। দানীবাবুর অভিনয়জীবন পেশা হিসাবে গ্রহণ করা সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের ঘোর আপত্তি ছিল। এক তরুণী বিধবাকে বিবাহ করে অর্থাভাবের মধ্যে পড়লে, তাঁর পিসিমার অনুরোধে বিখ্যাত অভিনেতা অমৃতলাল মিত্র তাঁকে স্টার থিয়েটারে নিয়ে আসেন ও পিতার অজ্ঞাতসারে অভিনয় শিক্ষা দিতে থাকেন। কলকাতার বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে

বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে দানীবাবু খ্যাতির তুঙ্গে ওঠেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ইচ্ছানুক্রমে বন্যার্তদের সাহায্যকল্পে কলকাতার 'দুর্গেশনন্দিনী'র যে অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার অভিনয়ে দানীবাবু ওসমানের ভূমিকায় ও তারাসুন্দরী আয়েষার ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় চাতুর্য দেখিয়েছিলেন। শিশির যুগেও তাঁর অভিনয়নৈপুণ্য অম্লান ছিল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২ অক্টোবর নাট্যমন্দিরে গিরিশ স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'প্রফুল্ল' নাটকের অভিনয়ে দানীবাবু 'যোগেশ'-এর ভূমিকায় ও শিশিরকুমার 'রমেশ'-এর ভূমিকায় একসঙ্গে অভিনয় করে কলকাতার নাট্য জগতের ইতিহাসে এক নজীরহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙলার বাইরে থেকে মনোমোহন পাঁড়ে নামে এক ভদ্রলোক কলকাতায় এসে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মিনার্ভা থিয়েটারের পরিচালনা করেন। এই সময় কোহিনূর থিয়েটার নামে আর একটা থিয়েটার স্থাপিত হয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মনোমোহন পাঁড়ে কোহিনুর থিয়েটার কিনে নেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তার নাম দেন 'মনোমোহন থিয়েটার'। দানীবাবুর অধিনায়কত্বে মনোমোহন থিয়েটার বেশ ভাল চলে। আর যে সব থিয়েটার এ সময় চলেছিল তার মধ্যে ছিল ন্যাশনাল, গ্রাণ্ড ন্যাশনাল, অ্যালফ্রেড, বেঙ্গল, বীণা (পরে সিটি থিয়েটার), অরোরা, ইউনিক, গ্রাণ্ড, ক্লাসিক, স্টার, মিনার্ভা ইত্যাদি।

আজ যেখানে '   ' সিনেমা অবস্থিত ওখানে ছিল একটা নোংরা মাঠ। লোকে ওখানে মলমূত্র ত্যাগ করত। আগাসী সার্কাস ওই মাঠটা পরিষ্কার করে ওখানে সার্কাস দেখাতে শুরু করে। গ্রীষ্মকালে আগাসী সার্কাস চলে যাবার পর, ম্যাডান কোম্পানী ওখানে তাঁবু ফেলে চলচ্চিত্র (এলফিনস্টন বায়োস্কোপ) দেখাতে আরম্ভ করে। তাঁবুটা একদিন পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। তখন ম্যাডান কোম্পানী ওখানে কর্ণওয়ালিস থিয়েটার নির্মাণ করে। প্রথমে ওখানে চলচ্চিত্রই দেখানো হত। কিন্তু পরে ম্যাডান কোম্পানী চলচ্চিত্র দেখাবার জন্য ওর দক্ষিণের জমিতে 'উত্তরা' সিনেমা স্থাপন করে, কর্ণওয়ালিস থিয়েটারকে এক সাধারণ রঙ্গালয়ে পরিণত করে। 'বেঙ্গল থিয়েটার' নাম দিয়ে ম্যাডান কোম্পানী শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে তাঁদের থিয়েটারের পরিচালক ও অভিনেতা নিযুক্ত করে। শিশিরকুমার বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে স্কটিশ চার্চেস কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করবার পর থেকেই তিনি ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটুট মঞ্চে শৌখিন অভিনেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ওখানে রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটকে কেদারের ভূমিকায় অভিনয় করলে, রবীন্দ্রনাথ তা দেখে বলেছিলেন, 'কেদার আমার ঈর্ষার পাত্র। একদা ওই পার্টে আমার যশ ছিল।'

কর্ণওয়ালিস থিয়েটারেই ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর তারিখে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর' নাটকে শিশিরকুমারের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে।

মতভেদ হওয়ায় শিশিরকুমার ম্যাডান কোম্পানী ত্যাগ করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইডেন গার্ডেন একজিবিশনে শিশিরকুমার কয়েকজন প্রতিভাধর নট-নটীদের নিয়ে এক নাট্যগোষ্ঠী গড়ে তুলে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটক মঞ্চস্থ করেন। রামচন্দ্রের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় এই সময় শহরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। 'সীতা' জনপ্রিয় হওয়ায়, তিনি

অ্যালফ্রেড থিয়েটার (পরে গ্রেস থিয়েটার) ভাড়া নিয়ে 'বসন্তলীলা' অভিনয় করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে শিশিরকুমার মনোমোহন থিয়েটার ভাড়া নিয়ে 'নাট্যমন্দির' নাম দিয়ে ওখানে যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা' নাটক অভিনয় করেন। (নাট্যমন্দিরের মোট মূলধন ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা, এবং ডিরেক্টর ছিলেন তুলসীচরণ গোস্বামী, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ও শিশিরকুমার ভাদুড়ী)। 'সীতা' নাটকের প্রথম অভিনয় হয় ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ আগস্ট তারিখে। ওইদিন রসরাজ অমৃতলাল বসু রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, 'শিশির কুমারই থিয়েটারে নবযুগের প্রবর্তক'। 'সীতা'র অভিনয় দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'শিশির ভাদুড়ীর প্রয়োগনৈপুণ্যে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে'। 'সীতা' নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থাপনায় শিশিরকুমার যাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন হেমেন্দ্র কুমার রায়, মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নৃপেন্দ্র চন্দ্র বসু ( ন্যাপা বোস), অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, চারুচন্দ্র রায়, প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রযোজনার বৈশিষ্ট্য ছিল কনসার্টের বদলে রসনচৌকি, প্রবেশপথে আলপনা ও পূর্ণকলস, প্রেক্ষাগৃহে চন্দন-অগুরু-ধূপের গন্ধ, পাদপ্রদীপের পরিবর্তে আলোকসম্পাত ও সীনের পরিবর্তে বক্স সেট। আরও উল্লেখযোগ্য এই অভিনয়ে জনতার দৃশ্যে একশ জন অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অংশগ্রহণ করা। এই অভিনয়ে রামের ভূমিকায় শিশিরকুমারের ও সীতার ভূমিকায় প্রভার অভিনয় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে শিশিরকুমার তাঁর নাট্যমন্দির কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে স্থানান্তরিত করেন। এখানে অভিনয় শুরু হয় ওই বছরের ২৬ জুন তারিখে। প্রথম অভিনীত নাটক 'সীতা'। পরবর্তী নাটক 'বিসর্জন'। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে শিশিরকুমার আর্ট থিয়েটার (১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবোধচন্দ্র গুহ কর্তৃক স্টার থিয়েটারে গঠিত) ভাড়া নিয়ে নব নাট্যমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে তিনি এখানে মঞ্চস্থ করেন 'বিরাজ বৌ', 'বিজয়া', 'সরমা', 'দশের দাবী', 'রীতিমত নাটক', 'শ্যামা' ও 'যোগাযোগ'। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে শিশিরকুমার ' রঙ্গম' (নাট্যনিকেতনের নতুন নাম) প্রতিষ্ঠা করে, ওখানে 'মাইকেল' নাটকের নাম ভূমিকায় অবিস্মরণীয় অভিনয় করেন। শিশিরকুমারের ন্যায় প্রতিভাশালী অভিনেতা এদেশে আর জন্মায় নি। ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দিতে চাইলে তিনি সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে প্রার্থনা করেছিলেন এক জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সহায়তা।

ইতিমধ্যে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে, অ্যালফ্রেড মঞ্চে 'মিত্র থিয়েটার', ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ কলকাতায় 'পূর্ণ থিয়েটার' (উমাশশী সর্বপ্রথম এখানে আত্মপ্রকাশ করে), ১৯৩১ খ্রীষ্টব্দে 'রঙমহল' (অভিনেতা রবি রায় ও গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত), ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মতলা স্ট্রীটে 'চীপ থিয়েটার', নতুনবাজারে 'রঙমহল', ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে 'নাট্যভারতী' ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে মানিকতলার খালধারে 'কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে 'বিশ্বরূপা' ( রঙ্গমের নামান্তর) ও ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'রঙ্গনা' প্রভৃতি থিয়েটারের আবির্ভাব ঘটে। সম্প্রতি বামফ্রন্ট সরকার 'শিশির মঞ্চ' এবং 'গিরিশ মঞ্চ' স্থাপন করেছেন।

এবার আমি থিয়েটারের নবযুগে (তার মানে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের পর) রঙ্গমঞ্চে যে সকল বিশিষ্ট নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে তার উল্লেখ করছি।

মিনার্ভা থিয়েটারের মঞ্চে উপেন্দ্রকুমার মিত্রের পবিচালনায় 'আত্মদর্শন', 'গয়াতীর্থ' ও 'ধর্মদ্বন্দ্ব'; দেলওয়ার হোসেন ও চণ্ডী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'চিরন্তনী', 'কাঁটা কমল', 'সুপ্রিয়ার কীর্তি', 'ডাক্তার', 'মাটির মায়া', 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'দেবদাস', 'রাষ্ট্রবিপ্লব', 'দুই পুরুষ', 'ধাত্রী পান্না', 'চন্দ্রনাথ', 'তুষারকণা', 'রাজা কৃষ্ণচন্দ্র', 'সুবর্ণ গোলক', 'কেরানীর জীবন', 'কর্ণ-কুন্তী কৃষ্ণা', 'কৃষ্ণ কুণ্ডুর পরিচালনায় 'জাহাঙ্গীর', 'এরাও মানুষ', ' কৃষ্ণ সারথি'; রাসবিহারী সরকারের পরিচলনায় 'জীবনটাই নাটক', 'ঝিন্দের বন্দী' ও উৎপল দত্তের 'লিটল থিয়েটার'-এর পরিচালনায় 'নীচের মহল', 'অঙ্গার', 'ফেরারী ফৌজ', 'তিতাস একটি নদীর নাম', ' 'চৈতালী', 'রাতের স্বপ্ন', ওথেলো', জুলিয়াস সীজার', 'কল্লোল', 'ভি-আই-পি', 'অজেয় ভিয়েতনাম', 'যুদ্ধং দেহি', 'তীর', 'মানুষের অধিকার', লেনিনের ডাক' ইত্যাদি।

স্টার থিয়েটার মঞ্চে আর্ট থিয়েটারের পরিচালনায় 'একাঙ্কিকা', 'কর্ণার্জুন', 'চিরকুমার সভা'; শিশিরকুমারের নব নাট্য মন্দিরের পরিচালনায় 'বিরাজ বৌ', 'বিজয়া', 'সরমা', 'দশের দাবী', 'রীতিমত নাটক', 'শ্যামা, 'যোগাযোগ', 'পোষ্যপুত্র'; বিমল পালের পরিচালনায় 'বিদ্যাপতি', 'অভিসারিকা', 'কালের দাবী'; সলিলকুমার মিত্রের পরিচালনায় 'চক্রধারী', 'রাণী ভবানী', 'রাণী দুর্গাবতী', 'মহারাজ নন্দকুমার', 'দুর্গেশনন্দিনী', 'টিপু সুলতান', 'কঙ্কাবতীর ঘাট', 'শতবর্ষ আগে', স্বর্গ হতে বড়', 'রাজসিংহ', 'কালিন্দী', 'নৌকাডুবি', 'বালাজী রাও', রাজপুত জীবনসন্ধ্যা', 'সূর্যমহল', 'কলঙ্কবতী', 'পদ্মিনী', 'রাজনর্তকী', (এই সময় স্টার থিয়েটার ভবন নবীকৃত করা হয়) 'শ্যামলী', 'পরিণীতা', ' কান্ত', 'ডাকবাংলো', ' রামকৃষ্ণ', 'শ্রেয়সী', 'শেষাগ্নি', 'স্বর্ণকীট', 'তাপসী', 'একক দশক শতক', 'দাবী', 'শর্মিলা', 'সীতা', 'শাপমোচন', 'বালুচরী' ইত্যাদি।

রঙমহলে (১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে অভিদেতা রবি রায় ও গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত) বিষ্ণুপ্রিয়া; শিশির মল্লিক, যামিনী মিত্র ও সতু সেনের পরিচালনায় 'মহানিশা', 'অশোক', 'পতিব্রতা', 'কাজরী', 'বাংলার মেয়ে'; অমর ঘোষের পরিচালনায় 'চরিত্রহীন'; যামিনী মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র দে ও রঘুনাথ মল্লিকের পরিচালনায় 'ডিকেটটিভ', 'স্বামী স্ত্রী', 'মেঘমুক্তি', 'তটিনীর বিচার', যামিনী মিত্র ও অমর ঘোষের পরিচালনায় 'মাকড়সার জাল', 'মাটির ঘর', 'বিশ বছর আগে', 'রত্নদীপ'; যামিনী মিত্র ও দুর্গা...স বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'রক্তের ডাক', 'তুমি ও আমি', 'মায়ের দাবী'; অভিনেতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'মাইকেল', 'ভোলা মাস্টার', 'সানি ভিলা'; 'রামের সুমতি', 'অধিকার', 'বিংশ শতাব্দী', 'সন্তান', 'রাজপথ', 'সেই তিমিরে', 'অনুপমার প্রেম', 'বাংলার প্রতাপ', 'ক্ষুদিরাম', 'রিজিয়া', 'মেবার মতন', 'বঙ্গে বর্গী'; সীতানাথ মুখোপাধ্যায় ও অমিয় বসুর পরিচালনায় 'এই স্বাধীনতা', 'খবর বলছি', 'নিষ্কৃতি', 'চাঁদ বিবি', 'জীজাবাই', 'জীবন সংগ্রাম', 'দূরভাষিণী', 'উল্কা', 'শেষ লগ্ন', 'শতবর্ষ আগে', 'কবি', 'কালপুরুষ', 'মায়ামৃগ', 'একমুঠো আকাশ', 'এক পেয়ালা কফি', 'অনর্থ', 'চক্র', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'; ও শিল্পগোষ্ঠীর ব্যবস্থাপনায় 'কথা কও', 'স্বীকৃতি', 'নাম বিভ্রাট' 'টাকার রঙ কালো', 'প্রতিমা', 'অতএব', 'ছায়া নায়িকা', 'নহবত', 'সেমসাইড', 'আমি মন্ত্রী হব', 'বাবা বদল' ও 'উত্তরণ'।

রঙ্গমে শিশিরকুমারের পরিচালনায় 'মাইকেল', 'বিপ্রদাস', 'বিন্দুর ছেলে', 'দুঃখীর ইমান', 'পরিচয়', 'তকত-ইতাউস', 'প্রশ্ন'; (সরকার ব্রাদার্স কর্তৃক গ্রহণের পর নামকরণ করা হয় 'বিশ্বরূপা'), 'আরোগ্য নিকেতন', 'ক্ষুধা', 'ডাউন ট্রেন', 'মায়া ময়ূর', 'সেতু', 'জব জার্নকের বিবি', 'রঙ্গিনী', 'চৌরঙ্গী', 'এক পেয়ালা কফি', 'আগন্তুক', 'ঘর', 'বেগম মেরী বিশ্বাস', 'স্বরলিপি' ইত্যাদি।

এ যুগের নাটকের মধ্যে যেগুলো অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে, তার মধ্যে উল্লেখনীয় 'শ্যামলী' (৪৮৪ বার), 'পরিণীতা' (১৩৫বার), ' কান্ত' (৩৩২ বার), 'সেতু' (একটানা অভিনয়ে রেকর্ড), 'এন্টনী কবিয়াল' (আড়াই বছর), 'তাপসী' (৪৬৭ বার), 'একক দশক শতক' (২১৪ বার), 'দাবী (৫৮০ বার), 'শর্মিলা' (৫৫১ বার), সীমা' (২০৩ বার)। উৎপল দত্তের লিটল থিয়েটারে 'অঙ্গার' দু বছরের ওপর অভিনীত হয়।

এ যুগের প্রখ্যাত নাট্যকারদের মধ্যে ছিলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, শচীন সেনগুপ্ত, যোগেশ চৌধুরী, বিধায়ক ভট্টাচার্য, ধনঞ্জয় বৈরাগী, দেবনারায়ণ গুপ্ত, মহেন্দ্র গুপ্ত ও প্রবোধবন্ধু অধিকারী।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী ছাড়া এ যুগের প্রথিতদশা অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন নরেশ মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরী, দানীবাবু, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, যোগেশ চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তুলসী চক্রবর্তী, রবি রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তমকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, ছবি বিশ্বাস, ভূপেন রায়, রঞ্জিৎ রায়, মহেন্দ্র গুপ্ত, উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র, রবি ঘোষ, বসন্ত চৌধুরী, তারাকুমার ভাদুড়ী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী ও আরও অনেকে।

আর এ-যুগের প্রখ্যাতা অভিনেত্রীদের মধ্যে ছিলেন প্রভাদেবী, কঙ্কাবতী, তারাসুন্দরী, আশ্চর্যময়ী, সরযূদেবী, ইন্দুবালা, নীহারবালা, নিভাননী, রাজলক্ষ্মী, শেফালিকা, মলিনাদেবী, অপর্ণাদেবী, শান্তি গুপ্তা, শিপ্রা মিত্র, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুতপা চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, মাধবী চক্রবর্তী, কাননবালা, নীরদাসুন্দরী, নরীসুন্দরী, তৃপ্তি মিত্র ও আরও অনেকে।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত হয়। তখন থেকে আজ পর্যন্ত, এই ১১৫ বৎসর সময়কালের মধ্যে রঙ্গালয়ের ইতিহাস নানা বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। মালিকানা স্বত্ব ও পরিচালনার কর্তৃত্ব নিয়ত পরিবর্তিত হয়েছে। রঙ্গমঞ্চের আলো একবার জ্বলেছে, আবার একবার নিভেছে। যাঁরা থিয়েটার চালিয়েছেন তাঁরা কেউই ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। মাত্র সলিল মিত্রের কর্তৃত্বে স্টার থিয়েটার (আর্ট থিয়েটার) ৩৩ বছর ও উপেন্দ্রকুমার মিত্রের অধীনে মিনার্ভা থিয়েটার ২২ বছর কোনরকমে একটানা তাদের জীবন অতিবাহিত করেছে। তা না হলে বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চের মালিকানা স্বত্ব অনবরত বদলেছে। কিন্তু তারই অন্তরালে ঘটেছে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। থিয়েটারে নাটক অভিনয় দেখবার জন্য দর্শকবৃন্দের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ। থিয়েটারে নাটক অভিনয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী আবির্ভূত হয়েছে— চলচ্চিত্র ও যাত্রাভিনয়। কিন্তু তাতে থিয়েটারের দর্শকদের ভীড় কমে নি। গোড়ার দিকে ভদ্রসমাজ থিয়েটারকে অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখত। কুলবধূরা তো কখনও থিয়েটারে যেতেন না। গিরিশচন্দ্রই প্রথম তাঁদের জন্য স্টার থিয়েটারে চিক দিয়ে ঘেরা স্বতন্ত্র আসনের ব্যবস্থা করেন। শিশিরকুমারের আবির্ভাবের

পূর্ব পর্যন্ত থিয়েটারের দর্শকবৃন্দ অধিকাংশই আসত হাট-বাজার থেকে। শিশিরকুমারের আবির্ভাবের পর থেকেই ভদ্র ও শিক্ষিতসমাজ থিয়েটারের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তখন থেকেই থিয়েটার অসাধারণ জনসমাদর লাভ করে। শুধু তাই নয়, আগে অভিনেত্রীদের সংগ্রহ করা হত শহরের রূপজীবী মহল থেকে। আজ তা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। ভদ্র পরিবারের মেয়েরা বিনা দ্বিধায়, বিনা সঙ্কোচে ও সানন্দে নাটক অভিনয়ে অংশগ্রহণ করছে। তা ছাড়া, অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন বিলুপ্ত হবার পর, অগণিত শৌখিন নাট্যগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে। রাজ্য সরকার তাদের উৎসাহ দিচ্ছেন 'রাজ্য নাট্যোৎসব' আয়োজন করে। ১৯৮৬ সালের অনুষ্ঠানে অভিনয় করল পঞ্চাশের ওপর নাট্যসমাজ। এছাড়া বামফ্রন্ট সুরমা মঞ্চ স্থাপন করেছে, দক্ষিণ কলকাতায় 'শিশির মঞ্চ' ও উত্তর কলকাতায় 'গিরিশ মঞ্চ'। আজ স্কুল, কলেজ, অফিস, ক্লাব সকলেই একটা করে নাট্যসমাজ গড়ে তুলেছে। শহরে যে সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়, প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় তার শেষে নাট্যাভিনয়ের আয়োজন। ইদানীংকালের আরও এক বৈশিষ্ট্য গ্রুপ থিয়েটার ও অনুরূপ সংস্থাসমূহ কর্তৃক মুক্ত অঙ্গ নে অভিনয়। বাঙালী যে নাটকপাগল, তা এসব থেকেই প্রমাণিত হয়। একসময় গিরিশচন্দ্র স্বপ্ন দেখেছিলেন—'কালে অভিনয়কার্যের গরিমা প্রকাশ পাইবে এবং সর্বসাধারণ নটের আদর করিবে।' গিরিশের সে স্বপ্ন আজ সফল হয়েছে। জীবনসংগ্রামের নানারকম সমস্যায় জর্জরিত আজকের মানুষ। আজকের নাটক সে সমস্যা রূপায়িত করে মানুষকে মুক্তির পথ দেখাচ্ছে।

## কলকাতার সিনেমা

যদিও বোম্বাইয়ের ওয়াটসন হোটেলে ৭ জুলাই ১৮৯৬ তারিখে প্রথম চলচ্চিত্র দেখানো হয়েছিল বলা হয়, তা হলেও কলকাতায় প্রথম চলচ্চিত্র দেখানো হয় ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্টার থিয়েটারে। ওই সময় প্রথম বাঙালী চলচ্চিত্র প্রদর্শক—আইনজীবী চন্দ্রমোহন সেনের পুত্র—হীরালাল সেন ও তাঁর ভাই মতিলাল সেন গঠিত করেন 'রয়েল বায়োস্কোপ কোম্পানী'। স্টিফেনসন নামে এক সাহেবের কাছ থেকে তাঁরা যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েছিলেন।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের প্যাথে কোম্পানী কলকাতায় একজন মুভি ক্যামেরাম্যান পাঠান। বাঙলা থিয়েটারে অভিনীত কয়েকটি নাটকের নির্বাচিত অংশের ছবি তুলে দর্শকদের দেখানে হয়। হীরালাল সেন ছোট ছোট কুড়িটি ছবি তোলেন। এগুলি স্টার থিয়েটারে দেখানো হয়। ডি.জি.ফালকের তোলা 'রাজা হরিশচন্দ্র' ছবিও অ্যালফ্রেড রঙ্গ মঞ্চে দেখানো হয়।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে হীরালাল সেনের মৃত্যুর পর ম্যাডান কোম্পানির অভ্যুত্থান ঘটে। জে. এফ. ম্যাডান 'কোরিনথিয়ান থিয়েটার'-এর মালিক ছিলেন। তিনি প্রথমে গড়ের মাঠে তাঁবু খাটিয়ে সেখানে চিত্র প্রদর্শন করতেন। পরে ১৩৮ নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের মাঠটা আগাসী সার্কাস (এরাই ওই নোংরা মাঠটা পরিষ্কার করেছিলেন) ছেড়ে দিলে

ম্যাডান কোম্পানি ওখানেই একটা তাঁবু ফেলে 'এলফিনস্টোন বায়োস্কোপ' নাম দিয়ে চিত্র প্রদর্শন করতে থাকে। তাঁবুটা আগুন লেগে পুড়ে যাবার পর ওখানে 'কর্নওয়ালিশ থিয়েটার' নির্মিত হয় ও 'ক্রাউন সিনেমা' নাম দিয়ে ওখানে ছবি দেখানো হয়।

এদিকে জ্যোতিষ সরকারের সহায়তায় 'রাজা হরিশচন্দ্র', 'মহাভারত,' 'নল দময়ন্তী,' 'ধ্রুবচরিত্র', প্রভৃতি হিন্দি চিত্র নির্মাণ করা হয়। পৌরাণিক এই সব চিত্র মেয়েদের আকৃষ্ট করে। বাংলায় সর্বপ্রথম নির্বাক ছবি 'বিল্বমঙ্গল' ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ নভেম্বর তারিখে কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে মুক্তিলাভ করে। এরপর ম্যাডান কোম্পানি প্রায় শতাধিক নির্বাক ও সবাক ছবি তুলেছিলেন। ম্যাডান কোম্পানির নির্বাক ছবি 'শিবরাত্রি'-তেই সর্বপ্রথম বাংলা টাইটেল লেখা হয়েছিল।

ম্যাডান কোম্পানি যখন কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে ছবি দেখাচ্ছিল, তখন মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে 'সিটি থিয়েটার' ('বীণা থিয়েটার')-এ এডি. পলো'র জনপ্রিয় 'সিরিয়াল' ছবিগুলো দেখানো হচ্ছিল।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ৪৭ নং কাশী মিত্র ঘাট রোডে (এখন এদের অফিস ১২৫ নং লেনিন সরণী) অরোরা সিনেমা কোম্পানি গড়ে ওঠে। দেবী ঘোষের সাহায্যে এরা প্রথম পূর্ণাঙ্গ নির্বাক ছবি 'রত্নাকর' তোলেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ আগস্ট তারিখে 'রসা থিয়েটার' (পূর্ণ থিয়েটার)-এ এটা প্রথম দেখানো হয়। এরপর গড়ে ওঠে অরোরা ফিল্ম করপোরেশন, ব্রিটিশ ডমিনিয়নস্ ফিলম লিমিটেড, ইণ্ডো ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানি, ইণ্ডিয়ান সিনেমা আর্টস, তাজমহল ফিলম কোম্পানি, ফটো প্লে সিণ্ডিকেট, ইণ্ডিয়ান ফিল্ম প্রডিউসিং কোম্পানি, ইউনিক পিকচারস্, এশিয়াটিক ফিল্মস কোম্পানি, মুভি প্রডিউসিং, বেঙ্গল মুভি অ্যাণ্ড টকি ফিল্ম লিমিটেড, হীরা ফিলমস, অ্যাঙ্গোরা ফিল্মস্ ব্যুরো, রূপম কোম্পানি, প্রভিনসিয়াল ফিল্ম প্রডিউসার, ফিলিমস্ অভ দি ইস্ট, ইস্টার্ন ফিলমস্ সিণ্ডিকেট, ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট প্রডিউসার, ছায়াচিত্র প্রতিষ্ঠান, ন্যাশনাল, পিকচারস্ পিকটোরিয়াল ক্লাব, রাধা ফিলমস্, গ্রাফিক আর্টস্, ইনটারন্যাশনাল ক্র্যাফ্‌ট্, বড়ুয়া ফিলম ইউনিট, বেঙ্গল ইউনাইটেড ফিলম কোম্পানি, ক্যালকাটা ফিলম কোম্পানি, ইউনিভারসেল ফিলম করপোরেশন, সিলেক্ট্ পিকচার্স্ করপোরেশন, ইষ্টার্ন ফিলমস্ অ্যালায়েন্স, তরঙ্গিণী ফিলম সিণ্ডিকেট, ব্রিটিশ অ্যাণ্ড ওরিয়েণ্টাল কোম্পানি, প্রভৃতি সংস্থা।

আগে এখানে যেসব বিলাতী ছবি দেকানো হত তাতে নগ্নিকার ছবি দেখানো হত। সেটা রোধ করবার জন্য গভর্নমেণ্ট বোর্ড অব্ ফিলম সেনসরস্-এর অনুমোদন ছাড়া ছবি দেখানো নিষিদ্ধ করেন। আমার যতটা মনে আছে 'নেপচুনস্ ডটার'-ই শেষ বই যাতে নগ্নিকার ছবি দেখেছিলাম।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বযুগের (১৯১৯-১৯৪৭) পরিচালক, চিত্রশিল্পী, শিল্প-নির্দেশক ও প্রযোজক হিসাবে আমরা যাদের পেয়েছিলাম তাঁদের মধ্যে ছিলেন নিরঞ্জন পাল, ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, দেবকী বসু, দেবী ঘোষ, নীতিন বসু, জ্যোতিষ সরকার, চার্লস ক্রীড, জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি দাস, প্রমথেশ বড়ুয়া প্রমুখদের। ওই যুগের চলচ্চিত্রের অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরাজ ভট্টাচার্য, রাজীব রায়, ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, প্রমথেশ বড়ুয়া, তিনকড়ি চক্রবর্তী, জয়নারায়ণ

মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বসু, নরেশচন্দ্র মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরী, ফণী বর্মা, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (বড়), সত্যেন দে, কার্তিক দে প্রমুখ। অভিনেত্রীদের মধ্যে ছিলেন দুর্গারাণী, পেশেনস্ কুপার, মিস লাইট, নীরদাসুন্দরী, দেববালা, রেণুবালা (ছোট), নিভাননী, প্রফুল্লবালা, সীতাদেবী, বীণাপানি, প্রেমকুমারী নেহেরু, ডেলেসিয়া ক্লার্ক, মীরাবাঈ, সবিতা দেবী, মিসেস ভাগ'নে, সুশীলাবালা, শিশুবালা, কাননবালা, বেলারাণী, সীতা, শান্তি গুপ্তা, প্রভা, অনিমা দেবী, ভোলা, রেণু, ডলি দত্ত, আয়েষা বাই, কঙ্কাবতী, মৌসুমী, জ্যোৎস্না গুপ্তা, শীলা, চন্দ্রাবতী প্রমুখারা।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বযুগে কলকাতায় ১৮৪ খানা বাংলা নির্বাক ও স্বল্প দৈর্ঘ্য সবাক ও ২৫১ খানা পূর্ণ দৈর্ঘ্য বাংলা সবাক ছবি দেখানো হয়েছিল। শেষের ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অন্নপূর্ণার মন্দির, আলিবাবা, উদয়ের পথে, কর্ণার্জুন, কপালকুণ্ডলা, গৃহদাহ, গোরা, চন্দ্রশেখর, চিরকুমার সভা, চোখের বালি, তটিনীর বিচার, তুলসীদাস, দেনাপাওনা, দেবদাসী, নটীর পূজা, নৌকাডুবি,পথের দাবী, বড়দিদি, বিরাজবৌ, বিষবৃক্ষ, মহানিশা, মানময়ী গার্লস স্কুল, শহর থেকে দূরে, সরলা, সাতনম্বর বাড়ী, মহাপ্রস্থানের পথে ইত্যাদি।

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই বাঙলার চিত্রজগতে এক নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সেটাকে এক অসাধারণ সঙ্কটও বলা চলে। বাংলা ছবি মার খেতে থাকে হিন্দি ছবির কাছে। হিন্দিতে তখন দিলীপকুমার, রাজ কাপুর, দেব আনন্দ প্রমুখরা ছিলেন নায়ক, আর মধুবালা, বৈজয়ন্তীমালা, নারগিস ও মীনাকুমারীরা ছিলেন নায়িকা। হিন্দি ছবির প্রতিযোগিতায় বাংলা ছবির কোন 'গ্ল্যামার' রইল না। সেই সঙ্কটের যুগে 'মুস্কিল আসান' রূপে আবির্ভূত হলেন উত্তমকুমার। ছবিতে তিনি ছিলেন এক পরশমণির ছোঁয়াচ। পঞ্চাশের দশকের মাঝখান থেকে প্রতি বছর তিনি এক নাগাড়ে আবির্ভূত হয়েছেন দশবারোখানা ছবির নায়ক হিসাবে। 'গ্ল্যামার'-সৃষ্টির দিক থেকে তার মত নায়ক বাঙলাদেশে আর কখনও জন্মান নি। মেয়েদের কাছে তিনি ছিলেন তাদের আরাধ্য দেবতা। সব সময়েই তাঁর ছবিতে 'হাউস ফুল'। ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জুলাই তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর ছবির সংখ্যা ২১২, তার মধ্যে ছয়খানা হিন্দি ছবি। দিনকতক (১৯৫৩) স্টার থিয়েটারে তিনি অভিনয়ও করেছিলেন 'শ্যামলী' নাটকে। ১৯৫৫-তেও আবার করেছিলেন।

উত্তমের বইয়ের নায়িকাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ছবি রায়, মনীষা দেবী, করবী গুপ্তা, ভারতী দেবী, সুনন্দা দেবী, সন্ধ্যারাণী, গীত দেবী, সুচিত্রা সেন, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু দে, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, কাবেরী বসু, সবিতা চট্টোপাধ্যায়,অনুভা গুপ্তা, অনীতা গুহ, মালা সিনহা, সুমিত্রা দেবী, সুপ্রিয়া চৌধুরী, সুমিতা সান্যাল, বাসবী নন্দী, সুনীতা, নন্দিতা বসু, শর্মিলা ঠাকুর, তনুজা সমর্থ, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, সুলতা চৌধুরী, রীণা ঘোষ, অঞ্জনা ভৌমিক, বৈজয়ন্তীমালা, অপর্ণা সেন, সুপর্ণা সেন, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, আরতি ভট্টাচার্য, মিঠু মুখার্জী, গায়ত্রী মুখোপাধ্যায়, বিদ্যা সিন্‌হা, সুলক্ষণা পণ্ডিত ইত্যাদি।

উত্তমের যে সব বই 'হিট' করেছিল, তার মধ্যে ছিল 'বসু পরিবার' (১৯৫২, সুপ্রিয়ার সঙ্গে প্রথম অভিনয়), 'সাড়ে চুয়াত্তর' (১৯৫৩, সুমিত্রার সঙ্গে প্রথম অভিনয়), 'অগ্নি

পরীক্ষা' (১৯৫৪), 'সবার উপরে' ((১৯৫৫), 'সাগরিকা' (১৯৫৬), 'সাহেব বিবি গোলাম' (১৯৫৬), 'শিল্পী' (১৯৫৬), 'তাসের ঘর' (১৯৫৭), 'হারানো সুর' (১৯৫৭) , 'জীবন তৃষ্ণা' (১৯৫৭), 'রাজলক্ষ্মী' (১৯৫৮), ' কান্ত' (১৯৫৮), 'সোনার হরিণ' (১৯৫৯), 'মরুতীর্থ হিংলাজ' (১৯৫৯), 'সপ্তপদী' (১৯৬১), 'এণ্টনী ফিরিঙ্গি' (১৯৬৭) , 'নিশিপদ্ম' (১৯৭০), 'এখানে পিঞ্জর'(১৯৭১), 'বনপলাশীর পদাবলী' (১৯৭০), 'অগ্নিশ্বর' (১৯৭৫), 'ভোলা ময়রা' (১৯৭৭), 'দেবদাস' (১৯৭৯), 'দুই পৃথিবী' (১৯৮০), 'ওগো বধূ সুন্দরী'।

উত্তমের ছবির পরিচালক ছিলেন নব্যেন্দু ব্যানার্জি, দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়, রাজেন চৌধুরী, *অগ্রদূত, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, *সুকুমার দাশগুপ্ত, কালীপ্রসাদ ঘোষ, নির্মল দে, নীরেন লাহিড়ী, সুবোধ মিত্র, *পরেশ মিত্র, ভোলানাথ মিত্র, *চিত্ত বসু, *সুশীল মজুমদার, সেতীশ দাশগুপ্ত, সুধাংশু মুখোপাধ্যায়, সুবোধ মিত্র, হরিদাস ভট্টাচার্য, * সুধীর মুখোপাধ্যায়, * মানু সেন, অর্ধেন্দু সেন, *তপন সিংহ, *মৃণাল সেন, কমল গঙ্গোপাধ্যায়, *অগ্রগামী, * কার্তিক চট্টোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন মিত্র, *দেবকী বসু, *অজয় কর, সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়, * মঙ্গল চক্রবর্তী, * সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অসিত সেন, হেমচন্দ্র চন্দ্র, *বিশু দাশগুপ্ত, *জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, * প্রফুল্ল চক্রবর্তী, বিশু চক্রবর্তী, দিলীপ নাগ, * পীযূষ বসু, * সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনু বর্ধন * হীরেন নাগ, *উত্তমকুমার (নিজে) *সত্যজিৎ রায়, শচীন মুখোপাধ্যায়, আলো সরকার, সুবোধ মিত্র, অজিত লাহিড়ী, * পিনাকী মুখোপাধ্যায়, হরিসাদন দাশগুপ্ত, সলিল সেন, * অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, এস. মল্লিক, * বিজয় বসু, অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, শচীন অধিকারী, * শক্তি সামন্ত, পার্থপ্রতিম চৌধুরী, * সুশীল মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, পীযূষ গাঙ্গুলী, * দিলীপ রায়, সুখেন দাস, পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেন গুপ্ত, জয়ন্ত বসু, সৃজন, ইন্দর সেন, গৌর চৌধুরী, শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল চক্রবর্তী, গুলজার, সুলক্ষণা পণ্ডিত। শেষের দুজন উত্তম-অভিনীত হিন্দী ছবির পরিচালক। আর তারকাচিহ্নিত ব্যক্তিগণ একাধিক ছবির পরিচালক।

এ যুগের অন্যান্য খ্যাতিমান অভিনেতা হচ্ছেন উৎপল দত্ত, বিকাশ রায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, অনুপকুমার, দীপঙ্কর দে, সন্তু মুখার্জি, তাপস পাল। আর অভিনেত্রীদের মধ্যে সাবিত্রী, সন্ধ্যা, মৌসুমী, জয়া, অপর্ণা, মহুয়া, দেব , সুমিত্রা।

কলকাতা এখন ছবি পাগল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার প্রমাণ অসংখ্য ছবি-ঘর ও দর্শকের প্রচণ্ড ভীড়। আগেই বলেছি কলকাতায় প্রথম ছবিঘর তৈরী করে ম্যাডান কোম্পানি। তারপর কালীপ্রসন্ন সিংহের পোষ্যপুত্র বিজয় সিংহের সহায়তায় কলকাতায় আরও দুটো প্রেক্ষাগৃহ, করপোরেশন স্ট্রীট ও চিৎপুর রোডে গড়ে ওঠে। ইতিমধ্যে মেছুয়াবাজারের বীণা থিয়েটার 'সিটি থিয়েটার' নাম নিয়ে সিনেমা দেখাতে শুরু করে। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে ম্যাডান কোম্পানি সিনেমা হাউস তৈরী করবার পর, ওর কাছাকাছি জায়গায় (৮৩, বিধান সরণী) প্রখ্যাত আইনবিদ নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের পুত্র বীরেন সরকার মশায় 'চিত্রা' নামে একটা প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ করেন। ফড়িয়াপুকুর স্ট্রীট, সারকুলার রোডের সংযোগস্থলের

কাছে 'শো হাউস' (১৩ এ শিবদাস ভাদুড়ী স্ট্রীট) নামে একটা সিনেমা-ঘর তৈরী হয়। তারপর বিধান সরণীটা (কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট) সিনেমা পাড়ায় পরিণত হয়। কীর্তি মিত্রের বাড়ীর জমিতে এবং 'চিত্রা'র কাছে 'দর্পণা' সিনেমা (৮৪ বিধান সরণী) তৈরী হয়। তারপর একে একে গড়ে ওঠে 'উত্তরা' (১৩৮/১, বিধান সরণী), ' ' (১৩৮ বিধান সরণী), 'মিনার'(১২৬/২ বিধান সরণী), 'রাধা' (১৪০, বিধান সরণী), 'রূপবাণী' (নামকরণ রবীন্দ্রনাথ করে দিয়েছিলেন, ৭৬/১ বিধান সরণী) ও 'বীণা' (২১৯ বিধান সরণী)। এখন কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় সিনেমা হাউস। কলকাতায় এখন মোট ১০৫টা সিনেমা হাউস আছে।

এবার ছবি তোলার কথা বলে এ-প্রসঙ্গ শেষ করব। ছবি তোলার জন্য মানিকতলায় অরোরা সিনেমার ষ্টুডিওই সবচেয়ে প্রাচীন। তারপর কলকাতায় আরও তেরটা ষ্টুডিও হয়েছিল। তাদের মধ্যে নয়টা টালিগঞ্জে, দু'টা ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে (সিঁথি মোড়ের কাছে), একটা ঝাউতলায় ও আর একটা দক্ষিণেশ্বরে অবস্থিত ছিল। টালিগঞ্জের ষ্টুডিওগুলির নাম ছিল ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও, রাধা ফিলম্ ষ্টুডিও, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিলম্ ষ্টুডিও, ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিও, কালী ফিলম ষ্টুডিও ও নিউ থিয়েটারের নম্বর ওয়ান ও নম্বর টু ষ্টুডিও। ঝাউতলার ষ্টুডিওটার নাম ছিল রূপ ষ্টুডিও। বি. টি. রোডের ষ্টুডিও দু'টার নাম ছিল ন্যাশনাল ফিলম ষ্টুডিও ও বেঙ্গল ফিলম ষ্টুডিও। আর দক্ষিণেশ্বরের ষ্টুডিওটার নাম ছিল ইষ্টার্ন টকীজ। এখন কলকাতায় মাত্র ছয়টা ষ্টুডিও আছে। তাদের মধ্যে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও, নিউ থিয়েটার নম্বর ওয়ান ও নিউ থিয়েটার নম্বর টু ষ্টুডিও, টেকনিসিয়ানস ষ্টুডিও ও ক্যালকাটা মুভিটোন টালিগঞ্জে অবস্থিত। অরোরা ফিলম ষ্টুডিও মানিকতলায় অবস্থিত। আর এ কয়টা ছাড়া টালিগঞ্জে দূরদর্শন কেন্দ্রের কাছে রাধা ফিলম ষ্টুডিও নামেও একটা সংস্থা আছে।

ইদানীং এদেশে তোলা ছবি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিশেষ করে বিমল রায়ের 'দেবদাস' ও 'দুই বিঘা জমি' ও সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালি', 'অপরাজিত,' 'অপুর সংসার', 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন' ইত্যাদি।

স্বাধীনতার আগে ও অব্যবহিত পরে কোন নাটক মঞ্চস্থ করতে হলে তার পাণ্ডুলিপি লালবাজারে পুলিশ অফিসারদের কাছে জমা দিতে হত। ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আর অনুমতি নেওয়ার দরকার হয় না। তবে সাম্প্রদায়িক বা সশস্ত্র বিপ্লবের কোন ইঙ্গিত থাকলে পুলিশ সে ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

## সেকালের বড়দিন

তখন, কলকাতা ছিল ভারতের রাজধানী। সুতরাং আমার জীবনের প্রথম অধ্যায়ে কলকাতার বড়দিন ছিল রাজধানী শহরের বড়দিন। সে বড়দিনের ছিল এক অসাধারণ জাঁকজমক ও জলুস। শারদীয়া পূজার সময় আমরা যেমন কলকাতার বাইরে যাই,

সেকালে কলকাতায় চিত্ত বিনোদনের জন্য বড়দিনের সময় আসত সাহেবসুবোরা ভারতের নানা প্রান্ত থেকে। প্রথম সাহেব যিনি এখানে বড়দিন পালন করেছিলেন তিনি হচ্ছেন কলকাতর প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নক। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে চার্নক যখন হুগলি থেকে পালিয়ে এসে সুতানটিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তখন তিনি বড়দিনের উৎসবটা এখানেই পালন করেছিলেন।

এই শতাব্দীর মুখপাতে কলকাতা যখন ভারতের রাজধানী ছিল, তখন বড়দিনের সময় এখানে উচ্ছলিত হতো এক অবেগময় আনন্দের ঢেউ। মাত্র সাহেবসুবোরাই যে আনন্দ করতো, তা নয়, এদেশের লোকরাও। সাহেবদের কাছে বড়দিনটা ছিল যীশুখ্রিস্টের জন্মজয়ন্তী উৎসব। কিন্তু এ-সময় লোকের মনে আনন্দের ঢেউ তুঙ্গে উঠতো বলে এদেশের লোকরা এটাকে বড়দিন বলতো। বড়দিনের সময় স্কুল-কলেজ অফিস-কাছারি সবই বন্ধ থাকতো ন'দিনের জন্য—২৪ ডিসেম্বর থেকে পয়লা জানুয়ারি পর্যন্ত, আবার দোসরা জানুয়ারিটা যদি রবিবার হতো, তাহলে ফাউ হিসাবে একদিন বেশি ছুটি পাওয়া যেত। কলকাতার শেয়ার বাজার বন্ধ থাকতো পনেরো দিন—১৮ ডিসেম্বর থেকে পয়লা জানুয়ারি পর্যন্ত। হাইকোর্টেরও এরকম লম্বা ছুটি থাকতো। এখন মাত্র হাইকোর্টই এই ঐতিহ্যটা বজায় রেখেছে যদিও ওটা সংক্ষিপ্ত হয়েছে আট-দশ দিনে।

বড়দিনের সময় কলকাতার ব্যবসাপাড়ার দোকানপত্তরগুলো সাজানো হতো আলোকমালায় ও বর্ণাঢ্য পতাকা-ফেস্টুন দিয়ে। সাহেবরা তাদের ঘরবাড়িগুলোও অনুরূপভাবে সাজাতো। দেশিপাড়ায় বসবাসকারী এদেশীয় খ্রিস্টানরাও তাই করতো। সাহেবঘেঁষা বাঙালিরাও অনেকে তাই করতো। সমস্ত শহরটাই আলোকমালায় ঝলমল করতো। দেশীপাড়ার লোকরা এই আলোকমালা দেখতে সাহেবপাড়ায় যেত। এমনকি অন্তঃপুরিকারাও আস্টেপৃষ্ঠে—ঝিলমিলি-আঁটা ছ্যাকরা গাড়ি করে কালীঘাটে যেতো পৌষকালীর পুজো দিতে, আর ফেরবার পথে সাহেবপাড়ার আলোকমালা দেখে আসত।

বড়দিনের সময় সাহেবরা যে মাত্র তাদের বাড়ির বাইরের দিকটাই সুস ত করতো না নয়, বাড়ির ভেতরটাও। একটা ঘরে সুস ত X-mas tree বসাতো। খাটের পায়াতে ঝুলতো সান্টা ক্লজের মোজা, আর তার ভিতর রাখতো নানা রকম খেলনা ও উপহার দ্রব্য। সকালে উঠে ছেলেমেয়েরা বিশ্বাস করতো যে সান্টা ক্লজ (সেণ্ট নিকোলাসের অপভ্রংশ) রাত্রিকালে এসে তাদের জন্য এসব উপহার দ্রব্য রেখে গেছে। এরপর ছিল বাতি জ্বালার ব্যাপার ও একটা মস্তবড় ক্রিসমাস-কেক তৈরি করা। উৎসব পালনের জন্য সেটাকে কেটে উদরস্থ করা হতো। সাহেবদের দেখাদেখি দেশীপাড়ার লোকরাও বড়দিনের উৎসব পালন করতো কেক খেয়ে। মাছ-মাংস রান্নার বাহুল্য করে। অনেকে আবার বড়দিনের সময় চড়িভাতি করতে যেত। মোটকথা দেশীপাড়ার লোকদের কাছেও বড়দিনটা ছিল আমোদ-আনন্দ করবার সময়। ছেলেমেয়েদের আনন্দ দেবার জন্য অভিভাবকরা অনেকেই তাদের নিয়ে যেত যাদুঘর, পশুশালা ও বোটানিক্যাল গার্ডেন-এ। এসব জায়গায় অসাধারণ ভীড় হতো। জু-গার্ডেন-এ এসময় প্রবেশ মূল্য দু-একদিন বেশি করা হতো।

সাহেবদের আনুকূল্য লাভ করবার জন্য অনেকেই সাহেববাড়ি ভেট পাঠাতো। এটা তৎকালীন একটা রীতি ছিল। নানারকম কেক্, মিষ্টান্ন ও ফল ভেটের ঝুড়িতে থাকতো।

বড়দিনের সময় 'গ্রিটিং কার্ডস' পাঠাবার রীতিও খুব ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এখন সেটা প্রায় উঠে গেছে। তার পরিবর্তে এখন পাঠানো হয় দেওয়ালীর সময় 'দেওয়ালীকা হার্দিক অভিবাদন'।

সেকালের সাহেবী সমাজে এসময় উপহার দেবার রীতি ছিল, বিশেষ করে যারা বিদেশে থাকতো। বিদেশ থেকে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই ডাকযোগে এদেশের সাহেবদের উপহার পাঠাত। ডাকঘরে এসময় বিদেশ থেকে বস্তাবস্তা উপহার এসে হাজির হতো। প্রেরক রেজেস্ট্রি করে না পাঠালে অনেক সময়ই ডাকঘরের কর্মচারিরা এগুলো আত্মসাৎ করতো।

বড়দিনের সময় কলকাতার সবচেয়ে বড় ঘটনা ছিল ঘোড়দৌড়ের মাঠে 'ভাইসরয় কাপ'-এর খেলা। অবশ্য আরও অনেক রকম খেলা হতো—কিন্তু 'ভাইসরয় কাপ'-এর আকর্ষণই ছিল সবচেয়ে বেশি। যতদিন কলকাতা ভারতের রাজধানী ছিল, ততদিন ভাইসরয় নিজে এই খেলার দিন ঘোড়দৌড়ের মাঠে উপস্থিত থাকতেন। ১৯০৪ সালে 'ভাইসরয় কাপ' খেলার দিন ঘোড়দৌড়ের মাঠে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছিল। ভাইসরয় ওই মাঠে বসেই আদেশ দিয়েছিলেন যে নিমতলার শ্মশানঘাটেই 'করোনারস্ কোর্ট বসুক'। ঘটনাটা এখানে একটু বিস্তারিতভাবে বলা দরকার। 'সিউদতরায় প্রেমসুক' নামে এক সম্ভ্রান্ত মারবাড়ি ফার্মের মালিক তাঁর অফিস থেকে নিজ ঘোড়ার গাড়ি (তখন মোটর গাড়ির চলন ছিল না) করে বড়বাজারে তাঁর বাড়ি ফিরছিলেন। কলকাতায় হ্যারিসন রোডে তখন সবে ট্রামগাড়ির প্রচলন হয়েছে। প্রেমসুকবাবুর গাড়িটা ক্লাইভ স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলে আসামাত্রই গাড়ির ঘোড়াটা ট্রামগাড়ির ঢং ঢং শব্দ শুনে বিগড়ে গিয়ে পথছুট হয়ে ট্রামগাড়িতে ধাক্কা মারে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির একটা যোয়াল গাড়ির ভেতর ঢুকে প্রেমসুকবাবুর বুকে সজোরে আঘাত হানে। অকুস্থলেই প্রেমসুকবাবুর মৃত্যু ঘটে। সংবাদ পেয়ে সেখানে ছুটে আসে কলকাতার মারবাড়ি সমাজ। দুর্ঘটনায় নিহত প্রেমসুকবাবুর শবব্যবচ্ছেদ তারা বরদাস্ত করবে না। ছুটে যায় লাটভবনে বড়লাট লর্ড কার্জনের কাছ থেকে বিনা ব্যবচ্ছেদে শব ছেড়ে দেবার জন্য অনুমতি-পত্র সংগ্রহের জন্য। লাটভবনে গিয়ে শোনে বড়লাট ঘোড়দৌড়ের মাঠে গেছেন 'ভাইসরয় কাপ' বাজির খেলা দেখবার জন্য। সেখানে গিয়ে তারা অনুমতি সংগ্রহ করে যে বিনা ব্যবচ্ছেদেই নিমতলা ঘাটে 'করোনারস' কোর্ট বসুক এবং প্রেমসুকবাবুর লাশ ছেড়ে দেওয়া হউক। কলকাতার ইতিহাসে এই প্রথম ও শেষ নিমতলা ঘাটে 'করোনারস্' কোর্ট-এর অধিবেশন হয়েছিল।

বড়দিনের সময়ের আর এক স্মরণীয় ঘটনা ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট পঞ্চম জর্জের সস্ত্রীক ভারত ভ্রমণ তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে। বড়দিনের সময় তিনি কলকাতায় আসেন। সে-সময় এক সাড়ম্বর উৎসব হয়েছিল। রেড রোডের ধারে গ্যালারি তৈরি করে বসবার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল স্কুলের ছেলেদের রাজদর্শন করাবার জন্য। তাদের মিষ্টান্ন দ্বারা আপ্যায়ন করা হয়েছিল। আমার সহপাঠীদের সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম। আমাদের উপহার দেওয়া হয়েছিল একখানা করে ইউনিয়ন জ্যাক্ পতাকা ও একখানা মেডেল যার ওপর অংকিত ছিল রাজারানীর যুগল মূর্তি।

সেকালে বড়দিনের সময়টা ছিল দোকানদার ও ব্যবসায়ীদের একটা মরসুমের সময়। বড় বড় সাহেবী দোকান যেমন হোয়াইটওয়ে লেডল, হল অ্যাণ্ডারসন, ফ্রানসিস্ হ্যারিসন হ্যাদাওয়ে, আর্মি অ্যাণ্ড নেভি স্টোরস' ইত্যাদি দোকানে সাহেবমেমদের খুব ভিড় হতো পোশাক-আশাক থেকে নানারকম উপহার দ্রব্য কেনবার জন্য। ছোটখাটো সাহেবরা ভিড় করতো নিউ মার্কেট ও চাঁদনী চকে। এছাড়া বইটই উপহার দেবার জন্য সাহেবদের ভিড় হতো ডবলিউ নিউম্যান, থ্যাকার স্পিঙ্ক ইত্যাদি বইয়ের দোকানে। কলেজ স্ট্রীট পাড়ার বইওয়ালাদেরও এটা মরসুমের সময় ছিল, কেননা এসময় স্কুলের ছেলেরা প্রমোশন পেয়ে হিড়িক লাগাতো বই কেনবার জন্য। নূতন বই কেনাতে ছেলেদের খুব আনন্দ হতো। তাছাড়া, বড়দিনটা ছেলেদের কাছে একটা সুখের সময় ছিল, কেননা পূজার ছুটি ও গ্রীষ্মকালের ছুটির মত ছেলেদের বড়দিনের ছুটিতে কোনো 'হোম্ টাসক্' করতে হতো না।

শাক-সবজি, মাছ-মাংস ইত্যাদি বিক্রেতাদের কাছেও বড়দিনটা মরসুমের সময় ছিল। এসময় কেনাকাটার ফলে সবচেয়ে বেশি আয় হতো কেকওয়ালাদের। ফারপো, পেলিটি, গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল, কেলনার, স্পেনসার প্রভৃতি সাহেবী দোকানগুলো এসময় বেশ দু'পয়সা কামাতো। নিউ মার্কেটের কেকওয়ালাদেরও এসময়টা ছিল পোয়াবারো।

বড়দিনের সময় সার্কাস, কার্নিভাল, হুলাহুলা ডানস্ ইত্যাদিতেও খুব ভিড় হতো।

বিলাতি হোটেলগুলোরও এ সময়টা ছিল মরসুম কেননা কলকাতার বাইরে থেকে যে সব সাহেব আসত, তারা এই হোটেলগুলোতেই থাকতো।

কলকাতাতে যেমন বাইরের লোক এসে ভিড় জমাতো কলকাতার লোকও তেমনি অনেক সময় বাইরে যেত। তার জন্য রেল কোম্পানি এসময় X-mas কনসেশন দিতো। অনেকগুলো গির্জার চত্বরে জুয়ার আড্ডা বসতো। তাছাড়া গির্জার পাদরীরাও এসময় লটারি অনুষ্ঠিত করতো ও প্রাইজ দেবার পর উদ্বৃত্ত অর্থ গির্জার উন্নয়নে কাজে ব্যয় করতো।

এসব ছাড়া জামাইবাড়ি শীতের তত্ত্বটা লোক বড়দিনের সময়ই করতো।

কলকাতার সেকালের বড়দিনের ছুটিটাও এখন একদিনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তাও কোনো কোনো বছর বড়দিনের ছুটি পাওয়া যায় না, যেমন যে বছর বড়দিনটা রবিবারে পড়তো।

## ৩০ কলকাতার মসজিদ, গির্জা ও অন্যান্য ধর্মস্থান

হিন্দু মন্দিরের মত কলকাতায় মুসলমানদের মসজিদেরও ছড়াছড়ি। প্রতি রাস্তায় ও মুসলমান পাড়ার অলিতে গলিতে মসজিদ দেখতে পাওয়া যায়। তবে বিনয় ঘোষ মশায় যে বলেছেন—"কলকাতা শহরে গত কয়েক বছরের মধ্যে যত্রতত্র করপোরেশনের জায়গায় যে ভাবে মন্দির গড়ে উঠেছে মসজিদ সেভাবে গড়ে উঠেনি, ওঠা সম্ভবপরও নয়" এটা ভুল। নিউ মার্কেটের পূর্বদিকের মসজিদটাই তার দৃষ্টান্ত। এটা বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে করপোরেশনের জায়গার ওপরই নির্মিত হয়েছে। তিনি আরও একটা ভুল

তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি বলেছেন যে নাখোদা মসজিদ ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় স্থাপিত হয়। নাখোদা মসজিদ ওখানেই বরাবর ছিল। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের দাঙ্গা-হাঙ্গামার পর, এই মসজিদটাকে মাত্র এর বর্তমান রূপ দেওয়া হয়েছিল। মসজিদটা কচ্ছী মুসলমানগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

কলকাতার সবচেয়ে প্রাচীন হিন্দুমন্দির যেমন গান ফাউণ্ডারি রোডের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত চিত্তেশ্বরীর মন্দির, মুসলমানদেরও তেমনই সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদ হচ্ছে গান ফাউণ্ডারি রোডের পূর্বপ্রান্তে রাস্তার দক্ষিণ ধারে অবস্থিত। এটা ইংরেজরা কলকাতায় আসবার আগে থেকেই ওখানে আছে।

নাখোদা মসজিদের উত্তরে সিঁদুরিয়াপটির হাফিজ জালাউদ্দিনের মসজিদও খুব প্রাচীন।

নাখোদা মসজিদকেই এখন কলকাতার বড় মসজিদ বলা হয়। তবে ধর্মতলা ষ্ট্রীট ও চৌরঙ্গীর মোড়ে অবস্থিত টিপু সুলতানের মসজিদটা ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে টিপু সুলতানের ছেলে প্রিন্স গোলাম মহম্মদ (যাঁর নামে দক্ষিণ কলকাতায় একটা রাস্তা আছে) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। টিপু সুলতানের বংশধররা কলকাতায় এসে প্রায় তেরটি বড় মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাদের মধ্যে ধর্মতলার মসজিদ ছাড়া, টালীগঞ্জের মসজিদটাই প্রসিদ্ধ। তবে ধর্মতলার মোড়ে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান মসজিদটি নির্মিত হবার পূর্বে ওখানে যে একটা মুসলমানদের ধর্মস্থান ছিল, তা ওর পিছনের রাস্তার নাম থেকে প্রকাশ পায়। ১৭৮৪-১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্ক উড কর্তৃক অঙ্কিত যে ম্যাপখানা ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম বেইলী প্রকাশ করেছিলেন, তাতে বর্তমান ধর্মতলার মোড়ের পিছনের রাস্তাটিকে ইমামবাড়ী লেন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তা থেকেই বোঝা যায় যে ওখানে মুসলমানদের একটা ধর্মগৃহ ছিল।

টিপু সুলতানের বংশধরদের মত মুরশিদাবাদের নবাব বংশও উত্তর ও মধ্য কলকাতায় অনেকগুলি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তার মধ্যে চিৎপুরের গোলকুঠি ও মানিকতলার কারবালা প্রসিদ্ধ। মেটিয়াবুরুজে অযোধ্যার নবাব বংশও অনেকগুলি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চিৎপুরের নবাবরাও (নায়েব-দেওয়ান রেজা খাঁর বংশধররা) কয়েকটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। শ্যামবাজারে রামরতন বসু লেনের ভিতর ও আপার সারকুলার রোডে (বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) মোহনবাগান লেনের বিপরীত দিকে অবস্থিত মসজিদগুলি আমি আমার ছেলেবেলা (বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ) থেকেই দেখে আসছি। এ ছাড়া, পার্কসার্কাস, কড়েয়া, বেকবাগান, ওয়েলেসলি, তপসিয়া, রাজাবাজার, কলাবাগান, নারকেলডাঙ্গা প্রভৃতি মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলেও বহু মসজিদ আছে। শিয়ালদহের কুতুবুদ্দিন সরকারের মসজিদ, চিৎপুরের ভোঁসড়ি শাহের মসজিদ ও দরগা, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডের মানিক পীরের দরগা, ক্লাইভ স্ট্রীটের জুম্মা পীরের দরগা, হেষ্টিংস-এ রজব আলির দরগা, কাশিয়াবাগানে উজির আলি আসফ জার কবর প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সিদ্দিকি যে সমীক্ষা করেছিলেন তাতে বলা হয়েছে যে কলকাতায় প্রায় ৫০০ মসজিদ আছে। এদের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে সুন্নী সম্প্রদায়ের মসজিদ। মসজিদ ছাড়া, সিদ্দিকির সমীক্ষা অনুযায়ী কলকাতায় ১৩টি পীরের দরগা ও

ছয়টি খানকা আছে। পীরের দরগাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চিৎপুর বাগবাজার খাল-পুলের উত্তরে অবস্থিত ঘোর সাহেবের আস্তানা। এখানে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই পূজা দেয়। ঘোর সাহেবের আস্তানার দক্ষিণেও একটা মসজিদ আছে।

*　　　　*　　　　*

হিন্দুদের যেমন মন্দির ও মুসলমানদের তেমনি মসজিদ, সাহেবদের তেমনি গির্জা। ব্রেবোর্ন রোডে অবস্থিত সেণ্ট নাজারথের আরমেনিয়ান চার্চই হচ্ছে কলকাতার ক্রীশ্চান উপাসনার সবচেয়ে প্রাচীন স্থান। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২ জুন তারিখে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত আরমেনিয়ানদের যে চুক্তি হয়, সেই চুক্তি অনুযায়ী ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে আরমেনিয়ানরা একটি ছোট প্রার্থনাগৃহ স্থাপন করে। এই প্রার্থনাগৃহটি বর্তমান সেণ্ট নাজারথের গির্জার ১০০ গজ দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। বর্তমান স্থানের গির্জাটি ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। এই গির্জার সংলগ্ন কবরখানায় এক সমাধি প্রস্তরে লেখা আছে— 'Rezebeebeh, the wife of the late charitable Sookeas. departed this world to life eternal on the 21st day of Nakha in the year 15". সালটা হচ্ছে Julpha সনের, এবং সেই অনুযায়ী তারিখটা হচ্ছে ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ জুলাই। এই পাথরখানা থেকে জায়গাটার প্রাচীনত্ব বোঝা যাচ্ছে। (এ সম্বন্ধে যে সব বিতর্ক আছে, আমি বিশ্লেষণ করে দেখেছি, সেগুলো সবই ভ্রান্তিমূলক। মনে হয়, আমার এ উক্তি কেউ চ্যালেঞ্জ করবেন না। যদি করেন, আমি আগে থাকতেই বলে রাখছি, তিনি হাস্যাস্পদ হবেন)।

১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার আরমেনিয়ান বণিক আগা নজরের নেতৃত্বে যে গির্জাটি নির্মিত হয়, সেটারই নাম দেওয়া হয় সেণ্ট নাজারথের চার্চ। কলকাতায় আরমেনিয়ান জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায়, ছোট প্রার্থনাগৃহটিতে উপাসনার জন্য স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতেই বড় গির্জাটি তৈরী করা হয়েছিল। ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে গির্জাটির নির্মাণ কার্য করেছিলেন একজন আরমেনিয়ান স্থপতি, নাম লিওন গ্যাভোনা। কলকাতায় তখন ভাল স্থপতির অভাব ছিল বলে, তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছিল পারস্য দেশ থেকে। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আগা হজরমলের ছেলে আগা ম্যানুয়েল গির্জাটির শিখর তৈরী করে দেয়। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আগা পেট্রাস অ্যারাটুনের অর্থে গির্জাটির সংস্কার করা হয়। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে আগা ক্যাচিক আরাকিয়েল নামে কলকাতার এক প্রসিদ্ধ আরমেনিয়ান বণিক গির্জাটির সংবর্ধন করেন। গির্জাটির মধ্যে বহু প্রাচীন সমাধি প্রস্তর আছে। বর্তমান শতাব্দীর চল্লিশের দশকে গির্জাটির বর্তমান রূপ দেওয়া হয়।

ইংরেজদের কলকাতায় আসবার সমসাময়িক কালের আর একটি গির্জা হচ্ছে মুরগীহাটার পর্তুগীজ রোমান ক্যাথলিক গির্জা। এ গির্জাটির উদ্ভব হয় এক চালাঘরে অবস্থিত প্রার্থনাগৃহ থেকে। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে মতী মেরিয়া টেনচ্ নামে এক মহিলার অর্থে ইটের গির্জাটি নির্মিত হয়। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে মতী সেবাষ্টিয়ান শ' গির্জাটির সংবর্ধন করেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজ কর্তৃক কলকাতা আক্রমণের সময় গির্জাটির

কিছু ক্ষতি হয়েছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নি। ক্লাইভ কর্তৃক কলকাতার পুনরুদ্ধারের পর ইংরেজরা উপাসনার জন্য এই গির্জাটিতেই আসতেন। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজরা পুরানো গির্জাটির স্থানে একটি নূতন গির্জা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ১২ তারিখে গির্জাটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। নির্মাণ করতে দু বছর সময় লেগেছিল। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ নভেম্বর তারিখে 'The Virgin Mary of Rosary'র নামে গির্জাটি উৎসর্গীকৃত করা হয়। নূতন গির্জাটি নির্মাণ করাত ৯০,০০০ টাকা খরচ পড়েছিল, তার মধ্যে ৩০,০০০ টাকা গির্জার ভাণ্ডার থেকে দেওয়া হয়েছিল ও বাকী টাকা চাঁদা তুলে সংগ্রহ করা হয়েছিল। এই গির্জাটির সমাধিভূমিতেও কলকাতার অনেক প্রাচীন সাহেবের কবর আছে। গির্জাটি ১৫ নং পর্তুগীজ চার্চ লেনে অবস্থিত।

ইংরেজরা কলকাতায় বসতি স্থাপনের পর প্রথম যে গির্জাটি স্থাপন করেছিল, সেটি হচ্ছে সেণ্ট আন্‌স গির্জা। এটা বর্তমান রাইটারস্ বিলডিং-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত ছিল। আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন বলে গেছেন যে এই সুন্দর ও উচ্চ শিখর বিশিষ্ট গির্জাটি পুণ্যবান নাবিকদের দাক্ষিণ্যে নির্মিত হয়েছিল। তাদের মনে বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে এই গির্জার মহিমাতেই তাদের বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। আনুমানিক ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ গির্জাটি তৈরী হয়েছিল। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ঝড়ে গির্জাটির শিখর ধ্বসে পড়ে। তারপর ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজ কর্তৃত্ব কলকাতা আক্রমণের সময় আশপাশের অন্যান্য ঘরবাড়ীর সঙ্গে এই গির্জাটিও ধ্বংস হয়। এই গির্জার শেষ যাজক রেভারেণ্ড গারভাস বেলামী অন্ধকূপ হত্যার সময় মারা যান।

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সেণ্ট আন গির্জা নষ্ট হয়ে যাবার পর, ইংরেজরা আরাধনার জন্য ওই গির্জার দক্ষিণে একটি 'চ্যাপেল' বা প্রার্থনাগৃহ তৈরী করে নিয়েছিল। এটা পুরানো দুর্গের ভিতরই অবস্থিত ছিল। ২৭ বৎসর যাবৎ পুরানো দুর্গের এই প্রার্থনাগৃহটাই 'প্রেসিডেন্সি চার্চ' হিসাবে কার্যকর ছিল। তবে অনেকে মুরগীহাটার পর্তুগীজ গির্জাতেও প্রার্থনা করতে যেতেন। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ কর্তৃক আহুত হয়ে একজন সুইডিশ মিশনারী দাক্ষিণাত্য থেকে কলকাতায় আসেন। নাম জন জ্যাকেরিয়া কিয়েরনাণ্ডার। তিনি সস্ত্রীকই কালকাতায় এসছিলেন। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ৪ নভেম্বর তারিখে এই ধর্মযাজকের কলকাতায় একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের আগেই তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। কলকাতায় আসবার পর তিনি এখানে একটা মিশন স্কুল স্থাপন করেন। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় একটি পর্তুগীজ প্রটেষ্টাণ্ট গির্জা স্থাপনের জন্য গভর্নর ভ্যানসির্টার্টের কাছে আবেদন করেন। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ নভেম্বর তারিখে কলকাতা কাউনসিলের অধিবেশনে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, 'যে বাড়িটায় আগে কালেক্টরের অফিস ছিল এবং যেখানে চ্যারিটি স্কুল বসত, সেই বাড়িটা কিয়েরনাণ্ডারকে গির্জা হিসাবে ব্যবহার করতে দেওয়া হউক'। কিন্তু চার বছর পরে ওই বাড়িটা সরকারী কাজের জন্য প্রয়োজন হওয়াতে কিয়েরনাণ্ডার নিজেই একটি গির্জা স্থাপন করতে প্রবৃত্ত হন। গির্জাটি মিশন রো-তে অবস্থিত। নাম মিশন চার্চ। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন দত্ত এখানেই খ্রীষ্টধর্ম দীক্ষা

নিয়েছিলেন। গির্জাটি নির্মাণ করতে কিয়েরনাণ্ডার যে অর্থ ব্যয় করেছিলেন তার প্রায় সবটাই ছিল তাঁর প্রথমা স্ত্রী   মতী ওয়েণ্ডালার-এর। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েণ্ডালার মারা যাবার পর কিয়েরনাণ্ডার   মতী আনা উলী নামে এক বিধবাকে বিবাহ করেন। সেও তার গহনাপত্র গির্জাটির উপকারার্থে দান করে। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে চোখে ছানি পড়ার জন্য কিয়েরনাণ্ডার তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারান। তখন তাঁর ছেলে রবার্ট গির্জাটির ভার নেয়। কিয়েরনাণ্ডারের ক্যামাক স্ট্রীট ও ভবানীপুরে (যেখানে পরে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি অবস্থিত ছিল) দুখানা বাড়ী ও অন্যান্য বিষয়-সম্পত্তি ছিল। কিন্তু তার ছেলে নানারকম 'extravagant speculation-এ টাকাটা উড়িয়ে দেয়। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে কিয়েরনাণ্ডার যখন দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন তখন তিনি দেউলিয়া। পাওনাদারদের ভয়ে চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদের কুঠিতে আশ্রয় নেন। কিয়েরনাণ্ডারের সম্পত্তি যখন নীলামে উঠল তখন গির্জাটিকে নীলামদারদের হাত থেকে বাঁচালেন মালদহের চার্লস গ্রাণ্ট সাহেব। তিনি নীলামদারদের ওর মূল্য বাবদ দশ হাজার টাকা দিয়ে দেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে গির্জা, স্কুল ও পার্ক ষ্ট্রীটের কবরখানা তিনজন ট্রাষ্টির হাতে দেওয়া হয়। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চুঁচুড়া অবরোধের সময় কিয়েরনাণ্ডার ইংরেজদের হাতে বন্দী হন। সেই সুযোগে তিনি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন ও তাঁর বিধবা পুত্রবধূর গৃহে আশ্রয় পান। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা যাবার সময় পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন।

কিয়েরনাণ্ডারের গির্জার পর ইংরেজরা যে গির্জা স্থাপন করেছিল, তা হচ্ছে চার্চ লেনে অবস্থিত সেণ্ট জনস্ গির্জা। সোফিয়া গোলডবরন তাঁর 'হার্টলে হাউস'-এ বলেছেন যে ইংরেজরা যখন ময়দানে নূতন দুর্গ নির্মাণ করেছিল, তখন তার ভিতর একটা গির্জা স্থাপন করেছিল। কিন্তু সে গির্জার কোন সন্ধান পরবর্তীকালে পাওয়া যায় নি। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম জনসন (কলকাতার বেগম'-এর শেষ স্বামী) নামে এক পাদরী কোম্পানির কাউনসিলের কাছে কলকাতায় এক নূতন গির্জা স্থাপনের জন্য আবেদন পেশ করেন। এর জন্য জনসনকে অনেক আন্দোলন করতে হয়েছিল। কিন্তু ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এ সম্বন্ধে কিছু বিশেষ উদ্যোগ লক্ষিত হয়নি। ওই বছরেরই ৩ এপ্রিল তারিখে এই উদ্দেশ্যে পুরানো জমিটা মহারাজ নবকৃষ্ণদেব বাহাদুরের কাছ থেকে (যা উনি ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ জানুয়ারী তারিখে নীলাম থেকে কিনেছিলেন) ১০,০০০ টাকা মূল্যে খরিদ করা হয়। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ওটা একটা গির্জা নির্মাণের জন্য চিরস্থায়ী ট্রাষ্টির হাতে দেন। ওই বছরেই পাদরী জনসন এক লটারীর মাধ্যমে ৩০,০০০ টাকা তোলেন। নির্মাণ করতে তিন বছর সময় লেগেছিল। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জুন তারিখ এই গির্জা উৎসর্গীকৃত করা হয়। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ড্যানিয়েল ও ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম বেইলী অঙ্কিত ছবি থেকে দেখা যায় যে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে যে বারান্দা নির্মিত হয়েছিল, তা ছাড়া গির্জার মৌলিক রূপই বর্তমান ছিল।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার একজন বিশপ নিযুক্ত হয়। প্রথম চারজন বিশপ হচ্ছেন মিডলটন, হেবার, জেমস্ ও টারনার। এঁরা সেণ্ট জন চার্চেই অভিষিক্ত হন। কেননা, ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কলকাতায় কোন ক্যাথিড্রাল চার্চ বা বড় গির্জা নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়নি। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ অক্টোবর তারিখে ময়দানে বর্তমান স্থানে অবস্থিত সেণ্ট

পলস্ গির্জার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। কলকাতার এই বড় গির্জাটির স্থপতি ছিলেন ডবলিউ. এন. ফরবস্। গির্জাটি 'ইণ্ডো-গথিক' রীতিতে নির্মিত হয়েছিল। গির্জাটি লম্বায় ২৪৭ ফুট, চওড়ায় ৮১ ফুট ও উচ্চতায় ২০১ ফুট। বিশপ উইলসন ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ অক্টোবর তারিখে গির্জাটির উদ্বোধন করেন।

এবার কলকাতার অন্যান্য গির্জাগুলির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও তালিকা দিচ্ছি—

১। সেণ্ট এন্ড্রুজ গির্জা বা 'স্কটিশ গির্জা'।

গির্জাটি রাইটারস বিলডিং-এর পূর্বদিকে অবস্থিত। যেখানে গির্জাটি অবস্থিত, ওখানেই কলকাতার পুরাতন আদালত ছিল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ নভেম্বর তারিখে গির্জাটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়, এবং ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ মার্চ তারিখে গির্জাটি প্রার্থনাগৃহ হিসাবে সাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ৪,৯০০ টাকা ব্যয়ে একটি ঘড়ি গির্জাটির শীর্ষদেশে স্থাপিত করা হয়।

২। লালবাজারের ব্যাপটিষ্ট চ্যাপেল। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারী তারিখে রামপুরের মিশনারীত্রয় ক্যারী, মারশম্যান ও ওয়ার্ড গির্জাটি স্থাপন করেন।

৩। ৪৩ নং লোয়ার সারকুলার রোডে অবস্থিত ব্যাপটিষ্ট চার্চ। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

৪। ওয়েলেসলী স্কোয়ারের 'ফ্রি চার্চ'। ডঃ আলেকজাণ্ডার ডাফের প্রচেষ্টায় গির্জাটি নির্মিত হয়। নির্মাণের সময় ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জানুয়ারী তারিখের রাতে গির্জাটির ছাদ ধ্বসে পড়ে। তারপর ১, ১৫, ৫৮ টাকা ব্যয়ে গির্জাটি পুনর্নির্মিত করা হয়।

৫। ৯ নং গিরজা গালিব স্ট্রীটে অবস্থিত সেণ্ট টমাস চার্চ। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারী তারিখে উদ্বোধন হয়।

৬। ফোর্ট উইলিয়ামের সেণ্ট পিটারস্ চার্চ। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

৭। আমড়াতলা স্ট্রীটের গ্রীক চার্চ। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। এখন গ্রীক চার্চ কালীঘাটে ২-এ লাইব্রেরী রোডে অবস্থিত।

৮। ৯২ নং লোয়ার সারকুলার রোডে অবস্থিত সেণ্ট টেরেসা চার্চ।

৯। সেণ্ট জেভিয়ারস্ কলেজের মধ্যে অবস্থিত চার্চ।

১০। পার্ক সার্কাসে সৈয়দ আমির আলি অ্যাভেন্যুতে অবস্থিত ক্রাইষ্ট দি কিংগ চার্চ।

১১। ৩নং লেনিন সরণীতে অবস্থিত সেকরেড হার্ট চার্চ। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত।

১২। ১৫১ নং লেনিন সরণীতে অবস্থিত থোবার্ন মেথোডিষ্ট চার্চ।

১৩। ১৮ নং রায় ষ্ট্রীটে অবস্থিত অ্যাসেমব্লী অফ গড চার্চ।

১৪। ১৩৬ নং লেনিন সরণীতে অবস্থিত ইউনিয়ন চ্যাপেল। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত।

১৫। ১৩০ নং লেনিন সরণীতে অবস্থিত সেন্ট্রাল এপিসকোপাল মেথডিষ্ট চার্চ। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত।

১৬। ১৬৬ নং লোয়ার সারকুলার রোডে অবস্থিত সেণ্ট টমাস চার্চ। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত।

১৭। ৫৬-সি সুরেন্দ্র ব্যানারজি রোডে অবস্থিত মেথডিষ্ট চার্চ।

১৮। ৮৫ নং সুরেশ সরকার রোডে অবস্থিত ব্যাপটিষ্ট চার্চ।

১৯। ৫১ নং একবালপুর রোডে অবস্থিত সেন্ট ইগনেটিয়াস চার্চ।

২০। ৬৮ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী রোডে অবস্থিত সেন্ট্ জেভিয়ারস্ চার্চ।

২১। ৩০৮ নং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে অবস্থিত সেন্ট জনস্ চার্চ।

২২। ৯২ নং রিপন ষ্ট্রীটে অবস্থিত সেন্ট মেরী চার্চ।

২৩। ৯ নং মিডলটন রোডে অবস্থিত সেন্ট টমাস প্রেসবিটারী।

২৪। ১৮২ নং বিধান সরণীতে অবস্থিত ক্রাইষ্ট চার্চ। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত। 'কৃষ্ণ বন্দ্যোর গির্জা' নামে পরিচিত। নূতন ভবন ১৮৯৫।

২৫। ৫ নং ডায়মণ্ড হারবার রোডে অবস্থিত সেন্ট স্টিফেনস্ চার্চ।

বাঙালী বৌদ্ধদের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা। বৌবাজার থানা ও পুলিশ কোয়ার্টারের গায়ে নালন্দা পার্কের পূর্বদিকে বৌদ্ধদের এই ধর্মমন্দির অবস্থিত। রাস্তার নাম বুদ্ধিষ্ট টেম্পল স্ট্রীটে (আগের নাম ললিতমোহন দাস লেন)। ভিতরে এক ইতালীয় ভাস্করের নির্মিত মহাস্থবির কৃপাশরণের উপবিষ্ট মূর্তি। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২ জুন চট্টগ্রামের পটীয় থানার উলাইলাপুর গ্রামে কৃপাশরণের জন্ম হয়। শৈশবে পিতার মৃত্যু হয়। মাতা আরাধনা বড়ুয়া পুত্রকে বুদ্ধের চরণে নিবেদন করেন। তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুর ব্রত নেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা স্থাপন করেন।

বৌদ্ধদের অপর এক কেন্দ্র কলেজ স্কোয়ারে অবস্থিত মহাবোধি সোসাইটি। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে অনাগরিক ধর্মপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এদের হলঘরে বহু সভাসমিতির অধিবেশন হয়।

*　　　*　　　*

পার্শীদের ধর্ম মন্দির অবস্থিত ৯১ মেটকাফ স্ট্রীটে। এর দোতলার ঘরে আছে অনির্বাণ অগ্নিশিখা। পার্শীরা এই অনির্বাণ অগ্নিশিখারই উপাসক। পার্শীরা প্রথম ভারতে আসে ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। কলতাতায় এসে তারা প্রথম মন্দির নির্মাণ করে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখে ২৬ নং এজরা স্ট্রীটে। পরে এটা মেটকাফ স্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়। পার্শীদের 'টাওয়ার অভ্ সাইলেনস্' বেলিয়াঘাটা রোডে অবস্থিত।

শিখদের ধর্মকেন্দ্র হচ্ছে গুরুদ্বার শিখ সংগত। এই সংস্থা ১৭২ নং মহাত্মা গান্ধী রোডে অবস্থিত।

*　　　*　　　*

জৈনরা দুই শাখায় বিভক্ত। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। দিগম্বরদের পরেশনাথ মন্দির ১ নং বসাক লেনে (বড়বাজারে) অবস্থিত ও বাগানের ঠিকানা ২৭ নং বেলগাছিয়া রোড। শ্বেতাম্বরদের সুন্দর মন্দির ও বাগান (দশম জৈন তীর্থঙ্কর শীতলনাথের) কলকাতার বিখ্যাত জহুরী বদ্রীদাস প্রতিষ্ঠিত। ২৯ নং বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীটে গৌরীবেড়েতে অবস্থিত। মূল মন্দির বড়বাজারে কটন স্ট্রীটে বসাক লেনে। এটা স্থাপিত হয়েছিল ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে। গৌরীবেড়ের মন্দির স্থাপিত হয় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে, আর বেলগাছিয়ার মন্দির ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে।

ইংরেজরা যখন প্রথম কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করে, তখন কলকাতায় অন্তত দুটো বাজার ছিল। একটা বড়বাজার ও আর একটা সুতানটীর হাট বা হাটখোলার বাজার। এ দুটো বাজারেরই উৎপত্তি ইংরেজদের এখানে আসবার অনেক আগে থেকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে সূচনায় ইংরেজদের আয়-ব্যয়ের খাতায় বড়বাজার নামটা ইংরেজিতে ভাষান্তরিত হয়ে 'গ্রেট বাজার' নামে উল্লিখিত হয়েছে। ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার কালেকটর বেনজামিন বাউচার কলকাতা শহরের একটা জরীপ করিয়েছিলেন। ওই জরীপের প্রতিবেদনে বড়বাজার অঞ্চলটা 'বাজার কলকাতা' নামে অভিহিত হয়েছিল। ওর দক্ষিণে ছিল 'ডিহি কলকাতা' বা 'টাউন কলকাতা', আর উত্তরে সুতানটী গ্রাম। ডিহি কলকাতার দক্ষিণে ছিল গোবিন্দপুর গ্রাম। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দপুর গ্রামেও একটা বাজার স্থাপন করা হয়েছিল। এ ছাড়া, ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে বড়বাজার অঞ্চলে একটা 'নতুন বাজার' খোলা হয়েছিল। তবে 'নতুন বাজার'টা ঠিক কোন জায়গায় খোলা হয়েছিল, তার অবস্থান ইংরেজদের খাতায় পরিষ্কারভাবে লেখা নেই।

এরূপ চিন্তা করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে বড়বাজারের চেয়ে সুতানটীর বাজার আরও পুরানো। এটা সকলেরই জানা আছে যে সরস্বতী নদী শুকিয়ে যাবার পর সপ্তগ্রামের বণিক সমাজভুক্ত শেঠ-বসাকরা এসেই গোগিন্দপুর গ্রামের পত্তন করেছিল। প্রথমে তাদের উদ্দেশ্য ছিল বেতোরের বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করা। গোবিন্দপুরের পাঁচ মাইল উত্তরে বরানগরের তাঁতিদের দিয়ে তারা কাপড় বয়ন করিয়ে, সেই কাপড় বেচত বেতোরের পোর্তুগীজ বণিকদের। বরানগর তখন বাপ্তা কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শেঠরা বরানগরের তাঁতিদের দিয়ে কাপড় তৈরী করিয়ে নিত। তারপর একদল তাঁতি এনে নিজেরাই গোবিন্দপুরে বর্তমান শহীদ মিনারের কাছে একটা বস্ত্র বয়নের কারখানা স্থাপন করে। গোড়া থেকেই এরা গোবিন্দপুরের এক ক্রোশ উত্তরে হাটতলায় সুতার লুটি কেনাবেচা করত। সেজন্যই ওই জায়গাটার নাম হয় 'সুতালুটি', ও হাটতলার নাম 'হাটখোলা'। প্রতি শনিবার এখানে হাট বসত।

সমসাময়িককালে আর দুটো বাজারের উদ্ভব হয়েছিল। একটা রাধাবাজার ও আর একটা লালবাজার। এ দুটা বাজারের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী চালু আছে তা হচ্ছে—শেঠেরা জাঁকজমক করে লালদিঘিতে দোলযাত্রা করত। লাল দিঘির উত্তরে ও দক্ষিণে দুটো দোলমঞ্চ স্থাপন করা হত। দক্ষিণের দোলমঞ্চে স্থাপন করা হত গোবিন্দজীকে। আর উত্তরের দোলমঞ্চে রাধারাণীকে। আবীর বিক্রির জন্য এখানে বসত একটা বাজার। সেই বাজারই পরবর্তীকালে রাধাবাজার নামে খ্যাত হয়েছিল। আর সন্নিকটে শেঠদের কর্তা লালমোহন শেঠ একটা বাজার স্থাপন করেছিল। সেটাই লালবাজার নামে খ্যাত। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ওই বাজার বর্তমান ছিল। পরে বাজারটা উঠে যায়। এখন শুধু নামটাই আছে।

১৭৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এক বিবরণী থেকে আমরা জানতে পারি যে তখন সুতানটীর

হাট সপ্তাহে দুদিন বসত—প্রতি বৃহস্পতিবার ও রবিবার। যে সকল পণ্য সুতানটীর বাজারে বিক্রয় হত ও তা থেকে শুল্ক তোলা হত সেগুলি হচ্ছে—(১) কড়ি, (২) সূতা, (৩) ঔষধ বা ভেষজ, (৪) সরষে প্রভৃতির তেল, (৫) লোহালক্কড়, (৬) তেওর (tyer) বা কলাই, (৭) দুধ, (৮) তালের গুড় (৯) মিঠাই, (১০) লোহার জিনিষ, (১১) রূপার জিনিষ, (১২) পান, (১৩) ফলমূল, (১৪) গাছ, (১৫) তাঁতের কাপড়, (১৬) নুন, (১৭) চাউল, (১৮) মাংস, (১৯) ধনে মশলা, (২০) চুন, (২১) তামাক, (২২) জ্বালানি কাঠ, (২৩) খড় বিচালি, (২৪) মাদুর, (২৫) বাঁশ, (২৬) কাঁসার জিনিয, (২৭) সুপারি, (২৮) শাক-সবজি, (২৯) আখ, (৩০) কলা, (৩১) তেঁতুল, (৩২) মাছ, (৩৩) সিদ্ধ চাউল, (৩৪) হাঁড়িকলসি, (৩৫) কাপড় ও (৩৬) জুতা।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় ৩৩টা পুলিশ থানা ছিল। এই সকল থানার নামগুলির মধ্যেও কতকগুলি বাজারে নাম পাওয়া যায়। থানাগুলির নাম হচ্ছে—১। আরমেনিয়ান চার্চ, ২। ওল্ড ফোর্ট, ৩। চাঁদপাল ঘাট, ৪। লালদীঘির দক্ষিণ দিক, ৫। ধর্মতলা, ৬। ওল্ড কোর্ট হাউস, ৭। ডোমতলা, ৮। আমড়াগলি, ৯। পঞ্চাননতলা, ১০। চীনাবাজার, ১১। চাঁদনীচক, ১২। তুরুলবাজার, ১৩। গৌমাপুকুর, ১৪। চড়কডাঙ্গা, ১৫। সিমলাবাজার, ১৬। নুনলঙ্কাবাজার, ১৭। মলঙ্গা, ১৮। পটলডাঙ্গা, ১৯। কুবেরডাঙ্গা, ২০। বৈঠকখানা, ২১। শ্যামপুকুর, ২২। শ্যামবাজার, ২৩। পদ্মপুকুর, ২৪। কুমারটুলী, ২৫। জোড়াসাঁকো, ২৬। মেছুয়াবাজার, ২৭। জানবাজার, ২৮। ডিঙ্গাভাঙ্গা, ২৯। সুতানটী-হাটখোলা, ৩০। দয়েহাটা, ৩১। হাঁসপুকুরিয়া, ৩২। কলিঙ্গা, ৩৩। জোড়াবাগান। এই তালিকা থেকে যে বাজারগুলির নাম আমরা পাই, সেগুলি হচ্ছে—১। চীনাবাজার, ২। চাঁদনীচক, ৩। তুরুলবাজার, ৪। সিমলাবাজার, ৫। নুনলঙ্কাবাজার, ৬। শ্যামবাজার, ৭। মেছুয়াবাজার, ৮। জানবাজার, ৯। সুতানটী-হাটখোলা বাজার ও ১০। দয়েহাটা। লক্ষণীয় এখানে শোভাবাজারের নাম নেই। না থাকাই স্বাভাবিক, কেননা তখন শোভাবাজারের জন্ম হয় নি। তখন ওই অঞ্চলের নাম ছিল রাসপল্লী, শোভাবাজারের জন্ম হয় ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা নবকৃষ্ণদেব 'মহারাজ বাহাদূর' উপাধি ও ছ'হাজারী মনসবদারের পদ পাবার পর। সেজন্য ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের এক তালিকায় আমরা প্রথম শোভাবাজারের নাম পাই। ওই তালিকায় কলকাতার মোট ১৮টি বাজারের নাম পাই। এই ১৮টি বাজার হচ্ছে (১) হাটখোলার বাজার, (২) সুতানটি বাজার, (৩) বড়বাজার, (৪) রামবাজার, (৫) সিমলাবাজার, (৬) চার্লসবাজার, (৭) বৈঠকখানা, (৮) আরকলি বাজার, (৯) শোভাবাজার, (১০) জানবাজার, (১১) ধর্মতলা বাজার, (১২) কলুটোলা বাজার, (১৩) মেছুয়াবাজার, (১৪) কলিঙ্গ বাজার, (১৫) জননগর বাজার, (১৬) রাজানগর বাজার, (১৭) লালবাজার ও (১৮) বৌবাজার। বাজারগুলি সবই ইজারা দেওয়া ছিল, এবং ওই তালিকায় ইজারা গ্রহীতাদের নামও দেওয়া আছে। একমাত্র শোভাবাজারের ক্ষেত্রে কোন গ্রহীতার নাম নেই। সেজন্য মনে হয় শোভাবাজার তখন সবেমাত্র হয়েছে, এবং তখনও কোনও গ্রহীতার আবির্ভাব ঘটেনি। আরও এক কথা, ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের তালিকায় আমরা শ্যামবাজারের নাম পাই। কিন্তু ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের তালিকায় এর কোন উল্লেখ নেই।

শ্যামবাজারের ক্রমিকতা বর্তমান কাল পর্যন্ত চলে এসেছে। সুতরাং ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এটা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, এরূপ অনুমান করবার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। তবে কি এটা 'রামবাজার' বা 'চার্লসবাজার' এরূপ কোন নামের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিল?

এর পরে আমরা কলকাতার বাজারসমূহের নাম জানতে পারি ১৭৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে লেফটানেন্ট-কর্নেল মার্ক উডের অঙ্কিত নকসার ভিত্তিতে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম বেইলী কর্তৃক প্রকাশিত কলকাতা শহরের মানচিত্র থেকে। এই মানচিত্র থেকে আমরা কলকাতার যে সকল বাজারের নাম পাই, সেগুলি হচ্ছে (১) শ্যামবাজার, (২) বাগবাজার, (৩) শোভাবাজার, (৪) সুতালুটি-হাটখোলা বাজার, (৫) রাজা নবকৃষ্ণের বাজার, (৬) বড়বাজার, (৭) মেছুয়াবাজার, (৮) টিরেটার বাজার, (৯) শোরবোরন-এর বাজার, (১০) শর্টস বাজার, (১১) রাধাবাজার, (১২) চীনাবাজার, (১৩) চাঁদনী চক, (১৪) বৌবাজার, (১৫) তালপুকুর বাজার, (১৬) কলিঙ্গ বাজার, (১৭) মুরগীহাটা, (১৮) জানবাজার, (১৯) বনবাজার, (২০) ফেনউইকস বাজার ও (২১) রুইহাটা। এ ছাড়া, ওই মানচিত্রে গরানহাটার নামও আছে। নাম থেকেই প্রকাশ পায় যে ওই অঞ্চলে এক সময় গরানখুঁটির ব্যবসা চালু ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে চীনাবাজারে মৈশনারী জিনিষপত্তরই বিক্রি হত। চীনাবাজারের দোকানদাররা অধিকাংশই বাঙালী ছিল। তারা সততার ধার ধারতো না। চীনাবাজারের এই সকল দোকানদারদের আচরণ সম্বন্ধে সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন অ্যাটর্নি উইলিয়াম হিকি এক বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—' স্ত্রীর একদিনের বাজার করার অভিজ্ঞতার কথা আমার মনে আছে। জনৈকা বন্ধুপত্নীর সঙ্গে তিনি একদিন কলকাতার চীনাবাজারে বাজার করতে গিয়েছিলেন। চীনাবাজারে তখন বাঙালীদের অনেক দোকান ছিল। বাজারে গিয়ে তাঁর সঙ্গিনী একটির পর একটি দোকান ঘুরে জিনিষপত্র একেবারে তছনছ করে ফেললেন, কিন্তু একটি পয়সারও কিছু জিনিষ কিনলেন না। দোকানদাররা অত্যন্ত বিরক্ত হল। শার্লত (উইলিয়াম হিকির স্ত্রী) আদৌ খুশি হন নি। অবশেষে দোকানদারদের কাছে সম্মান বাঁচাবার জন্য শার্লত কয়েকটি বিলাতী রিবন কেনেন। ব্যাপারটা আমি কিছুদিন পরে জানতে পারলাম, যখন ব্যবসায়ী গোপীদের তরফ থেকে অ্যাটর্নি হ্যামিলটন চিঠি লিখে জানালেন যে দু টুকরা রিবনের জন্য তাঁর ক্লায়েন্টের বত্রিশ সিক্কা টাকা অবিলম্বে আমাকে দিতে হবে, আরও পাঁচ টাকা তাঁর চিঠির খরচ সহ। তা না দিলে সুপ্রিম কোর্টে ওই টাকার জন্য আমার বিরুদ্ধে মামলা করা হবে।' তৎকালীন চীনাবাজারের আরও যে সব বাঙালী দোকানদারদের নাম আমরা জানি তাঁরা হচ্ছেন রেজকিওয়ালা বিপিন বিহারী রায়, ক্যাবিনেট বিক্রেতা কালীপ্রসাদ মুখুয্যে, পাঞ্চ-হাউসের মালিক কৃষ্ণদত্ত, পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবসায়ী কালাচাঁদ ঠাকুর, হুঁকোওয়ালা ভগবতী চরণ ঘোষ ও মিষ্টান্ন বিক্রেতা রামচন্দ্র দাস। এ ছাড়া চিল বাঙালীদের ভাল ভাল বইয়ের দোকান। এ সকল দোকানে পাওয়া যেত সদ্য প্রকাশিত বিদেশ থেকে আনীত ইংরেজি সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বই। রামগোপাল ঘোষের পিতা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষেরও চীনাবাজারে একটি বইয়ের দোকান ছিল। পরবর্তীকালে চীনাবাজারের এক বিখ্যাত বই আমদানীকারক ছিল সুর অ্যাণ্ড কোম্পানি। এটা এখনও জীবিত আছে।

বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিং-এর পিছনে লায়ন্স রেঞ্জ ও ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্রেস-এর মধ্যবর্তী যে স্থানে জেমস ফিনলে কোম্পানির অফিস আছে, ওখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে একটা থিয়েটার ছিল। ওই থিয়েটারটা ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল। তখন গোপীমোহন ঠাকুর ওই থিয়েটার বাড়ীটা ও তার আশপাশের জমিগুলা কিনে নিয়ে ওখানে একটা বাজার স্থাপন করেন। তার নামকরণ হয়েছিল নূতন চীনাবাজার। সেজন্যই রয়েল এক্সচেঞ্জ প্রেসের (বর্তমান ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেসের আগের নাম) নাম ছিল 'নিউ চীনাবাজার স্ট্রীট'। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে রয়েল এক্সচেঞ্জের বাড়ী তৈরীর সময় পর্যন্ত এর নাম 'নিউ চীনাবাজার স্ট্রীট'-ই ছিল। এই নাম অতীতে গোপীমোহন ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বাজারের স্মৃতি বহন করত। ওই বাজারের গায়ে অবস্থিত এক মাঠে নিমগাছের তলায় কলকাতার প্রথম শেয়ার বাজার বসত।

কলকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় আরও অনেক বাজার স্থাপিত হয়। এমন কি ১০০/২০০ গজের ব্যবধানে একাধিক বাজারের অস্তিত্বও আমাদের নজরে পড়ে। এ পরিস্থিতিটা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকেই উদ্ভুত হয়েছিল। কেননা, ধর্মতলা-চৌরঙ্গীর মোড় থেকে চাঁদনী চকের মধ্যে তিনটা বাজার ছিল, যথা শোরবরণ বাজার, চাঁদনী চক ও চৌরঙ্গীর বাজার। চৌরঙ্গীর বাজারকে অনেকে ধর্মতলার বাজারও বলত। তিনটা বাজারই অবশ্য বেশ বড় রকমের বাজার ছিল। চাঁদনী চক তো এখনও বিদ্যমান আছে। শোরবরণ বাজার লুপ্ত হয়ে গেছে। এটার অবস্থান ছিল চাঁদনী চকের কিছু পশ্চিমে, বর্তমান 'ষ্টেটস্‌ম্যান হাউস' ও ধর্মতলা স্ট্রীটের অন্তর্বর্তী জায়গায়। আর চৌরঙ্গীর বাজার ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নীলামে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। এর বিবরণ আমরা সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে জানতে পারি। এই বাজারটা বিক্রয়ের জন্য ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ এপ্রিল তারিখে নীলামদার টুলো অ্যাণ্ড কোম্পানি একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। ওই বিজ্ঞাপন থেকে আমরা জানতে পারি যে, যে জমির ওপর বাজারটা অবস্থিত ছিল তার আয়তন ছিল নয় বিঘা। ওই বাজারে ২০৭টি পাকা দোকান ঘর, ১৪৩টা পাকা খিলানযুক্ত দোকান ঘর ও ৩৬টা খুব বড় কাঁচা গুদাম ঘর ছিল। আমরা আরও জানতে পারি ওই বাজার থেকে মাসিক ১০৪৩ টাকা ভাড়া আদায় হত। তৎকালীন মুদ্রামানের দিক থেকে এ টাকা কম নয়। বাজারের চৌহদ্দী সম্বন্ধে ওই বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল যে এটি "bounded by General Shibbert's house on the east, by the Dhurrmtolah Road to the north, by the Chowringhee Road to the west, and by the Jaun Bazar Road to the south". তার মানে, বাজারটার পূর্ব দিকে ছিল জেনারেল শিবারটের বাড়ী, উত্তর দিকে ছিল ধর্মতলা রোড, পশ্চিম দিকে ছিল চৌরঙ্গী রোড ও দক্ষিণে জানবাজার রোড (বর্তমান সুরেন্দ্র ব্যানার্জি রোড)। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পাথুরিয়াঘাটার যদুলাল মল্লিক এ বাজারটা কিনে নিয়েছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে আমরা সমসাময়িক পত্রিকা থেকে গঙ্গার ধারে হাটখোলার কাছে একটা বাজারের নাম শুনি, যার নাম ছিল 'সুরের বাজার'। খুব সম্ভবত এ বাজারটা হাটখোলার ধনী পরিবার (যদের বাড়ীতে দুর্গাপূজায় ১০৮টা মহিষ বলি হত)

সুরেদের বাজার ছিল। এই সময় 'পোস্তা' বন্দী করে ষ্ট্রাণ্ড রোডটা তৈরী হয়েছিল, এবং পোস্তার বাজারেরও উদ্ভব ঘটেছিল।

আগে উল্লিখিত বাজারসমূহ ছাড়া, আরও একটা বাজারের নাম আমরা সমসাময়িক পত্রিকা থেকে পাই। সেটা হচ্ছে ঠনঠনিয়া বাজার। জানবাজারে যে একটা বাজার ছিল, তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ মার্চ তারিখের সংবাদপত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানবাজারে পশুপক্ষী ও মাংস বিক্রির জন্য আর একটা বাজার তৈরী হবে, এবং এ বাজারটা স্থাপনের জন্যে যে টাকার প্রয়োজন হবে তা ৩০০ অংশে বিভক্ত হয়ে সংগৃহীত হচ্ছে। এর অংশীদারদের মধ্যে মিষ্টার বেলী, স্যার চার্লস মেটকাফ ও কলকাতার সওদাগরী অফিসসমূহের অন্যান্য সাহেবদের নামের উল্লেখ ছিল। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের এক গেজেটিয়ার থেকে আমরা তৎকালীন বাজারগুলির নাম পাই। তবে সে সব বাজারের অধিকাংশই এখন উঠে গেছে। বাজারগুলির নাম—এণ্টালি সাউথ রোডে অবস্থিত আরমেনিয়ান বাজার, বালিগঞ্জ বডিগার্ড লাইনের উত্তরে বালিগঞ্জ কা হাট, বাগবাজারে বাগবাজার, পদ্মপুকুর-এন্টালির দক্ষিণ-পূর্বকোণে বীরু শীলের বাজার, বৌবাজার স্ট্রীটের দক্ষিণে বিশ্বনাথ মতিলালর বাজার, বৈঠকখানা গির্জার দক্ষিণে বৈঠকখানার বাজার, ৬০ নং বৌবাজার স্ট্রীটে বৌবাজার, ৩৪৪ নং চিৎপুর রোডে বোষ্টমচরণ মল্লিকের বাজার, ১৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীটে চাঁদনি চক বাজার, গার্ডেনরীচে কর্ণেল পীয়ার্সের বাজার, কলিঙ্গের পশ্চিমে চাউলহাট্টাতে কলিঙ্গ বাজার, সিমলার কলভিন বাজার, মৌলালীর উল্টো দিকে দেবনারায়ণ দাসের বাজার, খিদিরপুরে দেওয়ান গোকুল ঘোষালের বাজার, ১নং ধর্মতলা স্ট্রীটে ধর্মতলা বাজার, হাড়িয়াবাগানের পূর্ব দিকে ফেনউইক বাজার, ফৌজদারী বালাখানার বাজার, ৩৩ নং চিৎপুর রোডে গোপাল মল্লিকের বাজার, ধর্মতলা ও জানবাজারের মাঝখানে গোপীবাবুর বাজার, ভবানীপুর রোডের উল্টো দিকে গঙ্গানারায়ণ সরকারের বাজার, পটলডাঙ্গায় হাজী কারবালাইয়ের বাজার, জানবাজার, ১৩ নং লোয়ার সারকুলার রোডে কাশী মল্লিকের বাজার, ৩৩৩ নং চিৎপুর রোডে লালবাবুর বাজার, ২০৯ নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে মেছুয়াবাজার, কলেজ স্কোয়ারের পশ্চিমে মাধববাবুর বাজার, আপার সারকুলার রোডে মুনশী আমিলুদ্দিনের বাজার। মাধববাবুর বাজার এই সময়েই স্থাপিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কলুটোলার অন্যতম ধনকুবের মাধবচন্দ্র দত্ত। তিনি ও কলুটোলার অপর ধনকুবের মতিলাল শীল (উভয়েই সুবর্ণবণিক সমাজের লোক) কলুটোলা অঞ্চলে ড্রেন তৈরী করে দিয়েছিলেন। মাধববাবুর বাজার বিংশ শতাব্দীর বিশের দশক পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। ওই বাজারটা ভেঙেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ বিল্ডিং তৈরী করা হয়েছে।

উনিশ শতকে বিশ্বনাথ মতিলাল বৌবাজার অঞ্চলে একাধিক বাজার স্থাপন করেছিলেন। তার মধ্যে একটা বাজার স্থাপিত হয়েছিল, আজ যেখানে 'কোলে মার্কেট' অবস্থিত। কোলে মার্কেট বিংশ শতাব্দীতে নফর কোলের ছেলে ভূতনাথ কোলে স্থাপন করে। পাইকারী তরিতরকারি বিক্রয়ের জন্য এটা এখন কলকাতার সবচেয়ে বড় বাজার। কাছাকাছি আর দুটো বাজার আছে। একটা বৈঠকখানার বাজার ও আর একটা শিয়ালদহের বাজার।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে দুটো বাজার ছিল। একটা মানিকতলা

স্ট্রীটের কাছে চন্দ্র মুখার্জির বাজার ও আর একটা চাঁপাতলা সেকেণ্ড লেনের কাছে চাঁপাতলার 'নতুন' বাজার। সমসাময়িক কালেই ভবানীপুরে যদুবাবুর বাজার (এখন বিকৃত হয়ে জগুবাবুর বাজার হয়েছে) স্থাপিত হয়। ওখানে আগে একটা প্রকাণ্ড বাগানবাড়ী ছিল, সেটা রানী রাসমণি কিনে তাঁর দৌহিত্র (রানী রাসমণির দ্বিতীয় কন্যা কুমারী দাসীর ছেলে) যদুনাথ চৌধুরীকে দান করেন। তিনিই ওখানে একটা বাজার বসান।

একটা বাজার বেলেঘাটায় ছিল, নাম পামার বাজার। এটা ক্যাপটেন ফ্রাঙ্ক পামার স্থাপন করেছিলেন। ওরই নিকটে এখন আছে মুনশী বাজার। খিদিরপুরেও কয়েকটা বাজার ছিল, যথা কুলীবাজার, অরফানগঞ্জ বাজার প্রভৃতি। গড়িয়াতেও একটা বাজার ছিল, যা থেকে গড়িয়াহাটার নাম হয়েছে।

কলকাতার বাজারসমূহের ইতিহাসে এক নূতন পর্ব শুরু হয় যখন ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী তারিখে প্রথম মিউনিসিপাল মার্কেট খোলা হয়। কলকাতার অভিজাত পল্লী চৌরঙ্গীর লিণ্ডসে স্ট্রীট ও বার্টরাম স্ট্রীটের সংযোগ স্থলে একটা স্থাপিত হয়। নূতন বাজার বলে এটাকে 'নিউ মার্কেট' বলা হত। (এখনও বলা হয়)। কিন্তু ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২ ডিসেম্বর থেকে এর নামকরণ করা হয় 'স্যার স্টুয়ার্ট হগ মার্কেট। স্যার স্টুয়ার্ট হগ ছিলেন করপোরেশনের চেয়ারম্যান (১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ৫ এপ্রিল থেকে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ নভেম্বর পর্যন্ত)। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে হগ মার্কেটের বিস্তৃতিকরণ করা হয়। তারপর থেকে করপোরেশন আরও নয়টা বাজার স্থাপন করেছে। এ নয়টা বাজার হচ্ছে—(১) সার চার্লস অ্যালেন মার্কেট, চিৎপুর রোড (রবীন্দ্র সরণী) ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত, (২) কলেজ স্ট্রীট মার্কেট (১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত), (৩) এনটালী মার্কেট (১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত), (৪) লেক রোড মার্কেট (১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত), (৫) পার্ক সার্কাস মার্কেট (১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত), (৬) গড়িয়াহাট মার্কেট (১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত), (৭) নিউ আলিপুর মার্কেট (১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত), (৮) মানিকতলা মার্কেট (১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত), (৯) বাঁশদ্রোণী বাজার।

এই নয়টা মিউনিসিপাল মার্কেট ছাড়া, কলকাতায় বর্তমানে যে সব প্রাইভেট মার্কেট আছে, তাদের নাম যথাক্রমে—(১) বরানগর বাজার, (২) সিঁথির বাজার, (৩) দমদম বাজার, (৪) সাতপুকুর বাজার, (৫) চিৎপুর বিবি বাজার, (৬) চুনীবাবুর বাজার, (৭) আশুবাবুর বাজার, (৮) ইন্দ্র বিশ্বাস রোডের বাজার, (৯) শ্যামবাজার, (১০) অমিয়বাবুর বাজার, (১১) বাগবাজার, (১২) হাতিবাগান বাজার, (১৩) হরি সাহার বাজার, (১৪) উল্টাডাঙ্গা বাজার, (১৫) বাগমারী বাজার, (১৬) শোভাবাজার, (১৭) কাঁকুড়গাছির বাজার, (১৮) মানিকতলার সরকার বাজার, (১৯) রানী রাসমণির বাজার, (২০) বেনিয়াপুকুর বাজার, (২১) ফুলবাগান বাজার, (২২) মুচিবাজার, (২৩) ফেনউইক বাজার, (২৪) মুনশীর বাজার, (২৫) ধাপার বাজার, (২৬) জয় হিন্দ বাজার, (২৭) টেরেটি বাজার, (২৮) বেলেঘাটার বাজার, (২৯) ঘোষবাগান বাজার, (৩০) ফুলবাগান বি সরকারের বাজার, (৩১) মল্লিক বাজার, (৩২) সুকিয়া স্ট্রীটের বাজার, (৩৩) সাতুবাবুর বাজার, (৩৪) মানী মার্কেট, (৩৫) রাজাবাজার, (৩৬) শিয়ালদহ বাজার, (৩৭) বৈঠকখানা বাজার, (৩৮) নেবুতলার বাজার, (৩৯) কোলে বাজার, (৪০) নতুন বাজার,

(৪১) বর্মণ মার্কেট, (৪২) বড়বাজার, (৪৩) বৌবাজার, (৪৪) পোস্তার বাজার, (৪৫) চেতলার বাজার, (৪৬) কালীঘাটের বাজার, (৪৭) চেতলার C.I.T. মার্কেট, (৪৮) ক্ষীরোদ ঘোষের বাজার, (৪৯) সাদার্ন মার্কেট, (৫০) থিয়েটার রোডের এয়ারকনডিশনড্ বাজার, (৫১) কুলীবাজার, (৫২) কেওড়াতলা শ্মশান বাজার, (৫৩) ল্যান্সডাউন মার্কেট, (৫৪) খিদিরপুর বাজার, (৫৫) বেহালা বাজার, (৫৬) চারু বাজার, (৫৭) যদুবাবুর বাজার, (৫৮) টালিগঞ্জ বাজার, (৫৯) আনন্দ পালিত রোডের বাজার, (৬০) চাঁদনীর বাজার, (৬১) জানবাজার। এ ছাড়া, আরও ১০০টা বাজার আছে। সবগুলোর নাম দেওয়া সম্ভবপর নয়। তবে এখানে উল্লেখ করবার মত একটা কথা আছে। কলকাতার কোন কোন বাজার বাঙালীর হাত থেকে অবাঙালীর হাতে চলে যাচ্ছে। যেমন বাগবাজার। আগে এটা কাঞ্চনপুর এষ্টেটের হাতে ছিল। এখন অবাঙালী 'মোদী'-দের হাতে, পাশের সমস্ত জমিগুলোও চিৎপুর রোডের মোড় পর্যন্ত হালওসিয়াদের হাতে গেছে।

কতকগুলো জায়গায় বিশেষ রকমের পণ্য বিক্রয় হয়। সেগুলোকে সেই সেই জিনিষের বাজার বলা যেতে পারে। যেমন প্রতিমা তৈরী ও বিক্রি হয় কুমারটুলীতে। ছানা বিক্রি হয় সাতুবাবুর বাজারে। অগে বৌবাজারের মোড়েই ছানাপটি ছিল কিন্তু আজকাল ওখানে ছানার দোকান ক্রমশ হ্রাস পেয়ে আসছে। ক্ষীর পাওয়া যায় নতুন বাজার ও বড়বাজারে। চিনির বিক্রয় কেন্দ্র হচ্ছে বড়বাজার চিনিপটীতে। সোনারূপা বিক্রি হয় সোনাপটীতে। মেয়েদের অলঙ্কার নানা জয়গায় পাওয়া যায়, বিশেষ করে বৌবাজার অঞ্চলে। মেয়েদের শাড়ীও পাওয়া যায়, তবে নানা জায়গায়, ময়দান মার্কেটে, বিধান সরণীতে, গড়িয়াহাট রোডের মোড়ে, ঘড়ি বিক্রি হয় রাধাবাজার ও ডালহাউসী স্কোয়ার (বি-বা-দি বাগ) অঞ্চলে। কাগজ ও ষ্টেশনারী জিনিস রাধাবাজারে। কাঁচ সোয়ালো লেনে। নানারকম আমদানীকৃত জিনিষ আগে বিক্রি হত মুরগীহাটায় ও দিল্লীপটীতে। এখন আমদানীকৃত জিনিষ হ্রাস পাওয়ায় এরা হরেকরমক জিনিষ বিক্রি করে। তবে এখন ওসব জিনিষ বিক্রির দোকানসমূহ কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে ওখানকার বাগরী মার্কেটে। তুলা বিক্রি হয় তুলাপটীতে। কাপড় বিক্রি হয় সদাসুখ কাবরা ও বড়বাজারে। ফুল ও ফুলের মালা ফুলপটীতে। কাঠের ফারনিচার বৌবাজার ও শিয়ালদহে। আগে কাঠের খাট তৈরী ও বিক্রি হত এন্টালিতে। দোকানগুলো এখন স্থানান্তরিত হয়েছে আরও দক্ষিণে সি. আই. টি. রোডে। লোহালক্কড় বিক্রি হয় দর্মাহাটায় ও স্যানিটারী জিনিষ কলেজ স্ট্রীটে। পুরানো লোহালক্কড় বিক্রি হয় ঠনঠনিয়া ও মানিকতলায়। পুরানো মোটর পার্টস মল্লিক বাজারে। কাঠ বিক্রি হয় নিমতলায়। মশারী বিক্রি হয় চিৎপুর মশারীপটীতে ও চাঁদনীতে। বাদ্যযন্ত্র বিক্রি হয় চিৎপুরে লালবাজারের কাছে। বই বিক্রি হয় কলেজ ষ্ট্রীটে ও গরাণহাটায়। শেয়ার বিক্রি হয় ষ্টক এক্সচেঞ্জে। পাট ও চটের কেনাবেচা হয় জুট ও হেসিয়ান এক্সচেঞ্জে। চায়ের কেনাবেচা হয় মিশন রো-তে চায়ের নীলাম ঘরে। আর টাকার বাজার ছড়িয়ে আছে শহরের ব্যাঙ্কসমূহে।

তবে শহরের ফুটপাতসমূহে এখন সব জিনিষই পাওয়া যায়, এবং ফুটপাতগুলোর দিকে তাকালে মনে হবে যে এ শহরটা একটা বিরাট বাজারে পরিণত হয়েছে। ফুটপাত ও রাস্তাজুড়ে সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বাজার বসে রয়েছে।

# ৩০ কলকাতার হাসপাতাল ও চিকিৎসালয়

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তাবিত হয়ে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কলকাতায় মেডিকেল কলেজের উদ্বোধন হয়। তা থেকে অনেকেরই ধারণা হতে পারে যে তার আগে কলকাতায় কোন হাসপাতাল ছিল না। কলকাতায় দুটো হাসপাতাল ছিল, একটা সাহেবদের জন্য ও আর একটা দেশীয় লোকদের চিকিৎসার জন্য। সাহেবদের জন্য হাসপাতাল প্রথম স্থাপিত হয়েছিল ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে। ওই সময় কোম্পানির গোরা সৈন্য ও জাহাজের নাবিকদের মধ্যে মড়কের বহর দেখে বর্তমান গারষ্টিন প্লেসে কলকাতার প্রাচীন কবরখানার ঠিক পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একটা হাসপাতাল স্থাপন করা হয়। এটা মাত্র সাহেবদের চিকিৎসার জন্য সংরক্ষিত ছিল, যদিও এই হাসপাতাল সাহেব ও দেশীয় জমিদার ও ব্যবসায়ীদের চাঁদায় কোম্পানির বকসী মিঃ আদামের তদারকে নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু এর চিকিৎসা পদ্ধতি অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। এর চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটান লিখে গেছেন—'কলকাতায় কোম্পানির একটা ছোটখাটো সুন্দর হাসপাতাল আছে। সেখানে অসুস্থতার জন্য অনেকেই যায়, কিন্তু অল্পলোকই সেখানকার চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে বলবার জন্য সেখান থেকে ফিরে আসে।' পরে এর নামকরণ করা হয়েছিল 'প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতাল'। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এই হাসপাতালটিকে ভবানীপুরে স্থানান্তরিত করা হয়। 'প্রেসিডেনসী জেনারেল হসপিটাল' নামেই এটা ইংরেজ আমলে পরিচিত ছিল। পরে এর নামকরণ করা হয় 'শেঠ সুখলাল কারনানি হাসপাতাল'। কিন্তু সাধারণের কাছে এটা পি. জি. হাসপাতাল নামে পরিচিত। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এই হাসপাতালের গবেষণাগারে রোনালড্ রস আবিষ্কার করেন মশকের দ্বারা ম্যালেরিয়া কিভাবে সংক্রমিত হয়।

তারপর পুরা ৮৫ বছর কেটে যাবার পর কলতায় দেশীয় লোকদের চিকিৎসার জন্য প্রথম হাসপাতাল স্থাপিত হয়। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে এটা স্থাপিত হয়েছিল। (কিন্তু কাজ আরম্ভ হয়েছিল ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে), এবং এর নামকরণ করা হয়েছিল 'A hospital for the relief of natives requiring the assistance of surgeons'. এই হাসপাতাল পরিচালনের ভার সাহেব ও দেশীয় লোক নিয়ে গঠিত এক কমিটির উপর ন্যস্ত হয়েছিল। আটাশ জন লোকের অর্থানুকূল্যে এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। গভর্ণর-জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস তিন হাজার টাকা দিয়েছিলেন। গঙ্গানারায়ণ দাস ও কৃষ্ণকান্ত সেন নামে দুই বাঙালী প্রত্যেকে পাঁচশ টাকা করে দান করেছিলেন।

তবে সেকালে এদেশীয় লোকেরা বিলাতী ওষুধ খেত না। খুব কম লোকই সাহেব ডাক্তার দেখাত। মধ্যবিত্ত ইংরেজদেরও সেই দশাই ছিল। সেকালের ইংরেজ ডাক্তাররা পালকী চেপে রোগী দেখতে আসতেন। ডাক্তারের ভিজিট ছিল এক সোনার মোহর। যদি কোন বাড়ীতে একাধিক রোগী থাকত তা হলে প্রত্যেক রোগীর জন্য স্বতন্ত্র দর্শনী দিতে হত। ওষুধের দামও অত্যধিক ছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর আমলে কোম্পানি সুবিধা দরে ওষুধ বিক্রির জন্য পুরানো কেল্লার মধ্যে একটা ডাক্তারখানা খুলেছিল। কিন্তু

সেখানে কোন কিছু ভেষজ দ্রব্যের ছালের দাম ছিল প্রতি আউন্স তিন টাকা। কোনরূপ বিরেচক শোধিত লবণের মূল্য প্রতি আউন্স এক টাকা। একটা বেলেস্তারার দাম দুই টাকা ইত্যাদি।

দেশীয় লোকদের চিকিৎসার জন্য যে নেটিভ হাসপাতালটি স্থাপিত হয়েছিল, সেটাই পরবর্তীকালে মেয়ো হাসপাতালের রূপ নিয়েছিল। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তাবিত হয়ে, ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এর উদ্বোধন হয়। নেটিভ হাসপাতাল প্রথম স্থাপিত হয় ফৌজদারী বালাখানায় এক ভাড়া বাড়ীতে। কিন্তু বছর দুয়েকের মধ্যেই হাসপাতালটি স্থানান্তরিত হয় ধর্মতলার চাঁদনী চকে। হাসপাতালটি যে গোড়া থেকেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, তা প্রথম দিকের কয়েক বছরের চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা থেকে বুঝতে পারা যায়। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এখানে চিকিৎসিত হয়েছিল ২৪৭ ব্যক্তি, ১৭৯৫ সালে ৪২০ ব্যক্তি, ১৭৯৬ সালে ৪৯৫ ব্যক্তি, ১৭৯৭ সালে ৬১৬ ব্যক্তি, ১৭৯৮ সালে ৬৭৩ ব্যক্তি, ১৭৯৯ সালে ৮২৫ ব্যক্তি, ১৮০০ সালে ২০২৪ ব্যক্তি, ১৮০১ সালে ২৪৪৫ ব্যক্তি, ১৮০২ সালে ৪৯৪৯ ব্যক্তি, ১৮০৩ সালে ৬১১২ ব্যক্তি, ১৮০৪ সালে ৪৩২৮ ব্যক্তি, ১৮০৫ সালে ৪৩৮০ ব্যক্তি, ১৮০৬ সালে ৩৭৪১ ব্যক্তি, ১৮০৮ সালে ৭০৭৮ ব্যক্তি, ১৮০৯ সালে ৮৯২৬ ব্যক্তি, ১৮১০ সালে ৭৩৭৬ ব্যক্তি, ১৮১১ সালে ১১,৭৬৪ ব্যক্তি, ১৮১২ সালে ১২,৮৩২ ব্যক্তি, ১৮১৩ সালে ১৪,৪৬৩ ব্যক্তি, ১৮১৪ সালে ১৩,৭৫৩ ব্যক্তি, ১৮১৫ সালে ১৫,৬৫৯ ব্যক্তি, ১৮১৬ সালে ১৬,৫৩১ ব্যক্তি, ১৮১৭ সালে ২০,৪১১ ব্যক্তি, ১৮১৮ সালে ২৩,৫৬৮ ব্যক্তি, ১৮১৯ সালে ২৮,১৯৩ ব্যক্তি, ১৮২০ সালে ২৯,১৩৭ ব্যক্তি, ১৮২১ সালে ৩২,১৩২ ব্যক্তি, ১৮২২ সালে ৩৯,৭২৬ ব্যক্তি, ও ১৮২৩ সালে ৪১, ১৬৬ ব্যক্তি। একুনে ৩,৫৮,৮৬৫ ব্যক্তি। এই সংখ্যাগুলো সমসাময়িক সংবাদপত্র থেকে নেওয়া হয়েছে।

সেকালের কলকাতায় বসন্ত ও ওলাউঠার প্রকোপই ছিল সবচেয়ে বেশী। কিন্তু ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এই দুই রোগ ছাড়া, এক নূতন রোগের আবির্ভাব হয়। এটা জ্বর রোগ। সমসাময়িক সংবাদপত্রে পড়ি—'মোকাম কলকাতায় সাহেব লোকদের মধ্যে অতিশয় জ্বরে অনেকে মরিয়াছে।' কিন্তু জ্বর মহাশয় শীঘ্রই সাহেবদের ছেড়ে দেশীয় লোকদের ওপরেই হামলা চালালেন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ আগস্ট তারিখের 'সংবাদ চন্দ্রিকা'য় পাড়ি— 'এ স্থানে সর্বসাধারণ জ্বরোৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাবধি কেবল দেশীয় লোক বিনা অন্যের ওপর আক্রমণ করে নাই। প্রথমতঃ সর্বাঙ্গ বেদনা ও অসহিষ্ণু শিরোবেদনার সহিত জ্বরের আরম্ভ হয়, কিন্তু তিন চারদিনের অধিক থাকে না। জ্বর ত্যাগ হইলেও রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ থাকে।' সংবাদপত্রে আরও পড়ি—'শহর কলিকাতায় জ্বররাজ রাজ্য করিবার বাসনায় সমাগমন করিয়াছেন। কিন্তু তাহার সমভিব্যাহারে অধিক সৈন্য নাই। কেবল প্রবল এক সৈন্য আছে যে শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় ক্ষমতাতে অস্থি চূর্ণ করে। তাহাতেই জ্বররাজ অতি সন্তুষ্ট আছেন। ইহার আগমনের তাৎপর্য এই বুঝা যাইতেছে যে পূর্বে ওলাওঠা রোগরাজ এই রাজধানীতে স্বীয় সৈন্য সন্নিপাতাদি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং রাজ্যও বিলক্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার প্রবল প্রতাপে ভীত হইয়া অনেক প্রজা জীবনরূপ রাজস্ব দিয়াছে। তাহাতে নির্দয়তা প্রকাশ হইয়াছিল।

এক্ষণে কালবলে তিনি কালগ্রস্ত হইয়াছেন। অতএব জ্বররাজ বিরাজমান হইয়া স্বীয় শীলতা প্রচারে রাজ্য করিতে আসিয়াছেন। ইহা কিছুদিন স্থিতি হইবে তাহার কারণ এই যে এই নগরে অনেক দেশীয় অনেকের বসতি আছে। সকলে এক্ষণ পর্যন্ত তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই, ক্রমে ক্রমে সাক্ষাৎ করিতেছেন এবং করিবেন।'

এই পটভূমিকাতেই নেটিভ হাসপাতালের সম্প্রসারণ ঘটে। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে 'আউটডোর' রোগীদের জন্য দুটি 'ডিসপেনসারী' খোলা হয়, একটি পার্ক স্ট্রীটের নিকট সুরতীবাগানে (১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে এর নূতন নামকরণ হয় 'রিপন স্ট্রীট ডিসপেনসারী' কিন্তু অর্থাভাবের জন্য ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে এটা তুলে দেওয়া হয়) ও আর একটি শোভাবাজারের নিকট গরাণহাটায় এটাই তুলে দেওয়া হয় এবং ১নং গৌর লাহা স্ট্রীটস্থ জমিটা বিক্রি করে দেওয়া হয়)। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের নেটিভ হাসপাতালের পরিচালকরা বেলিয়াঘাটার কুষ্ঠ আশ্রমটি অধিগ্রহণ করে, কিন্তু ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এর পরিচালন ভার ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটির ওপর ন্যস্ত হয়। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নেটিভ হাসপাতালকে সম্প্রসারিত করা হয় ও ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে চিৎপুরে একটি নূতন ডিসপেনসারী খোলা হয়। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে নেটিভ হাসপাতালের পরিচালকরা মতী ক্যামারূন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত গার্ডেন রীচ ডিসপেনসারীর পরিচালন ভার গ্রহণ করে। কিন্তু ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে এই ডিসপেনসারীটাও তুলে দেওয়া হয়। মেয়ো মেমোরিয়াল ফাণ্ড থেকে ৫০,০০০ টাকা পাবার পর ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বর তারিখে স্ট্রাণ্ড রোডে বর্তমান জমির ওপর মেয়ো হাসপাতাল স্থাপিত হয়।

মেয়ো হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন করেন ভারতের গভর্নর-জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারী তারিখে। এই হাসপাতালের জন্য অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব ছিল ডাঃ ম্যাকনামারার ওপর। একদিন ধর্মদাস সুর শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রনাথ পালকে সঙ্গে নিয়ে ডাঃ ম্যাকনামারার সঙ্গে দেখা করে হাসপাতালের সাহায্যার্থে টাউন হলে ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনয় করার প্রস্তাব দেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ মার্চ তারিখে টাউন হলে নেটিভ হাসপাতালের সাহায্যে ধর্মদাস বাবুর দল কর্তৃক 'নীলদর্পণ' অভিনীত হয়। এখানে উড সাহেবের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও সৈরিন্ধ্রীর চরিত্রে ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর ( যাঁর নামে আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ)। আরও যাঁরা এই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মতিলাল সুর, মহেন্দ্র বসু, অবিনাশ কর, গোপালচন্দ্র দাস প্রমুখ। ১১০০ টাকার টিকিট বিক্রয় হয়েছিল। খরচ বাদে ৭০০ টাকা হাসপাতাল তহবিলে দান করা হয়। ডাঃ ম্যাকনামারা নিজে এই অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। (ইংলিশম্যান' ৩১ মার্চ ১৮৭৩)।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মেয়ো হাতপাতাল স্ট্রাণ্ড রোডে স্থাপিত হবার পর, নেটিভ হাসপাতালের চাঁদনী শাখার নাম রাখা হয় চাঁদনী হাসপাতাল। ওই ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দেরই ফেব্রুয়ারী মাসে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ বাঙলা সরকারের কাছ থেকে সুকিয়া স্ট্রীট ডিসপেনসারীর পরিচালন ভার নেয়। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে এ ডিসপেনসারীটা তুলে দেওয়া হয়।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে  মতী রাজরানী দাসী প্রদত্ত দানের সাহায্যে চাঁদনী হাসপাতাল পুনর্নির্মিত হয়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৬ জুলাই তারিখে তৎকালীন ছোটলাট ৪ ও ৫ নং টেম্পল স্ট্রীটে অবস্থিত পুনর্নির্মিত চাঁদনী হাসপাতালের উদ্বোধন করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১ এপ্রিল তারিখে চাঁদনী হাসপাতালের 'ইনডোর' বিভাগ তুলে দেওয়া হয়। ও ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ৭০,০০০ টাকায় বিক্রী করে দেওয়া হয়। তবে একটা 'আউটডোর' বিভাগ এখনও আছে। বোধ হয়, সপ্তাহে দুদিন এখানে রোগী দেখা হয়।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মেয়ো হাসপাতালে একটি স্বতন্ত্র 'আউটপেসেন্ট' বিভাগ খোলা হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বাগবাজারের প্রখ্যাত ব্যবসায়ী হরিদাস সাহা কর্তৃক প্রদত্ত ২০,০০০ টাকা দানের সাহায্যে চিৎপুর ডিসপেনসারীটি (৬৯৬ রবীন্দ্র সরণী) নূতন ভাবে নির্মিত হয়। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ওখানে নাক, গলা ও কান সম্বন্ধে চিকিৎসার জন্য মেয়ো হাসপাতালের শাখারূপে 'হরিদাস সাহা ইনষ্টিটিউট অভ্ ওটোল্যারিংগোলজী' প্রতিষ্ঠিত হয়।

যে সকল দানশীল ব্যক্তির অর্থানুকূল্যে নেটিভ হাসপাতাল ও তার উত্তরসংস্থা মেয়ো হাসপাতাল পুষ্ট হয়েছে তাদের মধ্যে কয়েক জনের নাম করা যেতে পারে—যোসেফ ও জন ব্যারেটো, রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের পরিবার, মহারাজ যতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার, মেয়ো মেমোরিয়াল ফাণ্ড, রাজা কৃষ্ণদাস লাহার পরিবার, হায়দারাবাদের নিজাম, রেলী ব্রাদারস, প্রিয়নাথ দত্ত, ক্ষেত্রমণি দত্ত, ডবলিউ. সি. বোনারজি, টরনার মরিসনের উইলসন সাহেব, বিলাতের মিষ্টার রস্ হিলডাব্রাণ্ড,  মতী জে. সি. দত্ত,  মতী এন. এন. দে, লীলাবতী দাস প্রমুখরা।

ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রস্তাবিত হয়ে, ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে উদ্বোধন হয়। তখন এর সঙ্গে দুটা হাসপাতাল সংযুক্ত ছিল। একটার নাম 'ওলড ফিভার হসপিটাল' ও আর একটার নাম 'নিউ ফিভার হসপিটাল।' বর্তমান হাসপাতালের (৮৮ নং কলেজ স্ট্রীটে) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখে মারকুস অভ ডালহাউসী কর্তৃক। বাড়িটি তৈরী করে বারন্ অ্যাণ্ড কোম্পানি। এর নির্মাণের জন্য ওল্ড অ্যাণ্ড নিউ ফিভার হসপিটালস্-এর সঞ্চিত অর্থ, লটারী কমিটির তহবিলের অবশিষ্টাংশ ও রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ কর্তৃক ৫০,০০০ টাকা অনুদান ব্যয়িত হয়েছিল। ভূমি দিয়েছিলেন মতিলাল শীল। হাসপাতালটি আনুষ্ঠানিকভাবে খোলা হয় ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ১ ডিসেম্বর তারিখে। মূল হাসপাতালেই মেয়েদের প্রসব ও চিকিৎসার জন্য একটা স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল। পরে হাসপাতালটিতে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় মেয়েদের প্রসব ও চিকিৎসার জন্য হাসপাতালটির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ইডেন হাসপাতাল তৈরী করা হয়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে এর উদ্বোধন হয়। এর সঙ্গে নারস্দের বসবাসের জন্য দুটি অতিরিক্ত ভবনও তৈরী করা হয়। শ্যামাচরণ লাহার অর্থানুকূল্যে উত্তর-পূর্বদিকে একটি চক্ষু হাসপাতালও নির্মিত হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে  মতী এজরার অর্থানুকূল্যে ইহুদীদের চিকিৎসার জন্য মূল হাসপাতালের উত্তরে একটি নূতন বিল্ডিং তৈরী করা হয়। প্রিন্স অভ্ ওয়েলস্ এর নামে আর একটি নূতন ওয়ার্ডও তৈরী করা হয়। আরও পরে রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিকের

অর্থানুকূল্যে পশ্চিমদিকে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যুর ওপর একটি নূতন ভবন তৈরী করা হয়। বিংশ শতাব্দীর ৩০-এর দশকে স্যার জন অ্যাণ্ডারসন যখন বাঙলার গভর্ণর ছিলেন, তখন বর্তমান ইমারজেনসী ওয়ার্ডটি নির্মিত হয়। সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক ও আই ব্যাঙ্ক ((Eye Bank) মেডিকেল কলেজের মধ্যেই অবস্থিত।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ক্যাম্পবেল সাহেব কর্তৃক ক্যাম্পবেল হাসপাতাল স্থাপিত হয়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের সহিত এই হাসপাতালকে সংযুক্ত করা হয়। প্রখ্যাত চিকিৎসক স্যার নীলরতন সরকার ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তাঁরই নাম অনুযায়ী ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুলাই তারিখ থেকে এর নামকরণ হয় নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ। এই হাসপাতালের গবেষণাগারে গবেষণা করে ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী কালা জ্বরের ওষুধ ইউরিয়াষ্টিবামাইন আবিষ্কার করেন।

আগেই বলেছি যে মেয়ো হসপিটালের সাহায্যার্থে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে টাউন হলে 'নীলদর্পণ' নাটকের যে অভিনয় হয়েছিল, তার অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন শ্যামবাজারের ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর। এই রাধাগোবিন্দ কর-ই ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালকাটা স্কুল অভ্ মেডিসিন নামে চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য একটি শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম ১৭ বৎসর স্কুলটি একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থিত ছিল। ১৮৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ৫ নং বেলগাছিয়া রোডে বর্তমান ভূমিখণ্ড ক্রয় করে ওখানে অ্যালবার্ট ভিকটর হসপিটাল নামে একটি হাসপাতাল স্থাপন করা হয়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ওখানে স্কুলটিকে স্থানান্তরিত করা হয়। শীঘ্রই হাসপাতালটিকে দ্বিতল করা হয় এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ১০০-তে গিয়ে দাঁড়ায়। ওই বৎসরের এক বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায় যে ডাঃ আর. জি. কর ওই হাসপাতালের অবৈতনিক সম্পাদক হিসাবে সাধারণের কাছে আবেদন করছেন, ওই হাসপাতলে ১২টি শয্যাবিশিষ্ট সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য একটি স্বতন্ত্র 'ওয়ার্ড' খোলবার নিমিত্ত সাহায্যের জন্য। ইতিমধ্যে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দতেই আর. জি. করের স্কুলের সঙ্গে কলেজ অভ্ ফিজিসিয়ানস্ অ্যাণ্ড সারজানস (১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) সম্মিলিত হয়ে গিয়েছিল। হাসপাতালটির নূতন ভবনের উদ্বোধন করেন তৎকালীন বাঙলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ জুলাই তারিখে। তখন এর নামকরণ করা হয় কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ। এই নাম পরিবর্তন করে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে এর নাম রাখা হয় আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।

ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল গঠিত হয় ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনষ্টিটিউট কর্তৃক স্বদেশী আন্দোলনের সময়। ডঃ সুন্দরীমোহন দাশ কর্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্যালকাটা মেডিকেল ইনষ্টিটিউট ইহার সহিত সম্মিলিত হয়। হাসপাতালটি ৩২নং গোরাচাঁদ রোডে অবস্থিত।

এগুলি ছাড়া কলকাতায় আরও হাসপাতাল আছে। যথা ৭৩নং চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যুতে অবস্থিত ইসলামিয়া হসপিটাল (এদের আর একটা শাখা আছে ৯৪ নং পার্ক স্ট্রীটে), ২৪

সি ও ডি ডাক্তার সুরেশ সরকার রোডে অবস্থিত এণ্টালী গভর্নমেণ্ট হসপিটাল, ১১ নং লালা লাজপৎ রায় রোডে অবস্থিত শম্ভুনাথ পণ্ডিত হসপিটাল, ৯৯ নং শরৎ বোস রোডে অবস্থিত রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠান, ৩৭ নং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোডে অবস্থিত চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, ৮২নং কাশীপুর রোডে অবস্থিত নর্থ সুবারবান হসপিটাল, ৭/২/ডি ডায়মণ্ড হারবার রোডে অবস্থিত ক্যালকাটা হসপিটাল, টালিগঞ্জে দেশপ্রাণ শাসমল রোডে অবস্থিত মাগনিরাম বাঙ্গুর হসপিটাল, ১২৮ নং রাজা রামমোহন সরণীতে অবস্থিত অগ্‌জিলিয়ারী গভর্নমেণ্ট হসপিটাল, আলিপুরে ১১ নং জেল রোডে অবস্থিত আলিপুর পুলিশ হসপিটাল, ৩/এ বেলভেডিয়ার রোডে অবস্থিত আলিপুর পুলিশ কেস হসপিটাল, ৫৫ নং কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীটে অবস্থিত আশারাম ভিয়ানীওয়ালা হসপিটাল, ২৪ নং শুঁরা থার্ড লেনে অবস্থিত উপেন্দ্রনাথ মুখার্জি মেমোরিয়াল হসপিটাল, ১৪৫/এ শরৎ বসু রোডে অবস্থিত ক্যালকাটা ভলান্টারী হসপিটাল, ২৪ নং গোরাচাঁদ রোডে অবস্থিত চিত্তরঞ্জন হসপিটাল, ১০৫/২, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটে অবস্থিত বালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তন, শিয়ালদহ কোর্টের পেছনে বি.আর.সিংহ রেলওয়ে হসপিটাল, মাঝেরহাটে পোর্ট কমিশনারস্ হসপিটাল, ১৫১ নং ডায়মণ্ড হারবার রোডে অবস্থিত বেহালা হসপিটাল, ৩নং ভবানীপুর রোডে অবস্থিত ভলাণ্টারি জেনারেল হসপিটাল, ১২৮ নং মহাত্মা গান্ধী রোডে অবস্থিত মাড়োয়ারী হিন্দু হসপিটাল, ৩৯২ নং রবীন্দ্র সরণীতে অবস্থিত মারয়ারী রিলিফ সোসাইটি হসপিটাল, ১০৪ নং আশুতোষ মুখার্জি রোডে অবস্থিত রামরিকদাস হরলালকা হসপিটাল, ৩৬ নং গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউতে অবস্থিত রেহমতবাই ভাডনগরওয়ালা হসপিটাল, ১১৮ নং রাজা রামমোহন সরণীতে অবস্থিত বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী মারয়ারী হসপিটাল ইত্যাদি। ১৪৫ নং মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটে অবস্থিত ইউনিভারসিটি কলেজ অভ্ মেডিসিনের সঙ্গে সংযুক্ত একটা হাসপাতাল আছে, নাম গোয়েনকা হাসপাতাল। এখানে স্নাতকোত্তর ছাত্রদের প্রশিক্ষণ (ক্লিনিক্যাল) দেওয়া হয়।

মেয়েদের চিকিৎসা ও প্রসবের জন্য কলকাতায় কতকগুলি স্বতন্ত্র হাসপাতাল আছে। যথা ১ নং রাজা রামমোহন সরণীতে অবস্থিত ডাফরিন হসপিটাল, ৮৩ নং রবীন্দ্র সরণীতে অবস্থিত লোহিয়া মাতৃ সেবাসদন, মেডিকেল কলেজের অন্তর্ভুক্ত ইডেন হসপিটাল, ৩৭ নং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডে অবস্থিত চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, ১৪ নং ব্রাইট রোডে অবস্থিত পূর্ব কলিকাতা প্রসূতি সদন, ১৩ নং শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোডে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রসূতি আগার, ৫১ নং রবীন্দ্র সরণীতে অবস্থিত মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান, ৮৩ নং রবীন্দ্র সরণীতে অবস্থিত মাতৃ সেবাসদন, ৭/এ মোহন লেনে অবস্থিত রামকৃষ্ণ সারদা মিশন মাতৃভবন, ও ১৩৯ নং রামদুলাল সরকার স্ট্রীটে অবস্থিত হিন্দু শিশু প্রসূতি সেবা ভবন ইত্যাদি। এ ছাড়া আরও প্রসূতি সদন আছে। যথা, ১২ নং প্যারীমোহন রায় রোডে অবস্থিত চেতলা প্রসূতি সদন, ৩৫/১ নং একবালপুর রোডে অবস্থিত খিদিরপুর প্রসূতি সদন, ২৩৭ জে মানিকতলা রোডে অবস্থিত মানিকতলা প্রসূতি সদন, ১২নং নীলমনি স্ট্রীটে বলদেওদাস প্রসূতি সদন, ইত্যাদি। কতকগুলি প্রসূতি সদন ইউনিটও আছে। সেগুলি ৯/এ পিয়ারী রো-তে, ২৬/৯/১ মহাত্মা গান্ধী রোডে, ১৩ নং গিরিশ বোস রোডে (ইন্টালী), ৪৭/১ সি হাজরা রোডে, ৫/ডি কালী টেম্পল রোডে, ১০/২ মাইকেল দত্ত

স্ট্রীটে, ৬৭/১ বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে, ২৪/সি নারিকেলডাঙ্গা মেন রোডে, ১৯/১ উল্টাডাঙ্গা মেন রোডে ও ১৮০ নং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস রোডে অবস্থিত।

সংক্রামক ব্যাধি (যেমন কলেরা, ডিপথিরিয়া ইত্যাদি) চিকিৎসার জন্য কলকাতায় স্বতন্ত্র হাসপাতাল আছে। নাম ইনফেকশাস ডিজিজেস হসপিটাল। হাসপাতালটি ৫৯ নং বাহির শুঁরা রোডে অবস্থিত। এ জায়গাটা বেলিয়াঘাটায়।

প্রাচ্যদেশীয় নানারূপ রোগ ও কুষ্ঠ ব্যাধি চিকিৎসার জন্য মেডিকেল কলেজের পিছনে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যুর ওপর 'স্কুল অভ্ ট্রপিক্যাল মেডিসিন'-এর কারমাইকেল হসপিটাল ফর ট্রপিক্যাল ডিজিজেস আছে। এছাড়া, ১৮ নং গোবরা রোডে কুষ্ঠ চিকিৎসার জন্য অ্যালবার্ট ভিক্টর লেপার হসপিটাল আছে।

যক্ষ্মা চিকিৎসার জন্য আছে যাদবপুরে কুমুদশঙ্কর টিউবারকিউলোসিস হসপিটাল, ১৮০ নং মানিকতলা মেন রোডে অবস্থিত ন্যাশনাল ইনফারমারী, ৬৯ নং বাহির শুঁরা রোডে অবস্থিত বেলিয়াঘাটা টি. বি. হসপিটাল, ও ২০ নং এস. কে. দেব স্ট্রীটে (পাতিপুকুরে) অবস্থিত অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ যক্ষ্মা হাসপাতাল। এ ছাড়া আছে ৭৩ নং লেনিন সরণীতে অবস্থিত টিউবারকিউলোসিস রিলিফ এসোসিয়েশন ও ৮৪ নং জে. সি. বোস রোড ও ৩৫/এ বিপ্লবী বারীন বোস রোডে অবস্থিত ক্যালকাটা চেষ্ট হসপিটাল ও ১০৫ নং রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটে কিরণশশী সেবায়তন। ক্যানসার চিকিৎসার জন্য আছে ৩৭ নং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডে অবস্থিত চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হসপিটাল ও ১৪৫/এ শরৎ বসু রোডে বেঙ্গল ক্যানসার ইনষ্টিটিউট ও হসপিটাল।

চক্ষু চিকিৎসার জন্য আছে ২৯৫/১ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোডে ডাঃ এন. এন. চ্যাটার্জি হসপিটাল। দাঁতের জন্য আছে ১১৪ নং আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোডে ডাঃ আর. আমেদ ডেন্টাল হসপিটাল ও ২৪১ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীটে সিটি ডেন্টাল কলেজ হসপিটাল। মানসিক ব্যাধির জন্য আছে ১১৫ নং গিরীন্দ্র শেখর বসু রোডে লুম্বিনী পার্ক মেন্টাল হসপিটাল, ৩১এ, আলিপুর রোডে মেন্টাল হসপিটাল, ১৩৩ নং বিবেকানন্দ রোডে মেন্টাল হসপিটাল, ৮ নং গোবরা রোডে মেন্টাল হসপিটাল, ৫২/১এ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীটে বাঙ্গুর ইনষ্টিটিউট অভ্ নিউরোলজি ও দমদম দত্তনগরে বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রম।

শিশুদের চিকিৎসার জন্য আছে ১১১ নং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোডে বি. সি. রায় মেমোরিয়াল হাউস ফর চিলড্রেন, ৩৮ নং বদন রায় লেনে বি.সি.রায় পোলিও ক্লিনিক, ৩৫ নং দিলখুসা স্ট্রীটে ইনষ্টিটউট অভ্ চাইল্ড হেলথ ও ১নং নরেশ মিত্র সরণীতে চিত্তরঞ্জন শিশুসদন।

পশু চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আছে ৩৭নং বেলগাছিয়া রোডে বেঙ্গল ভেটেরিনারি কলেজ অ্যাণ্ড হসপিটাল, ৮নং অভয় বিদ্যালঙ্কার রোডে ষ্টেট ভেটেরিনারী হসপিটাল, ১৪৪ নং ঝাউতলা রোডে পার্ক ভেটেরিনারী হসপিটাল, ১৯ নং ব্রড স্ট্রীটে গভর্নমেণ্ট ভেটেরিনারী হসপিটাল ও ২৭৬ নং বি. বি. গাঙ্গুলী, স্ট্রীটে C.S.P.C.A. হসপিটাল।

কলকাতায় কয়েকটি হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল আছে যথা ২৩৫ নং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে ক্যালকাটা হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও হসপিটাল, ৬৫ নং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে ডানহাম হোমিও কলেজ ও হসপিটাল, ১৪/১ নং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোডে প্রতাপচন্দ্র হোমিও হসপিটাল, ১৯নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটে বেঙ্গল অ্যালেন হোমিও মেডিকেল কলেজ হসপিটাল। প্রথম দুটি হাসপাতাল পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধিগ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আয়ুর্বেদ হাসপাতালের মধ্যে আছে ১৭০ নং রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় ও হাসপাতাল, পাতিপুকুরে অষ্টাঙ্গ যক্ষ্মা হাসপাতাল (আগে দেখুন), ৯৩ নং অরবিন্দ সরণীতে বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ কলেজ ও হাসপাতাল, ২৯৪/৩/১ নং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ হাসপাতাল। কলকাতায় কলকাতা করপোরেশনের অনেকগুলি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। এ ছাড়া, ছয়টি প্রসূতি আগার (আমার 'কলকাতা' বই দেখুন) আছে।

সাম্প্রতিককালে কলকাতায় অনেকগুলি ভাল নার্সিংহোম গড়ে উঠেছে। যাদের পয়সা আছে, তারা এ সব নার্সিংহোমে সুচিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা পেতে পারেন। কতকগুলি নার্সিংহোমের নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—উডল্যাণ্ড, অকল্যাণ্ড, পার্ক, বেলেভু, হ্যারিংটন, সেন্ট মেরীজ, অ্যাভেন্যু, প্রিনসেপ, ক্যাপিটল, পপুলার, নিউল্যাণ্ড, হারমনি (মানসিক চিকিৎসার জন্য,), নর্থল্যাণ্ড সেবায়ন, বেঙ্গল, ক্যালকাটা মেটারনিটি, নর্থ ক্যালকাটা নার্সিংহোম, কাশীপুর নার্সিংহোম ইত্যাদি।

মাত্র চার-পাঁচ বৎসর আগে প্রতিষ্ঠিত হলেও ইদানিংকালে একটা হাসপাতাল বেশ সুনাম অর্জন করে প্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু সম্প্রতি শ্রমিক বিরোধে এটা বিপর্যস্ত। এ হাসপাতালটা হচ্ছে ২/সি ক্যামাক স্ট্রীটে অবস্থিত অ্যাসেমব্লিজ অভ্ গড্ হসপিটাল।

## কোর্ট কাছারি ও আইনবিদ

সমসাময়িক নথীপত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে কোম্পানি কলকাতায় একটা আদালত স্থাপন করেছিলেন। প্রতি শনিবার সকাল ন'টা থেকে বেলা বারটা পর্যন্ত ওই আদালত বসত। ওই আদালতের শাস্তিবিধান পদ্ধতি ছিল অদ্ভুত। কেননা ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে আমরা দেখতে পাই যে কতগুলো চোর ও খুনী আসামী সম্বন্ধে আদালত রায় দিচ্ছে যে তাদের গালে ছেঁকা দিয়ে চিহ্নিত করে নদীর অপর পারে ছেড়ে দিয়ে আসা হউক। বোধ হয় মেয়রস্ কোর্ট স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত এই আদালত কার্যকর ছিল।

ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জর্জের আমলে এক রাজকীয় সনদানুসারে কলকাতায় ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে মেয়রস্ কোর্ট স্থাপিত হয়। এই আদালতে বিচারকার্য নির্বাহের জন্য একজন মেয়র ও নয়জন সহকারী বিচারক বা অ্যালডারম্যান নিযুক্ত হত। মেয়রস কোর্টের জন্য কোন নির্দিষ্ট বাড়ী ছিল না। মাসিক ত্রিশ টাকা ভাড়ায় একটা 'চ্যারিটি স্কুল' ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। এই স্কুল বাড়ীটার জমির ওপরই বর্তমান সেন্ট এ ু জ চার্চ অবস্থিত। মেয়রস্

কোর্টে প্রধানত ইংরেজদের বিষয়সম্পত্তিঘটিত দাওয়ানী মোকর্দমারই শুনানী হত এবং এর এলাকা কলকাতার সীমানার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। এই আদালতের রায় চূড়ান্ত ছিল না। এর ওপরে কোর্ট অভ্ আপীল নামে আর একটা আদালত ছিল। এ ছাড়া, সেকালে কোর্ট অভ্ কোয়াটার সেসনস্ নামে একটা ফৌজদারী আদালতও ছিল।

১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ জানুয়ারী তারিখের এক রাজকীয় সনদ বলে 'কোর্ট অভ্ রিকুয়েষ্টস্' নামে এক আদালত স্থাপিত হয়। এখানে প্রথম ২০ টাকার অনধিক দাবীর মুৎফরাক্কা মামলাসমূহের বিচার হত। এরই বংশধর হচ্ছে বর্তমান ছোট আদালত বা স্মল কজেস কোর্ট।

দেওয়ানী পাবার পর ইংরেজরা দাওয়ানী ও ফৌজদারী মামলাসমূহ বিচারের ভার নিজেদের হাতে নেন। এজন্য মফস্বলে কোর্ট স্থাপিত হয়। ওই সব কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করবার জন্য কোম্পানি কলকাতায় সদর নিজামত ও সদর দাওয়ানী আদালত স্থাপন করেন। এই আদালতদ্বয় 'সদর আদালত' নামে পরিচিত ছিল, এবং এর অবস্থান ছিল বর্তমান সদর স্ট্রীটে, ও পরে রেস্‌কোর্সের দক্ষিণে। তারপর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ মার্চ তারিখে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়। পুরানো মেয়রস্ কোর্ট ভবনেই সুপ্রিম কোর্ট প্রথম অবস্থিত হয়। সুপ্রিম কোর্টের একজন প্রধান বিচারপতি ও তিনজন সহকারী বিচারক ছিল। পরে সহকারী বিচারকদের সংখ্যা কার্যত দুই করা হয়। পরে (১৭৮০ থেকে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে) সুপ্রিম কোর্টের জন্য বর্তমান হাইকোর্টের পশ্চিমাংশের ভূমিতে সুপ্রিম কোর্টের নিজস্ব ভবন নির্মিত হয়। এই নূতন ভবনের নীচের তলায় অন্যান্য কোর্টের অধিবেশন হত, আর দোতলায় দায়রা কোর্ট বসত। সুপ্রিম কোর্টের একতিয়ার (Jurisdiction) ছিল মারহাট্টা ডিচের অন্তর্ভুক্ত 'শহর কলকাতা'। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ মে তারিখে হাইকোর্ট গঠিত হবার পর সদর নিজামত আদালত ও সদর দাওয়ানী আদালত সমেত সুপ্রিম কোর্ট তুলে দেওয়া হয়। নবগঠিত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন স্যার বারনস্ পিকক্। তাঁর অধীনে আরও বারো জন জজ (puisne judges) নিযুক্ত হন। পরের বছর (১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) একজন ভারতীয় জজও নিয়োগ করা হয়। (পরে দেখুন)।

বর্তমান হাইকোর্ট ভবনের নির্মাণ কার্য শুরু হয় ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে, আর এর নির্মাণ কার্য শেষ হয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে। এর স্থপতি ছিলেন সরকারী আর্কিটেক্ট মিষ্টার ওয়ালটার গ্র্যানভিল। যে জমিটার ওপর হাইকোর্ট বাড়ীটা তৈরী হয়, তার পশ্চিম ভাগে অবস্থিত ছিল সেকালের সুপ্রিম কোর্টের বাড়ী। পুরানো সুপ্রিম কোর্টের সামনে (পূর্বদিকে) ছিল একটা খুব সরু গলি। ওই গলির পূর্বদিকে (বর্তমান হাইকোর্ট ভবনের পূর্বাংশ) চিল তিনখানা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাসভবন। এ তিনটা বসতবাটী ছিল লণ্ডভিল ক্লার্ক, উইলিয়াম ম্যাকফারসন ও জেমস্ উইলিয়াম কলভিল-দের। এঁদের মধ্যে লণ্ডভিল ক্লার্কই ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে বার লাইব্রেরী স্থাপন করেছিলেন। উইলিয়াম ম্যাকফারসন ছিলেন ১৮৬৪ থেকে ১৮৭৭ পর্যন্ত হাইকোর্টের জজ স্যার আরথার জর্জ ম্যাকফারসনের ভাই। আর জেমস উইলিয়াম কলভিল ছিলেন ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাডভোকেট জেনারেল ও ১৮৪৮ থেকে ১৮৫৫ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের জজ। ওই

তিনখানা বাড়ী, সরু গলিটা ও সুপ্রিম কোর্টের পুরানো বাড়ী, এ সবই বর্তমান হাইকোর্টের গর্ভে চলে গিয়েছে।

হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হবার পর এর ওপর অর্পিত হয় সুপ্রিম কোর্টের 'জুরিসডিকশন'—তার মানে মারহাট্টা ডিচ বেষ্টিত শহর কলকাতার এলাকা। এটাই হাইকোর্টের 'অরিজিনাল সাইড'-এর এলাকা। 'আপীলেট সাইড'-এর 'জুরিসডিকশন' রাখা হয় সমগ্র বাঙলা, বিহার, ওড়িষা, ছোটনাগপুর ও আসাম (প্রায় দুই লক্ষ বর্গ মাইল)। পরে স্বতন্ত্র প্রদেশসমূহ গঠিত হবার পর এই 'জুরিসডিকশন' সঙ্কুচিত করা হয়। 'অরিজিনাল সাইড'-এ কোন মামলার মাত্র প্রাথমিক আর্জি পেশ করা হয়। আর 'আপীলেট সাইড'-এ ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নিম্নতর কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল পেশ করা চলে। ফৌজদারী মামলার শুনানী দায়রা অধিবেশনে হয়।

প্রথমে হাইকোর্টের মাত্র ১২ জন জজ ছিলেন। তারপর এই সংখ্যা বাড়ানো হয়। সূচনায় হাইকোর্টের সব জজই ইংরেজ জজ ছিলেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রামপ্রসাদ রায়কে প্রথম দেশীয় জজ নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু পদাসীন হবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু ঘটায় শম্ভুনাথ পণ্ডিত নামে একজন কাশ্মীরি ব্রাহ্মণই হাইকোর্টের প্রথম দেশীয় জজ হন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র মিত্র কিছুদিনের জন্য হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। মুসলমানদের মধ্যে আমীর আলি ১৮৮[illegible] খ্রীষ্টাব্দে হাইকোর্টের প্রথম মুসলমান জজ নিযুক্ত হন। বর্তমান শতাব্দীর সত্তরের দশকে শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী নাগ ও মতী পদ্মা খাস্তগীর হাইকোর্টের প্রথম মহিলা জজ নিযুক্ত হন। পরে আরও দুজন মহিলা জজ নিযুক্ত হযেছেন।

হাইকোর্টের উকিলদের আগে 'ভকিল' বলা হত। এ ছাড়া ছিল ইংলণ্ডের 'ব্যারিষ্টার' ও আয়ারল্যাণ্ডের 'অ্যাডভোকেট' (ব্যারিষ্টারের সমগোত্রীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এই অর্থে 'অ্যাডভোকেট' ছিলেন)। আনুমানিক ষাট বৎসর পূর্বে (২০ নভেম্বর, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে) 'ভকিল'দের আখ্যা পরিবর্তন করে 'অ্যাডভোকেট' রাখা হয়।

হাইকোর্টের (তার পূর্বগামী সুপ্রিম কোর্ট সমেত) ইংরেজ জজদের মধ্যে স্বানামধন্য হয়ে আছেন উইলিয়াম জোনস্, এলিজা ইমপে, রবার্ট চ্যাম্বারস্, হেনরী রাসেল, বার্নস্ পীকক, আরথার জর্জ ম্যাকফারসন, চালর্স জ্যাকসন,জন প্যাকস্টন নরম্যান, ওয়ালটার মরগান, ফ্রানসিস্ উইলিয়াম ম্যাকলীন, উইলিয়াম ডাককিন, এডওয়ার্ড হাইড, জন উডরফ, জন অ্যানষ্ট্রা টার, বাকল্যাণ্ড ও প্যানক্রিজ। আরও অনেক ইংরেজ জজ যাদের নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, তাঁরা হচ্ছেন ফ্রানসিস ম্যাগনাটেন, উইলিয়াম বরোজ, হেনরী ব্লসেট, ক্রিষ্টোফার পুলার, এণ্টনী বুলার, রিচার্ড গার্থ, উইলিয়াম কোমার পেথেরাম, চালর্স বিনি ট্রেভর, জন রাসেল কলভিন, হেনরী উইলমট সেটন, লরেন্ পীল, জন হারবার্ট হ্যারিংটন, এডওয়ার্ড রায়ন, চার্লস এডওয়ার্ড গ্রে, গ্রেগরী চার্লস পল প্রমুখ। একজন জজের মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা এখানে উল্লেখ করতে হয়। ঘটনাটা ঘটেছে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে। হাইকোর্টের 'অরিজিনাল সাইড'-এর ভবনটি তখন তৈরী হচ্ছে। হাইকোর্টের অধিবেশন বসছে টাউন হলে। চীফ জাষ্টিস নরম্যান টাউন হলের সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন। এমন সময় একজন উন্মত্ত মুসলমান তাঁকে হত্যা করে।

হাইকোর্টের এদেশীয় বিচারপতিদের মধ্যে যাঁরা স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁরা হচ্ছেন শম্ভুনাথ পণ্ডিত, রমেশচন্দ্র মিত্র, আমীর আলি, দ্বারকানাথ মিত্র, চন্দ্রমাধব ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী, চারুচন্দ্র বিশ্বাস, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, রাধাবিনোদ পাল, ফণিভূষণ বক্রবর্তী, বিনোদচন্দ্র মিত্র, সব্যসাচী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। বিনোদচন্দ্র মিত্র ইংলণ্ডের প্রিভি কাউনসিলেরও বিচারপতি হয়েছিলেন।

হাইকোর্টের বিখ্যাত আইনবিদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রমাপ্রসাদ রায়, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, রমেশচন্দ্র মিত্র, আমীর আলি, দ্বারকানাথ মিত্র, কালীমোহন দাশ, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, রাধাবিনোদ পাল, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, চিত্তরঞ্জন দাশ, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণিভূষণ চক্রবর্তী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, শরৎচন্দ্র বসু, তুলসীচরণ গোস্বামী, কুমুদনাথ চৌধুরী, গোপালচন্দ্র সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষ, দুর্গাচরণ. বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, নাথ দাস, নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, মতী পদ্মা চ্যাটার্জি প্রভৃতি। দুজন স্বনামধন্য ইংরেজ ব্যারিষ্টার যাঁদের সঙ্গে বর্তমান লেখকের আলাপ ছিল, তাঁরা হচ্ছেন ল্যাংফোর্ড জেমস্ ও ডবলিউ কে. পেজ।

১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ জানুয়ারী তারিখের রাজকীয় সনদ দ্বারা কলকাতায় যে কোর্ট অভ্ রিকুয়েষ্ট স্থাপিত হয়েছিল, তারই উত্তরাধিকারী হচ্ছে কলকাতার স্মল কজেস্ কোর্ট বা ছোট আদালত। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ মার্চ তারিখে যখন সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়, তখন প্রেসিডেন্সী টাউনসমূহে (কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ) অবস্থিত কোর্ট অভ্ রিকুয়েষ্টগুলি সুপ্রিম কোর্টের অধীনে ন্যস্ত হয়। রিকুয়েষ্ট-এর মাত্রা ২০ টাকা ও পরে ১০০ টাকার অনধিক দাবীযুক্ত মামলার বিচার করবার অধিকার ছিল। পরে ইহা ৪০০ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়। কোর্ট অভ্ রিকুষ্টেস্-এ মামলা করবার অনেক অসুবিধা ছিল, এবং ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা ট্রেডারস্ এসোসিয়েশন' সেগুলির প্রতি কোম্পানির কাউনসিলের প্রেসিডেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারপর অনেক জল ঘোলা হবার পর সরকার ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের নয় অম্বর আইন বলে কোর্ট অভ্ রিকুয়েষ্টসকে 'স্মল কজেস্ কোর্ট, বা ছোট আদালতে পরিণত করে। মামলার দাবীর সীমা ৪০০ টাকায় রাখা হয়। পরে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ১০০০ টাকায় ও ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ২০০০ টাকায় বর্ধিত করা হয়। আগে ছোট আদালত প্রতিদিনই বসত, কিন্তু গ্রীষ্মকালে ১ থেকে ১৫ মে ও শীতকালে ১৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আদালত বন্ধ থাকত। বন্ধের সময় জরুরী মামলা সমূহ দায়ের করবার জন্য ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি 'ভেকেশন বেঞ্চ' সৃষ্টি হয়।

কোর্ট অভ্ রিকুয়েষ্ট-এর ঋণের টাকা অনাদায়ে জেল দেবার ক্ষমতা ছিল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ অকটোবর তারিখের এক সরকারী ঘোষণা থেকে আমরা জানতে পারি যে জেলের পরিমাণ নিম্নলিখিত রূপ ছিল— দশ টাকার ঋণের জন্য এক মাস জেল, পঞ্চাশ টাকা ঋণের জন্য পাঁচ মাস জেল, ২০০ টাকার অধিক ঋণের জন্য এক মাস জেল। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ছোট আদালতের জেলখানায় ৩৪ জন বন্দী ছিল, তার মধ্যে ৬ জন ইরেজ, ৭ জুন মুসলমান ও ২১ জন হিন্দু। এদের ঋণের পরিমাণ ছিল তিন টাকা থেকে ৩৭০ টাকা।

বন্দীদের ভরণপোষণের জন্য পাওনাদারদের প্রত্যহ দেড় আনা করে দিতে হত। যদি এই খরচ একদিন দেওয়া না হত, তা হলে বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হত।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে কোর্ট অভ্ রিকুয়েষ্ট-এ শপথ গ্রহণ করাবার জন্য একজন গঙ্গাজলী ব্রাহ্মণ ও একজন কোরানী মোল্লা নিযুক্ত হয়। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের এক বিবরণী থেকে জানতে পারা যায় যে কোর্ট অভ্ রিকুয়েষ্ট-এর শতকরা ২৫ ভাগ মামলা ওড়িয়া কাপড় ব্যবসায়রা করত।

আগেই বলা হয়েছে যে কোর্ট অভ্ রিকুয়েষ্ট-এর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে স্মল কজেস্ কোর্ট বা ছোট আদালত। ছোট আদালত বলবার উদ্দেশ্য এই যে, যে সব মামলা দাবীর পরিমাণ অতিরিক্ত হওয়ার দরুণ স্মল কজেস্ কোর্টে করা যেত না, সেগুলি বড় আদালত বা হাইকোর্টে করতে হত। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মূল্য স্ফীতির ফলে পাওনাদারদের দাবীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায়, হাইকোর্টে এরূপ মামলার বোঝা ক্রমশ বেড়ে যেতে থাকে। হাইকোর্টের 'অরিজিনাল সাইড'-এ মামলার বোঝা লাঘব করবার জন্য জুডিসিয়াল রিফরম কমিটির সুপারিশক্রমে ও W.B.Acts XX ও XXI of 1953 অনুসারে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারী তারিখে কলকাতার টাউন হলে সিটি সিভিল অ্যাণ্ড সেসনস্ কোর্টের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি পি. বি. চক্রবর্তী। পরে ২ ও ৩ নং হেষ্টিংস স্ট্রীটের (বর্তমানে কে. এস. রায় রোড) বর্তমান ভবনে স্থানান্তরিত হয়। সিটি কোর্টের স্বনামধন্য আইনবিদদের মধ্যে উল্লেখনীয় পূর্ণেন্দুশেখর বসু, এ. কে. মিত্র., এন. বি. ব্যানার্জী, চন্দ্রনারায়ণ লায়েক (পরে হাইকোর্টের জজ), চাঁদমোহন চক্রবর্তী, অশোককুমার চক্রবর্তী, প্রভাতকুমার বোস, ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অশোকলাল বোস, স্নেহেশকুমার সুর, জে. এল. চ্যাটার্জি, বি. বি. মিত্র, এস. এন. দাশগুপ্ত, কে. কে. মিত্র, বি. সি. ঘোষ (সিটি কোর্টের প্রথম প্রধান জজ) , বিভুতোষ ব্যানার্জি, বিজয়কৃষ্ণ বসু, কে. সি. মুখার্জি, তিনকড়ি সরকার, উমাপদ মৈত্র, সুনীলকুমার ঘোষ, বৈদ্যনাথ সরকার, নরেশচন্দ্র ব্যানার্জি, শ্যামলেন্দুমোহন রায়, অজিতকুমার বোস, দেবীপ্রসাদ মুখার্জি, সুকুমার গুহ ঠাকুরতা, মনোরঞ্জন দাস, নারায়ণচন্দ্র দাশ শর্মা, বদ্রীনারায়ণ সুর, বৈদ্যনাথ সরকার, প্রশান্তকুমার সিংহ, সৌধেন্দুকুমার বসু, দেবীপ্রসাদ কর, বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত, শচীকান্ত হাজারি (পরে হাইকোর্টের জজ) প্রমুখ।

আগেই বলা হয়েছে যে হাইকোর্টের জুরিসডিকশন-এর পূর্বসীমা হচ্ছে মারহাট্টা ডিচ বা পরবর্তীকালে তার ওপর নির্মিত সারকুলার রোড (এখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ও আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড)। সারকুলার রোডের পূর্বদিক যে সকল থানার অন্তর্ভুক্ত, সে সকল অঞ্চল শিয়ালদহ কোর্টের অধীনস্থ। ঠিক কবে শিয়ালদহ কোর্ট স্থাপিত হয়েছিল, তা আমাদের সঠিক জানা নেই। তবে নানারকম অনুমানের ভিত্তিতে নারায়ণচন্দ্র রায় বলেন যে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৪নং রেগুলেশন বলে কলকাতার শহরতলীর জন্য যে সকল জেলা আদালত (ডিষ্ট্রিক্ট কোর্টস) স্থাপিত হয়েছিল, শিয়ালদহের বর্তমান মুন্সেফ কোর্ট তারই বংশধর। শিয়ালদহের মুন্সেফ কোর্ট ২৪ পরগণার অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখনীয় যে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের দুই, তিন ও নয় নম্বর রেগুলেশনস্ অনুযায়ী ২৪ পরগণায় দাওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্ব আদালতসমূহ স্থাপিত হয়েছিল। এই সকল আদালতের একতিয়ার কলকাতা

(মারহাট্টা ডিচ বেষ্টিত) শহরের বাহিরে ছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ পরগণার দাওয়ানী আদলত সমূহের এলাকাধীন অধিকার (Jurisdiction) নদীয়া ও হুগলী জেলার ওপর ন্যস্ত হয়। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ পরগণার দাওয়ানী আদালতসমূহ আবার পুনর্গঠিত হয়। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের দশ আইন অনুযায়ী ২৪ পরগণার ম্যাজিস্ট্রেটকে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অভ্ পুলিশ নিযুক্ত করা হয় ও ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা জজের পদদ্বয় একত্রিত করা হয়। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ নং রেগুলেশন অনুযায়ী ২৪ পরগণাকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়—(১) কলকাতা শহরতলীর অন্তর্ভুক্ত চিৎপুর, মানিকতলা, তেজেরহাট, নৌহাজরি ও সালকিয়া (বর্তমান হাওড়া জেলায় অবস্থিত) ও (২) ২৪ পরগণার অবশিষ্টাংশ। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৮নং রেগুলেশন অনুযায়ী এই দুই ভাগকে আবার পুনর্মিলিত করা হয়। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া ও যশোহরের কিয়দংশ ২৪ পরগণার সহিত সংযুক্ত করা হয়, এবং ২৪ পরগণাকে দুটি ভিন্ন মেজেষ্টিরিয়াল ভাগে বিভক্ত করা হয়—(১) আলিপুর ও (২) বারাসাত। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই দুই বিভাগকে আবার পুনর্মিলিত করা হয় ও আটটি মহকুমায় বিভক্ত করা হয়। যথা,(১) আলিপুর, (২) বারাসাত, (৩) বারাকপুর, (৪) বারুইপুর, (৫) বসিরহাট, (৬) ডায়মণ্ডহারবার, (৭) দমদম ও (৮) সাতক্ষীরা। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বারাকপুর ও বারাসাতের কিছু অংশকে আলিপুর সদরের অধীনস্থ করা হয়।

বর্তমানে শিয়ালদহের দাওয়ানী আদালত দুই অংশে বিভক্ত—(১) একজন সাবজজের অধীনে স্মল কজেস্ কোর্ট ও (২) ৫ জন মুন্সেফের কোর্ট। বোধ হয় ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের নয় নম্বর আইন অনুযায়ী শিয়ালদহের বর্তমান স্মল কজেস কোর্ট গঠিত হয়েছিল, যদিও এর পূর্ব থেকেই যে এর অস্তিত্ব ছিল, তা আইনের নজীর থেকে অবগত হওয়া যায়। অবশ্য ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এর নাম ছিল শিয়ালদহ ও হাওড়া দাওয়ানী আদলত। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়ায় একটি মুন্সেফ কোর্ট স্থাপিত হয়, এবং তাকে হুগলী জেলা জজের অধীনস্থ করা হয়।

শিয়ালদহ স্মল কজেস্ কোর্টের বর্তমান এলাকা (jurisdiction) কাশীপুর, চিৎপুর, মানিকতলা, বেলিয়াঘাটা, এণ্টালী, বেনিয়াপুকুর, বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, টালিগঞ্জ, আলিপুর, [illegible]টগঞ্জ, গার্ডেনরীচ, করেয়া, একবালপুর, সাউথ পয়েণ্ট ও নিউ আলিপুর প্রভৃতি [illegible]সমূহ।

শিয়ালদহ কোর্টের স্বনামধন্য আইনজীবিদের মধ্যে উল্লেখনীয় যতীন্দ্রনাথ রায়, তারাপদ ঘোষ, খগেন্দ্রনাথ দে, দেবব্রত মৈত্র, সুধাংশু হোর, শশধর চক্রবর্তী, শরৎচন্দ্র মুখার্জি, মনমোহন মৈত্র, রমেশচন্দ্র গাঙ্গুলী, গিরিজা প্রসন্ন ব্যানার্জি, প্রমোদকুমার ব্যানার্জি, ধীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, দুলালচন্দ্র মুখার্জি, বীরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, নারায়ণ চন্দ্র রায়, উপেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ।

শিয়ালদহে একটি পুলিশ কোর্টও আছে, কিন্তু তা সন্নিহিত স্বতন্ত্র ভবনে অবস্থিত। এখানে মাত্র ফৌজদারী মামলার বিচার হয়।

কলকাতা শহরের ফৌজদারী মামলার বিচার হয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে। [illegible]১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লালবাজার পুলিশ হেডকোয়ার্টারের পূর্বাংশে প্রেসিডেন্সী

ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট ও মিউনিসিপ্যাল কোর্ট—এই দুই আদালত অবস্থিত ছিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের পর কলকাতায় তিনটি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট স্থাপিত হয়। প্রথমটি ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটে, দ্বিতীয়টি কিড ষ্ট্রীটে ও তৃতীয়টি জোড়াবাগানে ডাফ্ কলেজের প্রাক্তন ভবনে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কিড ষ্ট্রীটের আদালত তুলে দেওয়া হয় এবং ওই আদালতের তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ B. Keys-কে জোড়াবাগান আদালতে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রথমে, তাঁর পদের নাম দেওয়া হয় সেকেণ্ড প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্টেট, কিন্তু পরে পরিবর্তন করে বলা হয় অ্যাডিশন্যাল চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জোড়াবাগান আদালত তুলে, ওই আদালতকে ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটের আদালতের সঙ্গে মিলিত করা হয়। তখন থেকে কলকাতায় একটাই প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট আছে। বর্তমানে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের নাম মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট করা হয়েছে। অতীতকালে যে সকল লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে প্র্যাকটিস করে গেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখনীয় মিঃ ম্যানুয়েল, মিঃ ক্র্যাসেনবরো, মিঃ এফ. একস্ ডি. সিলভা, কালী পালিত, তারকনাথ সাধু, যতীন মোহন ঘোষ, সুরেশচন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণলাল দত্ত, জ্ঞানচন্দ্র গুহ, পশুপতি ভট্টাচার্য, কেশবচন্দ্র গুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ দাস, মনোজমোহন বোস, সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, ললিত মোহন দে, মহেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, সুরেশচন্দ্র পালিত, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ।

## কলকাতার ব্যবসা

কলকাতার ব্যবসায়ে বাঙালী বনাম অবাঙালীর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনার কোন কৈফিয়তের প্রয়োজন হয় না। কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজধানী। পশ্চিমবঙ্গ বাঙালীদের দেশ। সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে, পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালীদেরই প্রাধান্য থাকবে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি তা নয়। কলকাতার ব্যবসা-বাণিজ্যের সিংহভাগ অবাঙালীর হাতে। বাঙালীর অংশ খুবই নগণ্য। তা-ও ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষমুখে ইংরেজরা যখন কলকাতায় এসে তাদের বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে, তখন তারা যাদের সঙ্গে বাণিজ্য করত তারা সবাই বাঙালী। বাঙালী বণিকদের তখন আবাসস্থল ছিল বড়বাজারে এবং বড়বাজারই ছিল ব্যবসার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। ইংরেজদের খাতা-পত্রে এটাকে 'গ্রেট বাজার' বলে বর্ণনা করা হত।

কলকাতায় এসে যে বণিকদের সঙ্গে ইংরেজদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তারা হচ্ছে শেঠ-বসাকদের তৎকালীন প্রতিভূ জনার্দন শেঠকে তাদের দালাল নিযুক্ত করে। শেঠেরা চালানী মালের ওপর শতকরা তিন টাকা হারে দালালী পেত। শেঠেরা ইংরেজদের অনেক উপকার করেছিল। তারা ইংরেজদের দুর্গনির্মাণের জন্য লালদীঘির পশ্চিমে তাদের ভদ্রাসন ছেড়ে দিয়ে বড়বাজারে উঠে এসেছিল। তাছাড়া অর্থসংকটের সময় শেঠেরা ইংরেজদের টাকা ধার দিত। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা শেঠ-বসাকদের কাছ থেকে শতকরা একটাকা সুদ হারে টাকা ধার নিয়েছিল।

চালানী কারবারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার ছিল। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বাঙালীদেরই হাতে ছিল। ইংরেজরা দুর্গ-বিশিষ্ট সুরক্ষিত নগরী তৈরী করছে শুনে বাঙালীরা শহরের দিকে ছুটে এসেছিল। তারা এখানে নানারকম ব্যবসা শুরু করেছিল।

ইংরেজদের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রধান পণ্য ছিল সোরা, চিনি, কাঁচা রেশম, সূতা ও সুতীবস্ত্র। বাঙলার সকল জাতিই যে এ-সব পণ্য উৎপন্ন করত তা নয়। মাত্র জাতিবিশেষই বিশেষ পণ্য উৎপন্ন করত। কেবল সুতাই সকল জাতির লোকেরা কাটত। ইংরেজদের সঙ্গে বাণিজ্যের ফলে তাদের বৃদ্ধি ঘটেছিল। সুতীবস্ত্রটা তন্তুবায় গোষ্ঠীই উৎপন্ন করত। শেঠেরা এ বিষয়ে সজাগ ছিল, কেননা ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী যখন তন্তুবায় গোষ্ঠীর বাইরের লোকদের দাদন দিয়েছিল, তখন তারা তার প্রতিবাদ করেছিল। অবশ্য কৌলিক বৃত্তিসমূহের ক্রমশ বিলুপ্তি ঘটছিল।

বাঙালী যে কৌলিক বৃত্তি হারিয়ে ফেলছিল এবং নানান জাতির লোক যে নানারকম ব্যবসায়ে লিপ্ত হচ্ছিল, তা আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের ব্যবসাদারদের নাম থেকে বুঝতে পারি। এইসব ব্যবসাদারদের মধ্যে ছিলেন বৈষ্ণবচরণ শেঠ, গোকুল মিত্র, মোদনমোহন দত্ত, রামদুলাল সরকার, গোবর্ধন রক্ষিত, গৌরী সেন, নিমাইচরণ মল্লিক, সাগর দত্ত, শিবকৃষ্ণ দাঁ, দর্পনারায়ণ ঠাকুর, প্রীতিরাম মাড় প্রমুখ। বৈষ্ণবচরণ ছিলেন তন্তুবায় গোষ্ঠীর লোক। গোবর্ধন ছিলেন তাম্বুলি ও গৌরীচরণ, নিমাইচরণ, সাগর দত্ত প্রমুখ ছিলেন সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ভুক্ত। আর গোকুল মিত্র, মদন দত্ত ও রামদুলাল ছিলেন কায়স্থ। দর্পনারায়ণ ঠাকুর ছিলেন ব্রাহ্মণ ও প্রীতিরাম মাড় কৈবর্ত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বড় বাঙালী ব্যবসায়ীদের মধ্যে ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল, আনন্দমোহন পাল, সুবলচন্দ্র পাল, কৃষ্ণমোহন পাল, গঙ্গাগোবিন্দ শীল, হরগোবিন্দ শীল, বিশ্বম্ভর পাইন, চন্দ্রকুমার পাইন, রামনারায়ণ দে, মাধবচন্দ্র দে, মথুরামোহন সেন, সুবলচন্দ্র নন্দী, ক্ষেত্রপাল সরকার প্রমুখ। সকলেরই ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। এই সময়ের আরও যে সব বাঙালী ব্যবসায়ীদের নাম করা যেতে পারে তাঁরা হচ্ছেন বিশ্বনাথ মতিলাল, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ বসুমল্লিক, পীতম্বর মুখোপাধ্যায়, জয়গোপাল মল্লিক, রামকিনু সরকার, জয়নারায়ণ সাঁতরা, কালীকুমার কুণ্ডু, তারকনাথ প্রামাণিক, রাধামোহন প্রামাণিক, রাখালদাস প্রামাণিক, দ্বারকানাথ গুপ্ত ও রামগোপাল ঘোষ। এঁদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজদের সঙ্গে যুক্ত-মালিকানায় ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, বিশেষ করে পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়, জয়গোপাল মল্লিক, রামকিনু সরকার, জয়নারায়ণ সাঁতরা, কালীকুমার কুণ্ডু, তারকনাথ প্রামাণিক, রাধামোহন প্রামাণিক, রাখালদাস প্রামাণিক, মনিলাল শীল, রামগোপাল ঘোষ ও দ্বারকানাথ ঠাকুর। ইংরেজদের সঙ্গে বাঙালীরা তো গোড়া থেকেই ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল। কিন্তু এরূপভাবে লিপ্ত থাকার মধ্যে বিভিন্ন কালে একটা তারতম্য ছিল গোড়ার দিকে তারা সরাসরি ইংরেজদের মাল বেচত, তারপর তারা বেনিয়ানগিরি করত, পরে (১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদ দ্বারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার রহিত হবার পর) যুগ্ম মালিকানায় সওদাগরী অফিস স্থাপন করেছিল। মতিলাল শীলের সওদাগরী

অফিসের নাম ছিল ওসওয়ালড্ শীল অ্যাণ্ড কোম্পানি দ্বারকানাথ ঠাকুরের ফার্মের নাম ছিল কার টেগোর অ্যাণ্ড কোম্পানি ও রামগোপাল ঘোষের ফার্মের নাম ছিল কেলসন ঘোষ অ্যাণ্ড কোম্পানি। কার টেগোর অ্যাণ্ড কোম্পানি বিখ্যাত সওদাগর অফিসে পরিণত হয়েছিল। এর অংশীদার ছিলেন চারজন—দ্বারকানাথ ঠাকুর, ডবলিউ. কার, ডবলিউ. প্রিনসেপ ও ডি. এম. গর্ডন। দ্বারকানাথ নীল ও রেশম রপ্তানি, কয়লাখনি ক্রয়, জাহাজী ব্যবসা ও চিনির কল স্থাপন করেছিলেন। ইংরেজদের সঙ্গে যুগ্ম মালিকানায় বিলাতী কেতায় ব্যবসা করে তিনি তাঁর সময়ের একজন বিখ্যাত ধনী শিল্পপতি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আলেকজাণ্ডার অ্যাণ্ড কোম্পানি (ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের খুব বড় বিলাতী ফার্ম) দেউলিয়া হবার পর, তিনি তাদের কাছ থেকে চিনাকুরি কয়লাখনি কিনে নিয়ে, পরে তাকে 'বেঙ্গল কোল কোম্পানিতে' রূপান্তরিত করেন। এ দেশে চিনি উৎপাদনে বাষ্পীয় যন্ত্র ব্যবহারের তিনিই প্রবর্তক। জাহাজী ব্যবসা শুরু করে বহু মালবাহী জাহাজ ও 'দ্বারকানাথ' নামে যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করেন। তাঁর উদ্যোগের একমাত্র দুর্বলতা ছিল যে, তিনি বহু ব্যাপারে একসঙ্গে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা যান, এবং তার দু-বৎসর পরে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক যখন বিপাকে পড়ে, কার টেগোর অ্যাণ্ড কোম্পানির পক্ষে তখন সবদিক সামলানো খুব দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ফলে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে 'কার টেগোর অ্যাণ্ড কোম্পানি' উঠে যায়।

'কার টেগোর অ্যাণ্ড কোম্পানি' উঠে যাবার পর বাঙালীর ব্যবসায়ের আর জলুস রইল না। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় যখন ব্যবসা জগতে একটা 'বুম' আসে, তখন বাঙালী ব্যবসায়ীরা কিছু পয়সা করেছিলেন বটে, কিন্তু ওই 'বুমের' পদক্ষেপে যখন মন্দা এল, তখন তার প্রতিঘাত বাঙালী ব্যবসায়ীদের ওপরই গিয়ে পড়ল। তারপর ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় যখন জমিদারীসমূহ নীলাম হতে লাগল, তখন অনেক বাঙালী ব্যবসায়ী জমিদারী কিনে রাতারাতি বণিক থেকে জমিদারে পরিণত হল। তবে বাঙালীর ব্যবসা একেবারে উঠে গেল না। এক নতুন রূপ নিল।

কোম্পানির বিনা শুল্কে বাণিজ্য করবার যে সুযোগ ছিল, তা ইংরেজদের কর্মচারীরা অবৈধভাবে নিত। এতে মাত্র কোম্পানিরই যে ভীষণ ক্ষতি হত তা নয়, তাদের জোর জুলুম ও অত্যাচার বাঙালীর ব্যবসাকেও বিঘ্নিত করত। কোম্পানির কর্মচারীদের এই দুর্নীতি ও অত্যাচার দমন করবার জন্য ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের কর্তারা ওয়ারেন হেষ্টিংসকে গভর্ণর নিযুক্ত করেন। পর বৎসর রেগুলেটিং অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হবার পর দ্বৈত শাসন প্রণালীর অবসান ঘটে ও নিজেদের অধিকৃত অঞ্চলসমূহের শাসনভার ইংরেজ কোম্পানি নিজ হস্তে গ্রহণ করে। ওয়ারেন হেষ্টিংসকে গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত করা হয়। হেষ্টিংস কোম্পানির কর্মচারিগণ কর্তৃক অবৈধ 'দস্তক' গ্রহণ বন্ধ করে দেন। এরই পদক্ষেপে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিসের অবৈধ মুনাফা রোধ আইন ও ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এজেন্সী প্রণালীর প্রবর্তন অবৈধ ব্যবসার পতন ঘটায়। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই কলকাতায় ১৫টি এজেন্সী হাউসের সৃষ্টি হয়। তার মধ্যে প্রধান ছিল ফেয়ারলি ফারগুসন অ্যাণ্ড কোম্পানি, প্যাকস্টন ককারেল অ্যাণ্ড ডেলিসল, ল্যামবার্ট অ্যাণ্ড রস, কলভিনস্

অ্যাণ্ড ব্যাজেট এবং জোসেফ ব্যারোটা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদ দ্বারা কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসার বিলুপ্তির পর ইংরেজরা যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিল তাদের মধ্যে ছিল আলেকজাণ্ডার অ্যাণ্ড কোম্পানি, পামার অ্যাণ্ড কোম্পানি, ম্যাকিনটশ অ্যাণ্ড কোম্পানি, ফারগুসন অ্যাণ্ড কোম্পানি, কলভিন অ্যাণ্ড কোম্পানি, ক্রুটেনডেন অ্যাণ্ড কোম্পানি, ডেভিডসন অ্যাণ্ড কোম্পানি, মারসার অ্যাণ্ড কোম্পানি, বারনেট অ্যাণ্ড কোম্পানি, মেনর্চিটা উনেকোর্ট অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রভৃতি।

বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকেই এজেন্সী হাউস ছাড়া, বহু ইংরেজ দোকানদার ও ব্যবসায়ীর কলকাতায় আবির্ভাব ঘটেছিল। এসব ব্যবসায়ী তাদের সঞ্চিত অর্থ শতকরা দশ টাকা সুদ হারে এজেন্সী হাউস সমূহে বিনিযুক্ত করত। বহু বাঙালী ব্যবসায়ীও তাদের টাকা এজেন্সী হাউসে জমা রাখত। পরের ধনে পোদ্দারী করে এজেন্সী হাউসমূহ খুব রমরমা কারবার করত। তাঁদের এক একজন অংশীদার যখন অবসর গ্রহণ করে বিলাতে ফিরে যেতেন, তখন তাঁদের বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়াত ১০০,০০০ থেকে ১৫০,০০০ পাউণ্ড। (মনে রাখতে হবে সে যুগে আয়করের বালাই ছিল না)।

১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের পর এদেশে যখন নীলের চাষের সূত্রপাত হয়, তখন এজেন্সী হাউসসমূহ এইভাবে পরের গাছ থেকে লব্ধ টাকা নীলচাষে বিনিযুক্ত করেছিল। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার বিলুপ্ত হবার পর, তারা প্রভূত পরিমাণে নীলের রপ্তানী করত। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে অর্থনৈতিক মন্দা প্রকাশ পায়। মন্দার ঢেউ এখানে এসেও পৌছায়। নীলের দাম ভীষণভাবে হ্রাস পায়। এর প্রতিঘাত এজেন্সী হাউসসমূহ সামলাতে পারে না। একের পর এক এজেন্সী হাউস দেউলিয়া হয়ে যায়। এ সময় রাজকৃষ্ণ দত্ত জালিয়াতি ও এজেন্সী হাউসসমূহের পতনের এক কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এরা দেউলিয়া হওয়ার ফলে বিদেশী ও এদেশী বহু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদেশী লোকদের মধ্যে যেসব বাঙালী ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তারা হচ্ছে বিশ্বনাথ মতিলাল যাকে তাঁর ক্ষতির জন্য কাঁসারীপটির জমিজমা বেচে দিতে হয়েছিল। আনন্দমোহন পাল ও সুবলচন্দ্র পালের ক্ষতি হয়েছিল ১,৫০,০০০ টাকা, রাধামোহন ও কৃষ্ণমোহন পালের ১,০০,০০০ টাকা, গঙ্গাগোবিন্দ শীল ও হরগোবিন্দ শীলের ২,৫০,০০০ টাকা, বিশ্বম্ভর পাইন ও চন্দ্রকুমার পাইনের ৬০,০০০ টাকা, রামনারায়ণ দে ও মাধবচরণ দে-র ২,৫০,০০০ টাকা, মথুরামোহন সেনের ১৩,০০,০০০ টাকা ও সুবলচন্দ্র নন্দীর ৫০,০০০ টাকা। আমরা পরে দেখব যে, ঠিক এই সময় থেকেই উত্তর ভারত থেকে অবাঙালী ব্যবসায়ীরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, কেননা এর পরই 'কার টেগোর অ্যাণ্ড কোম্পানি', 'কেলসন ঘোষ অ্যাণ্ড কোম্পানি' প্রভৃতির জন্ম হয়। কিন্তু ইউনিয়ন ব্যাংক ফেল হওয়ার পর বাঙালী-ব্যবসায়ীরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

তারপর ইংরেজের ব্যবসায়ে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। শতাব্দীর মধ্যাহ্নে লিমিটেড লায়েবিলিটি কোম্পানি আইন প্রণীত হওয়ার পর ইংরেজরা ম্যানেজিং এজেন্সী হাউসসমূহ স্থাপন করে শিল্প উদ্যোগের দিকে মনোযোগ দেয়। তবে প্রথম জুট মিল ভাগ্যান্বেষী জর্জ অকল্যাণ্ড ও বাঙালী বামচরণ সেনের যৌথ চেষ্টাতেই গঠিত হয়েছিল।

কিন্তু তার পরে যেসব যৌথ কোম্পানি যথা চটকল, কয়লাখনি, চা-বাগান, চিনির কল, ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি প্রভৃতি গঠিত হয়, সেগুলি সবই সাহেবী কোম্পানি। এরাই কলকাতার ব্যবসায়ের অধিপতি হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া, বহু বৈদেশিক ফার্ম নানারূপ কারবারে লিপ্ত হয়। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই এইসব বৈদেশিক কোম্পানি তাঁদের মালিকানা স্বত্ব মারবাড়ীদের বেচে দিয়ে দেশে চলে যায়। তার ফলে কলকাতার ব্যবসা জগৎটার মারবাড়ীদের হাতে চলে যায়।

অবাঙালীদের মধ্যে মারবাড়ীরাই প্রথম কলকাতায় আসেনি। এসেছিল পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতের লোক। পলাশী যুদ্ধের সময়েই দু-একজন অবাঙালী ব্যবসায়ীর আবির্ভাব ঘটেছিল। তাদের অন্যতম চিল উমিচাঁদ ও তাঁর আত্মীয় হুজুরীমল। দুজনেই পাঞ্জাবের লোক। উত্তর ভারত থেকে কলকাতায় আসা তখন সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। বেনারস পর্যন্ত পায়ে হেঁটে এসে, মীরজাপুর থেকে নৌকা ভাড়া করে নদীপথে কলকাতায় আসতে হত। নদীপথে কলকাতায় আসার খরচ বেশ মোটা অঙ্কের ছিল। এটাই কলকাতায় আসার পক্ষে প্রধান অন্তরায় ছিল। আর এক অন্তরায় ছিল পথিমধ্যে দস্যুতার ভয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে স্লীম্যান সাহেব যখন দস্যুতা দমন করলেন, এবং লটারী কমিটি কলকাতাকে নবগঠিত করল, তখন উত্তর ভারতের লোকেরা কলকাতায় এসে ব্যবসা করার প্রতি নিবিষ্ট হল। তারপর ১৮৬২-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী পর্যন্ত রেলপথ স্থাপনের পর উত্তর ভারতের লোকেরা হুড়হুড় করে কলকাতায় আসতে থাকে।

১৮?? খ্রীষ্টাব্দে চার্লস ব্লানসী বনাম ক্ষেত্রপাল সরকার মামলায় ৫৯ জন তুলা ব্যবসায়ীর নাম উল্লিখিত হয়েছিল। তাদের মাত্র ২৩ জন ছিল বাঙালী, আর বাকী ৩৬ জন ইংরেজ, রাজস্থানী, গুজরাটী, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লোক ও উত্তরপ্রদেশের ক্ষেত্রী সম্প্রদায়ের লোক। অবাঙালী ব্যবসায়ীদের মধ্যে নামজাদা ব্যবসায়ী ছিলেন বাবু নিক্কামল, বৈশাজী, নিশারা, জগন্নাথ ট্যাণ্ডন, মাভোজী মিশ্র, জগন্নাথজী মেহেতা, যোধরাজ ধানুকা, ঘনশ্যামদাস গোয়েংকা, ও মুকুন্দলাল বাবু। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে মুকুন্দলাল বাবুর মৃত্যুর সময় তাঁর সম্পত্তির মূল্য ছিল ২৪ লক্ষ টাকা। এ থেকে বোঝা যায় যে, কলকাতার ব্যবসায়ের বেশ একটা বড় অংশ বাঙ্গালীদের হাত থেকে অবাঙ্গালীদের হাতে গিয়ে পড়েছিল।

মুকুন্দলাল বাবুর মৃত্যুর পর কলকাতার ব্যবসায়ের একছত্র অধিপতিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন একজন পারসী ব্যবসায়ী—নাম রুস্তমজী কাওয়াসজী। তিনি তাঁর ব্যবসার সুবিধার জন্য তৎকালীন প্রসিদ্ধ বাঙালী ব্যবসায়ীদের যথা দ্বারকানাথ ঠাকুর, বিশ্বনাথ মতিলাল, রামকমল সেন, বিশ্বম্ভর সেন, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর প্রমুখের সহযোগিতা কামনা করেন। রুস্তমজী কাওয়াসজীর বাড়ী ছিল এখন যেখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজ হয়েছে। আর বাকী অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা এসে নিজেদের আস্তানা গাড়ে বড়বাজার অঞ্চলে বা তার আশপাশে। আগে এ অঞ্চলটা ছিল বাঙালী ব্যবসায়ীদের কেন্দ্র। এখন থেকে এই অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের আগমনই কলকাতায় বাঙ্গালী ব্যবসায়ের পতন সূচনা করে। এর পর বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা হাটখোলা অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল।

উত্তর ভারত থেকে যারা এসেছিল, তারা সকলেই এক প্রদেশভুক্ত বা এক জাতিভুক্ত ছিল না। এদের মধ্যে বেনিয়ানও ছিল, আবার ব্রাহ্মণও ছিল। কেউ এসেছিল উত্তরপ্রদেশের বারাণসী-লক্ষ্নৌ অঞ্চল থেকে, আবার কেউ এসেছিল পাঞ্জাব থেকে। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল 'ক্ষেত্রী' সমাজের লোক। তাদের মধ্যে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ শীতলপ্রসাদ খড়গ হাওড়ায় 'অভ্যুদয় কটন মিল' স্থাপন করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মোহনলাল ক্ষেত্রী হাওড়ার ঘুসুরিতে 'এমপ্রেস অফ ইণ্ডিয়া জুট প্রেস' স্থাপন করেন। তারপর ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব দামোদর চৌবে এসে কলকাতায় শেয়ার ও কোম্পানির কাগজ কেনাবেচার কাজ করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ওমর সিং মণিলাল হীরা জহরতের ব্যবসা শুরু করেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বাদলরাম লছমীনারায়ণ তাঁর সুপ্রসিদ্ধ জরদা ও তাম্বুল বিহারের কারবার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ছাজুরাম চৌধুরী এসে কতকগুলো ইউরোপীয় কোম্পানীর ডিরেক্টর হন। আরও অনেকে এসেছিলেন এবং তাঁরা অনেক রকম ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করেন।

মুসলমান ব্যবসায়ীরাও আসতে শুরু করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে এম. এম. ইসপাহানি চা রপ্তানীর কারবার শুরু করেন। তাছাড়া আরও অনেক মুসলমান ব্যবসায়ী এসে ক্যানিং ষ্ট্রীট ও দিল্লীপটিতে আমদানীকৃত নানা রকম জিনিষের কারবার শুরু করেন।

১৮৬২-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানি দিল্লী পর্যন্ত লাইন স্থাপন করেন। এর ফলে রাজস্থানের লোকদের কলকাতায় আসার পথ সুগম হয়। রাজস্থানীরা দলে দলে কলকাতার দিকে আসতে শুরু করে। মারবাড়ীরা যখন কলকাতায় এসে হাজির হল, তখন ম্যানচেষ্টারে তৈরী কাপড় কলকাতার বাজারে হুড়মুড় করে আসতে আরম্ভ করে দিয়েছিল। সাহেবদের এ সময় ম্যানচেষ্টারের কাপড় বিক্রির জন্য বেনিয়ানের প্রয়োজন ছিল। মাড়বাড়ীরাই বিলাতী কোম্পানিসমূহের বেনিয়ানের পদে নিযুক্ত হয়। কিন্তু যারা এসেছিল, তারা সকলেই পয়সাওয়ালা লোক ছিল না যে বেনিয়ানগিরি করবে। সেজন্য পয়সা উপায়ের তারা অন্য উপায় খুঁজতে থাকে। মারবাড়ীদের একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। তাদের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হয় জুয়ার নেশা। জুয়ার সন্ধান পেলে মারবাড়ী নিছক ব্যবসায়ের দিকে কখনও মন দেয় না।

জুয়ারই সহোদর ভাই হচ্ছে ফাটকা। কেননা ফাটকার জন্য প্রয়োজন হয় ঝুঁকি নেবার বিরাট ক্ষমতা। জুয়াও এই ঝুঁকি নেবার ক্ষমতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। ফাটকার জন্য মারবাড়ী পাটের বাজার ও শেয়ার বাজারকে তাদের উপার্জনের কেন্দ্রস্থল করে নিয়েছিল। শতাব্দীর সূচনায় ও প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মারবাড়ী সমাজ প্রচুর অর্থ করে নিল শেয়ার বাজার থেকে। চিত্তরঞ্জন এভেন্যু-র দু'ধারে জমি কিনে বড় বড় প্রাসাদতুল্য বাড়ী করল মারবাড়ীরা।

পরের তিরিশ বছরে শেয়ার বাজারে এল কয়েকবার জোয়ার ও ভাঁটা। তা সে জোয়ারই হোক আর ভাঁটাই হোক মারবাড়ী ঠিক পয়সা করে নিল। নিঃস্ব হল শুধু সে-সব বাঙ্গালী, যারা রাতারাতি বড়লোক হবার আশায় শেয়ার বাজারে যায় ফাট্‌কা করবার জন্য। এখন শেয়ার বাজারে মাত্র মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী ফার্ম আছে। সমস্ত বাজারটা অবাঙ্গালীর কুক্ষিগত।

এরপর দেশ স্বাধীন হল। সাহেবরা যে যার দেশে চলে গেল। যাবার সময় মারবাড়ীর দল সে-সব ব্যবসাগুলো কিনে নিল। তারপর মাড়োয়ারী রাতারাতি শিল্পপতি হয়ে দাঁড়াল। বাঙ্গালী শুধু দোকানদারি, আর গোলামি করতে লাগল।

আমরা আবার বাঙ্গালীর ব্যবসায়ে ফিরে আসছি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে কলকাতার ব্যবসায়ে রোমাঞ্চকর অভ্যুত্থান ঘটে বটকৃষ্ণ পালের। শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে বেনিয়াটোলায় মামার বাড়ীতে মানুষ হয়ে, জীবন শুরু করেন খোংড়াপটিতে এক মসলার দোকান খুলে। মসলার দোকানে কিছু কিছু বিলাতী ওষুধও রাখতেন। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ ওষুধ ব্যবসায়ী হয়ে দাঁড়ান ও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা পান। আজ বটকৃষ্ণ পালের প্রতিষ্ঠান জীর্ণশীর্ণ। অনুরূপভাবে হিন্দু হোস্টেলের সামান্য বাজার সরকারী করে, কলকাতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন কলকাতার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পুস্তক ব্যবসায়ী ও প্রকাশন সংস্থা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

বটকৃষ্ণ পালের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অনুপ্রেরণা দিয়েছিল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল' কোম্পানি স্থাপনে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আর যেসব বাঙ্গালী কলকাতায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে বিখ্যাত হন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে জবাকুসুম তৈল প্রস্তুতকারক সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোম্পানী, দর্জিপাড়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্-এর প্রতিষ্ঠাতা পি. এম. বাগচী, কে. বি. সেন অ্যাণ্ড কোম্পানি, বিলাতী কাগজ আমদানীকারক চন্দ্রমোহন সুর, প্যারীচরণ সুর ও পান্নালাল শীল, জরীপ যন্ত্র আমদানীকারক যজ্ঞেশ্বর সুর (জে. সুর অ্যাণ্ড কোম্পানি), ষ্টেশনারী দ্রব্যের আমদানীকারক নীলমণি হালদার ও টোটা বন্দুক আমদানীকারক কালীকুমার বিশ্বাস (কে. সি. বিশ্বাস অ্যাণ্ড কোম্পানি) ও দ্বারিকানাথ বিশ্বাস (ডি. এন. বিশ্বাস অ্যাণ্ড কোম্পানি)
।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে স্থাপিত হয় এইচ. বোস অ্যাণ্ড কোম্পানির পারফিউমারী ওয়ার্কস। এইচ. বোস অ্যাণ্ড কোম্পানির 'কুন্তলীন' হেয়ার অয়েল এক সময় বাঙলাদেশে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আরও যেসব বাঙ্গালী প্রখ্যাত ব্যবসায়ী হিসাবে এ সময় সুনাম অর্জন করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন 'হারমোনিয়াম' যন্ত্রের আবিষ্কারক দ্বারকানাথ ঘোষ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ডোয়ার্কিন অ্যাণ্ড সনস্' এক সময় বাঙলাদেশের বাদ্য-যন্ত্র নির্মাণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করত।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এক বিরাট ইংরেজ প্রতিষ্ঠানের অংশীদাররূপে আবির্ভূত হন স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মার্টিন কোম্পানীর অংশীদার হয়ে তিনি পলতা ওয়াটার ওয়ার্কস, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ভবন প্রভৃতি নির্মাণ করেন। ভারতে রেলপথসমূহ স্থাপনও তাঁর কৃতিত্ব। পরে তিনি বার্ন কোম্পানিরও অংশীদার হন। মার্টিন-বার্ন একত্রিত হবার পর 'ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি' নামে বিখ্যাত লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানির পরিচালনভার তাঁর পুত্র স্যার বীরেন মুখার্জীর ওপর পড়ে। সরকারী রোষে পড়ায় তাঁর বড় বড় কোম্পানিসমূহ ভারত সরকার কর্তৃক অধিকৃত হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে স্বদেশী আন্দোলনের আওতায় বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্, মোহিনী মিল, ঢাকেশ্বরী কটন মিল প্রভৃতি কাপড়ের কলগুলি বাঙ্গালীর মূলধনে ও বাঙ্গ

ালীর পরিচালনে স্থাপিত হয়। বিংশ শতাব্দীর আরও কয়েকজন বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর কথা বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করব। ৬০ বছর পূর্বে করুণা কুমার কর 'কে. কে. কর অ্যাণ্ড কোম্পানি স্থাপন করেন। এঁরা ৮০টি কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট ছিলেন। এখন এঁদের কোম্পানিগুলি সবই উঠে গেছে। একমাত্র 'নাগা হিল টি কোম্পানি' জীবিত আছে, তবে অবাঙ্গালীর হাতে। সমসাময়িককালে বাঙ্গালীর উদ্যোগে জলপাইগুড়িতে অনেকগুলি চা-বাগিচা কোম্পানি স্থাপিত হয়, তবে সেগুলি মোটামুটি এখনও বাঙ্গালীর হাতে আছে। ওই সময় শেঠ কোম্পানি ও কে.সি.বসু বিস্কুট বার্লির কারবার করে। এর প্রথমটা আছে, দ্বিতীয়টা নেই। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে এন. সি. সরকার অ্যাণ্ড সনস্ বহু কয়লাখনি কোম্পানি স্থাপন করে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে চ্যাটার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানি সাতগ্রাম কোল কোম্পানি লিমিটেড স্থাপন করে। কিন্তু বাঙ্গালী পরিচালিত এ সকল কয়লাখনি কোম্পানি বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে উঠে যায়।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙালী প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে বাঙালী জনসমাজের সর্বনাশ করে। পরে স্থাপিত বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাংক, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাংক, কুমিল্লা ব্যাংকিং কর্পোরেশন ও হুগলী ব্যাংক একত্রিত হয়ে ইউনাইটেউ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া নাম ধারণ করে এখন এদেশে সরকার পরিচালিত অন্যতম বড় ব্যাংক হিসাবে কাজ করছে। কিন্তু অন্তর্বর্তীকালে ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে গিয়ে আবার বাঙালী সমাজকে বিপর্যস্ত করেছে। ওই সময় হেমেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিসমূহও উঠে যায়।

মধ্যে সামান্য অবস্থা থেকে উঠে আলামোহন দাশ দাশনগরে এক বিরাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, কিন্তু আজ তা ভারত সরকারের পরিচালনাধীনে।

বিংশ শতাব্দীর তিনটি সাফল্যমণ্ডিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বেঙ্গল ইম্যুনিটি কোম্পানি, ক্যালকাটা কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ ও সুলেখা ইংক ফ্যাক্টরী।

শেষ যে বাঙালী যৌথ মূলধনী কোম্পানিসমূহ অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছিল, তারা হচ্ছে কে. এন.মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানি ও রণবীর চৌধুরী। কিন্তু আজ তাঁরা নানা রকমভাবে বিপর্যস্ত। প্রথম প্রতিষ্ঠানের ন্যাশনাল রবার ও ইনচেক টায়ার ভারত সরকার কর্তৃক অধিকৃত।

সকলের শেষে আর একটি বাঙালী প্রতিষ্ঠানের কথা বলব। সেটা হচ্ছে সেন র‍্যালে অ্যাণ্ড কোম্পানি। এঁরা সাইকেল নির্মাণ করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন।

তবে আজও বাঙালী ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকলে কি হবে? অবাঙালী রুই-কাতলার মধ্যে সে চুনো-পুঁটি হিসাবে কোন রকমে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। দোকানদারী ক্ষেত্রে অবশ্য বাঙালীর এখনও প্রাধান্য আছে মেয়েদের শাড়ী ও অলংকারের ক্ষেত্রে। কিন্তু তাও কতদিন থাকবে জানি না। কেননা, ব্যবসা ক্ষেত্রের প্রতি অংশ থেকেই বাঙ্গালী আজ হটে যাচ্ছে। তাছাড়া বাঙালীর ভিটাগুলোও মারবাড়ীরা কিনে নিচ্ছে। এখন বাঙ্গালীর অবস্থা হচ্ছে 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা?'

# ৩৩ কলকাতার ফেরিওয়ালা

ইংরেজদের রাজা অমর। তারা বলে 'দি কিং ইজ ডেড্ লঙ লিভ দি কিং'। কথাটা কলকাতার ফেরিওয়ালাদের ক্ষেত্রেও খাটে। কলকাতার ফেরিওয়ালারা অমর। কালে কালে তাদের মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু তারা পুনর্ভূ হয়েছে অন্য বেসাত নিয়ে। ফেরিওয়ালাদের পরিচয় তাদের ডাকে। 'মিশি লেবে গো', 'কুয়োর ঘটি তোলাবে গো' ইত্যাদি উনিশ শতকের ফেরিওয়ালার পরিচিত ডাক। শতাব্দীর চাকা ঘোরবার আগেই তাদের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটেছে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের অনেক ফেরিওয়ালার ডাকও স্তব্ধ। যেমন 'টাকায় চারখানা কাপড়, একখানা ফাউ', 'এক পয়সায় চারখানা দেশলাই', 'রাম রাম সিগারেট, এক পয়সায় দশটা', 'নাকের আসল মুক্তা লেবে গো' ইত্যাদি। আরও অন্তর্হিত হয়েছে আমার ছেলেবেলার অনেক ফেরিওয়ালার ডাক। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে না উঠতে শুনতাম 'চাই মুড়ির চাক' 'ছোলার চাক চিঁড়ের চাক' বা শীতকালে ভোরবেলা 'চাই খেজুর রস'।

সকাল থেকে আরও অনেক ফেরিওয়ালা আসত। প্রথম আসত বাংলা কালিওয়ালা। চাল পুড়িয়ে তার ভুষো দিয়ে এই কালি তৈরি করা হত। শহরের সব দোকানদারই এই বাংলা কালি দিয়ে লিখত, খাগের কলমে। তারপর আসত আতর ও ফুলেল তেলওয়ালা। সঙ্গে সঙ্গে কাবুলিওয়ালার পরিচিত কণ্ঠ শোনা যেত 'চাই হিং'। পর পর আসত ধোপা ও নাপিত। (তখন কলকাতায় লি বা সেলুন ছিল না।) দুধওয়ালারও আবির্ভাব ঘটত সঙ্গে সঙ্গে। আরও আসত বাড়ি বাড়ি ঠাকুরদের গান করবার জন্য নামসঙ্কীর্তনের দল।

একটু পরেই শোনা যেত 'তিলফুট, চন্দরপুলি, 'জিভেগজা', 'পাঁপড় চাই', 'শিল কাটাবে গো', 'ধামা বাঁধাবে গো', 'ছুরি কাঁচি ব'টি সান দেবে গো', 'প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ, লক্ষ্মীর পাঁচালী', 'চাই আমসত্তর', 'ছাতা সারাবে গো', 'রিপুকর্ম করাবে গো', 'কাপড় কোঁচাবে গো', 'শিশি বোতল কাগজ চাই', 'মাথার চুল বাঁধার ফিতে এক পয়সায় পাঁচ হাত'। সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিত ফলওয়ালা , আম, কালোজাম, গোলাপজাম, লিচু, আঙুর, বেদানা, ন্যাসপাতি ইত্যাদি বেচবার জন্য। এর মধ্যেই দেখা দিয়ে যেত তারের ধাঁধাওয়ালা ও কাগজের ফুল ও বাঁশিওয়ালা।

মেয়ে ফেরিওয়ালাদের মধ্যে আসত কয়লাওয়ালী এরা মাথায় ঝুড়ি করে কয়লা বেচত), ঘুঁটেওয়ালী, মাটিওয়ালী। এরা সবাই অবাঙালী। বাঙালী মেয়ে ফেরিওয়ালীর মধ্যে ছিল বসবার পিঁড়ে, টুল, জলচৌকি ইত্যাদি বিক্রিওয়ালীরা। এদের পুরুষরা বাড়িতে বসে এগুলো তৈরি করত, আর মেয়েরা ফেরি করত।

দুপুরের আগেই আসত চাষীরা মাথায় থলে ভরতি ধান, সরষে, হলুদ নিয়ে পাইকারি দরে সেগুলো গেরস্ত লোকদের বেচবার জন্য।

দুপুরের পরে আসত চুড়িওয়ালীর দল, মেয়েদের হাতে কাঁচের চুড়ি পরাবার জন্য। এরা সবাই উত্তরপ্রদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক। অবশ্য অনেক বাঙালী মেয়ে

ফেরিওয়ালীর ডাক শোনা যেত, 'দাঁতের পোকা বের করাবে গো, 'বাত সারাবে গো', 'ভানুমতীর খেল সাপের খেল দেখবে গো'। আরও আসত বাসনওয়ালীর দল, পুরানো কাপড়ের পরিবর্তে নূতন বাসন দেবার জন্য। আর আসত তাঁতি বউ, বাড়ি বাড়ি তাঁতের শাড়ি বেচবার জন্য। কাঁসরের আওয়াজ শুনলেই বোঝা যেত এবার আসছে কাঁসার বাসন বিক্রিওয়ালা। তার আগেই ঘুরে যেত পাথরের বাসনওয়ালা। (তখনকার দিনে প্রতি পরিবারে কাঁসার বাসন ছাড়া বহু পাথরের বাসন ব্যবহৃত হত।) দুপুরবেলা আরও অনেক ফেরিওয়ালা আসত,—মালাই বরফওয়ালা, পা  I রবফওয়ালা, 'বুড়ির মাথার পাকাচুল', আলুকাবলি ও ফুচকাওয়ালা। বিকেলের দিকে আসত চানাচুরওয়ালা, মস্ত বড় এক বারকোষের ওপর চানাচুর সাজানো থাকত। গরম রাখবার জন্য মাঝখানে একটা ছোট হাঁড়িতে কাঠকয়লা জ্বালা থাকত। প্যাকেট করে চানাচুর তখন বিক্রি হত না।

বিকেলবেলা চ্যাঙারি মাথায় করে গলায় পৈতে ঝোলানো ফেরিওয়ালার ডাক শোনা যেত 'চাই পাউরুটি বিস্কুট'। আমাদের পাড়ায় দু-তিনখানা পাউরুটির কারখানা ছিল। সেখানে দেখতুম একটা হুকে অনেক পৈতে ঝোলানো থাকত। ফেরিওয়ালা পথে বেরুবার আগে একটা পৈতে পরে নিত। লোক বামুনের হাতের পাউরুটি খাচ্ছি বলে বিশ্বাস করত। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের রুটি অবশ্য পাওয়া যেত, এবং যদিও তার মোড়কের ওপর লেখা থাকত 'হস্তদ্বারা স্পৃষ্ট নয়' তাহলেও নিষ্ঠাবান পরিবারের লোক তা খেত না। পাউরুটিওয়ালার পরেই আসত কেরোসিন তেলওয়ালা। বোতলে তেল ভরে দিয়ে দরজার মাথার ফ্রেমে খড়ি দিয়ে একটা দাঁড়ি টেনে দিত। মাসকাবার হলে ওই দাঁড়ির হিসাবে পাওনা কড়ি মিটিয়ে নিত। সন্ধ্যের মুখে আসত কুলপি বরফওয়ালা, তপসে মাছওয়ালা, ঘুগনি ও অবাক জলপানওয়ালা, 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা', 'কুড়মুড় ভাজা' ইত্যাদি। রাত্রে আসত বেলফুলের মালাওয়ালা ও 'হীরেমতী রাক্ষুসী'।

আমি এখন বাগবাজারে কলকাতার এক অতি পুরানো পাড়ায় থাকি। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ফেরিওয়ালার আনাগোনার শেষ নেই। যে ডাকগুলো শুনি, তা থেকে বুঝে নিন্ আগেকার কোনগুলো আছে আর এখন নতুন কি সৃষ্টি হয়েছে। 'রিপুকর্ম চাই', 'ছেঁড়া কাপড় আছে, কাপড়', 'ঘড়িওয়ালা, পুরানো ঘড়ি, অচল ঘড়ি', 'পুরানো জুতা আছে, চামড়ার জুতা', 'প্রথম ভাগ', দ্বিতীয় ভাগ, লক্ষ্মীর পাঁচালী', 'এই প্লাস্‌টিকস পুরানো', 'টিন লোহা, প্লাসটিকস', 'শিশি বোতল হবে', 'পুরানো কাগজ খাতা বই', 'পুরানো টিনের কৌটার বদলে বাসন', 'শিল কাটাবো গো', 'পাতিলেবু', 'চালের খুদ আছে গো', 'ইলিশ মাছ', 'মুড়ি-ই-ই', 'ঘুটে রাখবে', 'মাটি, মাটি লেবে গো', 'ইষ্টিলের বাসন লেবে মা, বাসন', 'মধু লেবে গো', 'লোহা প্লাস্‌টিকস্', 'ছাতা সারাবে, ফোল্ডিং ছাতা', 'ইঁদুর মারা বিষ, আরশোলা, ছারপোকা মারবে', 'আলুকাবলি', 'হজমি গুলি', 'মিষ্টি পান', বাংলা পান', 'চাই পাঁঠার ঘুগনি', 'চাই ভেলপুরি', ইত্যাদি। এখন প্রাতঃকালের প্রথম ডাক হচ্ছে 'কেরোসিন'। তবে কেরোসিনওয়ালা এখন আর দরজার মাথার ফ্রেমে খড়ি দিয়ে দাগ কাটে না। তার নীতি হচ্ছে—'ফেল কড়ি, নাও তেল'।

# ৩৩০ কলকাতায় জুয়ার ঢেউ

প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) দু-তিন বছর আগের কথা। তখন আমাদের বাড়ি ছিল শ্যামবাজার স্ট্রীটের ওপর, পাঁচমাথার অতি সন্নিকটে। আমাদের বাড়ির বিপরীত দিকের ফুটপাথের সামনে কতকগুলি খোলার চালবিশিষ্ট দোকানঘর ছিল। দোকানঘরগুলির পর একটা সরু গলি। ওই গলির ভিতর ছিল একটা তুলোর দোকান। দোকানের নিশানাস্বরূপ গলির মুখে বড় রাস্তার উপর তুলোওয়ালা ঝুলিয়ে রাখত একটা তুলো-ভরা ঝুড়ি। আমরা ওই গলিটাকে তুলোর গলি বলতাম। আর ওই খোলার চালের ঘরগুলির মধ্যে একখানা ঘরে ছিল এক ভদ্রলোকের দোকান। নানা জায়গার নিলাম থেকে তিনি নানা রকমের জিনিস কিনে এনে গাদা করতেন ওই দোকানঘরটিতে। আমি তখন ছেলেমানুষ। ছোট ছেলের কৌতূহলী মন নিয়ে ওই দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দেখতাম তাঁর নানারকমের বিচিত্র পণ্যসম্ভার।

একদিন দেখি, তাঁর দোকানের সামনে ঝুলছে একখানা সাইনবোর্ড—মাপে এক হাত চওড়া ও দু হাত খাড়াই। বোর্ডটির মাথায় লেখা 'আমেরিকান কটন ফিগার'। আর তার নিচে দশটা লাইন, প্রত্যেক লাইনের গোড়ায় লেখা আছে যথাক্রমে ওয়ান, টু, থ্রি ইত্যাদি—এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা।

যেদিন ওই সাইনবোর্ডটা প্রথম দেখলুম, অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলুম সেটার দিকে। জিনিসটা কী, তা বুঝবার চেষ্টা করলুম। ওটার মাথায় লেখা 'আমেরিকান কটন ফিগার' শব্দ ক'টার অর্থ করতে লাগলুম। ভূগোলের বইয়ে পড়েছিলুম যে, আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পারে আমেরিকা নামে একটা দেশ আছে। সুতরাং অর্থ করলুম 'আমেরিকান' মানে আমেরিকা দেশ সংক্রান্ত কোন ব্যাপার। ওয়ার্ডবুকে পড়েছিলুম 'কটন' মানে তুলো, আর 'ফিগার' মানে সংখ্যা। 'ফিগার' সম্বন্ধে কোন গোলমালই হল ন, কেননা চোখের সামনেই বোর্ডের ওপর তো দেখলুম এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা। এখন সমস্যা হল, এটা আমেরিকা দেশের তুলোর কী সংখ্যা? প্রথম ভাবলুম, বোধ হয় এটা তুলোর দামের সংখ্যা। মনে মনে ভাবলুম, তবে কি ইনি ওই পাশের গলির দেশী তুলো-ব্যবসায়ীর সঙ্গে তুলোর প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা শুরু করলেন? লোকটার প্রতি বেশ রুষ্ট হলুম ও ওই তুলোর গলির তুলোওয়ালার ওপর সহানুভূতি হল। তারপর দোকানের ভিতরটায় ভাল করে তাকিয়ে দেখলুম। না, কোন জায়গায় তো তুলোর নামগন্ধ নেই। তখন ভাবলুম বোধ হয় ভদ্রলোক কোন নিলাম থেকে বোর্ডখানা কিনে এনেছেন ও দোকানের সামনে টাঙিয়ে দিয়েছেন। এই কথা ভেবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাড়ি ফিরে গেলুম।

কিন্তু এই স্বস্তি মাত্র এক রাত্তির স্থায়ী হল। পরের দিন দেখি যে, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের ওপর মল্লিকদের পাকা ঘরে যে সকল স্টীল ট্রাঙ্কের দোকান ছিল, সে গুলির প্রত্যেক দোকানের সামনে ঝুলছে অনুরূপ সাইনবোর্ড। তখন আবার ভাবলুম, না, এরা সকলে জোট বেঁধে তুলোর ব্যবসাই শুরু করছে। তুলোর গলির তুলোওয়ালা বেচারীর কী হাল হবে, ভেবে মনে মনে খুব কষ্ট পেলুম।

আমার বাবা ছিলেন চিকিৎসক। তাঁর ডাক্তারখানা ছিল ঠিক শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর বিপরীত দিকের ফুটপাতের ওপর সামনের ঘরে। বাবার ডাক্তারখানায় যাবার পথে রোজই ওই দোকানঘরগুলোর ভিতর উঁকি মেরে দেখতুম, ওদের তুলো এল কিনা। তুলোর কোন হদিশ না পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলুম, যাক, যে কদিন ওদের তুলো না আসে সে কদিন বেচারী তুলোওয়ালা বেঁচে যাবে।

এরপর যখন আরও দোকানঘরের সামনে 'আমেরিকান কটন ফিগার'-এর সাইনবোর্ড ঝুলতে দেখলুম তখন কৌতূহলী হয়ে একদিন আমার বড়দাকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'বড়দা, দেখেছ বেচারী তুলোওয়ালাকে মারবার জন্য কত তুলোর দোকান হয়েছে। কিন্তু ওদের দোকানে তুলো নেই কেন?' আমার কথা শুনে বড়দা তো হেসেই খুন। বললেন, 'আরে পাগল, ওগুলো তুলোর দোকান নয়। ওগুলো 'তুলোর খেলা। নামে একরকম জুয়ার দোকান।' বড়দাকে জিজ্ঞাসা করতে বড়দা আমাকে জুয়াটা বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, দেখেছিস তো, ওই বোর্ডগুলিতে এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা লেখা আছে। আজ যদি কেউ কোন সংখ্যায় এক আনা পয়সা লাগায় আর সামনে কাল যদি সেই সংখ্যা ওঠে, তা হলে সে কাল আট খানা পয়সা পাবে। পয়সা লাগাবার সময় ওরা একটা রসিদ দেয়, আর কাল ওই রসিদটা দেখালেই ওরা আট আনা পয়সা দিয়ে দেয়।' বড়দাকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'আচ্ছা, প্রত্যেক দোকানে কি আলাদা অলাদা নম্বর ওঠে?' বড়দা বললেন, 'না; সব দোকানে একই নম্বর ওঠে। নম্বরটা ঠিক করে দেয় বড়বাজারের মারবাড়ী জুয়াড়ীরা। সেখানেই তুলোর খেলার স্নায়ুকেন্দ্র। সকল দোকানকেই সেই নম্বর মানতে হয়। কেননা, এরা সকলেই হচ্ছে তাদের 'বুকী'। 'বুকী' শব্দটার অর্থ কী, তাও বড়দা বুঝিয়ে দিলেন।

তখনকার দিনের স্কুল-কলেজের ছেলেদের একটা অভ্যাস ছিল। বিকালবেলায় তারা হয় হেদুয়ায় আর তা নয়তো গোলদীঘিতে বেড়াতে যেত। আমার বড়দাও যেতেন। একদিন বড়দার সঙ্গে আমিও বেড়াতে গেলুম। দেখি, শ্যামবাজারের মোড় থেকে শুরু করে কলেজ স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত রাস্তার দুধারে অসংখ্য দোকানের সামনে ঝুলছে সেই একই সাইনবোর্ড—'আমেরিকান কটন ফিগার।'

এক কথায় রাতারাতি কলকাতা শহরে গজিয়ে উঠল হাজার হাজার তুলোর খেলার দোকান। খেলাটা শহরের লোককে এমনভাবে আকৃষ্ট করল যে সারা শহরে জুয়ার বন্যা বয়ে গেল। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। বাড়ির কর্তা খেলেন, গিন্নী খেলেন। বৌ খেলে, মেয়ে খেলে। ছেলে খেলে, জামাই খেলে। রাঁধুনী বামুন খেলে, ঝি-চাকর খেলে। মুটে, মজুর খেলে। দোকানদার খেলে, ব্যবসাপতি খেলে। এক কথায় শহরের সকল শ্রেণী, সম্প্রদায় ও স্তরের লোকই তুলোর খেলায় মত্ত হয়ে উঠল। এমন কী স্কুলের ছেলেরাও মারবেল গুলি নিয়ে ওই খেলা খেলতে শুরু করে দিল।

তুলোর খেলায় যে নম্বরটা উঠত, সেটা আমেরিকার নিউ অরলীন্‌স শহরের তুলোর ফাটকা-বাজারের দরের ভিত্তিতে নির্ধারিত হত। তুলোর খেলার যে বোর্ডগুলো দোকানের সামনে টাঙানো থাকত, তাতে এক থেকে দশ নম্বর ছাড়া আরও দু-তিনটি বহু-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা থাকত। সকলেরই ধান্ধা ছিল ওই সংখ্যাগুলি থেকে পরদিনের নম্বর আবিষ্কার করা।

আমার বাবার ডাক্তারখানায় বিকাল বেলায় তিন বৃদ্ধ মিলিত হতেন। তাঁদের মধ্যে প্রথম জন ছিলেন গোপালচন্দ্র দাস মশায়। তিনি বাংলা ভাষার অভিধান সংকলক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মশায়ের জ্যাঠামশায়। জ্ঞানেন্দ্রবাবু প্রায়ই তাঁর জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। সেজন্য জ্ঞানেন্দ্রবাবুকে আমি ছেলেবেলা থেকেই জানতাম। বোধহয় গোপালবাবুই শহরের একমাত্র লোক যিনি তুলোর খেলা খেলতেন না। অপর দুজন ছিলেন সিংগী মশায় ও মিত্তির মশায়। জ্যোতিষী হিসাবে সিংহী মশায়ের বেশ নামডাক ছিল। তিনি একবার আমার হাত দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, লেখা-পড়া আমার মোটেই হবে না, আমি ভবিষ্যতে ছুতোরের কাজে বিশেষ দক্ষ হব। সিংগী মশায় জ্যোতিষের সাহায্যে নম্বর বের করে তুলোর খেলা খেলতেন। মাঝে মাঝে তিনি সফল হতেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই অকৃতকার্য হতেন।

মিত্তির মশায় আগে অ্যাকাউনটেণ্ট-জেনারেলের অফিসে চাকরি করতেন। তুলোর খেলার সময় তিনি অবসরপ্রাপ্ত বেকার। তিনি সারাদিন ধরে ওই বহুসংখ্যাবিশিষ্ট রাশিগুলি নিয়ে অঙ্ক কষতেন, আর পরের দিনের সংখ্যা বের করবার চেষ্টা করতেন। একদিন বিকাল বেলায় মিত্তির মশায় বেশ উৎফুল্ল হয়ে এসে বাবাকে বললেন, 'ডাক্তার, কেল্লা ফতে, শালা, অমুকের বাচ্চারা আর কতদিন আমাদের ঠকাবে। অঙ্ক কষে নম্বরের সূত্র বের করে ফেলেছি। কালকের নম্বর হচ্ছে নয়।'' আমার বাবা, সিংগী মশায় ও মিত্তির মশায়—এই তিন জনেই সেদিন ৯ নম্বরে এক টাকা করে লাগিয়ে দিলেন। সে-রাতটা আমার ঘুম হল না, পরদিনের জন্য খুব উৎসুক হয়ে রইলুম। পরদিন দেখি '— 'ভো কাটটা'। উঠল ছয় নম্বর। নয় নম্বরের বদলে ছয় নম্বর ওঠায় তিন জনের টাকাই নয় ছয় হয়ে গেল।

এই রকমভাবে সমস্ত শহরের লোকই সেদিন কালকের নম্বর কী আসবে, তাই জল্পনা-কল্পনা, অঙ্ক কষাকষি ও জ্যোতিষের শ্রাদ্ধ করতে লাগল। কিন্তু কেউ কারুকে বলতে চাইত না সে সেদিন কোন্ নম্বরে বাজি লাগিয়েছে, পাছে আর কেউ সেটা জানতে পেরে লাভবান হয়। যার নম্বর উঠত, সে সেদিন বুক ফুলিয়ে হাঁটত। আর যার উঠত না, সে আবার বেপরোয়া হয়ে 'যুদ্ধং দেহি' বলে পরের দিনের জন্য প্রস্তুত হত।

সেদিন আমাদের বাড়ির সংলগ্ন মল্লিকদের বাড়ির ঝি একথালা সন্দেশ এনে মার সামনে রাখল। বলল, 'মা পাঠিয়ে দিলেন।' তখনকার দিনে কোন সুসংবাদ থাকলে প্রতিবেশীরা পরস্পরের বাড়ি সন্দেশ পাঠিয়ে সংবাদটা দিতেন। (শব্দতাত্ত্বিকদের এটা গবেষণার বিষয় যে 'সন্দেশ' শব্দের অর্থ 'সংবাদ', এই প্রথা থেকে উদ্ভুত হয়েছে কিনা—)। 'মা মল্লিক বাড়ির ঝিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী সংবাদ গো?' ঝি উত্তরে বলল, মা আজ বাজিমাৎ করেছেন কি না, তাই এই সন্দেশ পাঠিয়ে দিলেন।' মল্লিক বাড়ির ছাদের পাঁচিলের ধারে দাঁড়ালেই আমাদের বাড়ির লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা যেত। কিছু পরেই পাঁচিলের ধারে মল্লিক গিন্নীর আবির্ভাব। উচ্চকণ্ঠে তিনি ডাকছেন, 'ও দিদি, ও দিদি, একটা সুসংবাদ শোন। পরশু রাত্তিরে স্বপ্নে দেখি যে মা চণ্ডী স্বয়ং আবির্ভূতা হয়ে বলছেন, কাল তুই পাঁচ নম্বরে পাঁচ টাকা লাগা।' তাই কাল পাঁচ নম্বরে পাঁচ টাকা লাগিয়েছিলুম। আজ চল্লিশ টাকা পেয়েছি।' তারপর এক গাল হেসে বললেন, 'বুঝেছ,

কর্তার এক মাসের মাইনের চেয়েও বেশি।' মা ক্লিষ্ট মনে কথাটা শুনলেন, কেননা মায়ের নম্বর ওঠেনি। মা মল্লিক বাড়ির ঝিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যারে, তুই তো গিন্নীমার নম্বর দোকানে লাগিয়ে আসিস, তা তুই পাঁচ নম্বরে কিছু লাগাস নি?' মল্লিকবাড়ির ঝি বলল, 'তা আর কী করে লাগাই বল না, গিন্নী যে ছেলের দিব্যি দিয়ে দেয়। একটা ছেলে নিয়ে ঘর করি, কী করে ওই দিব্যি অমান্যি করি বল।' বস্তুত, এই সময় মানুষের মনে স্বার্থপরতা খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল, কেউ চাইত না যে; তার নম্বরের সাহায্যে অপরে লাভবান হয়। সকলের একই চিন্তা। কালকের নম্বর কী ভাবে আবিষ্কার করা যাবে। মল্লিক গিন্নীর সাফল্যের কথা শুনে, আমাদের পাড়ার অনেকেই কালীঘাটে গিয়ে মানত করল, 'মা, আমাকে কিছু টাকা পাইয়ে দাও, আমি টাকায় এক আনা হারে তোমার পুজো দিয়ে যাব।' অনেকে আবার অন্যান্য কালীতলায় গিয়ে গণনা করাতে লাগল।

এইভাবে সারা শহরে প্রবাহিত হল জুয়ার বন্যা। লোক এক আনা লাগিয়ে আট আনা পেলে, আগেকার নষ্টধন উদ্ধারের জন্য আট আনাই লাগিয়ে দিত পরের দিনের জন্য অন্য নম্বরে। সকলেরই এক আকাঙক্ষা, অপরকে টেক্কা দেওয়া। এই টেক্কা দেওয়ার আকাঙক্ষা এমন তীব্রভাবে লোককে আক্রান্ত করল যে, লোকে দশ আনা পয়সা খরচ করে দুখানা রসিদ কাটাতে লাগল—একখানা জোড় সংখ্যার, আর একখানা বিজোড় সংখ্যার। নম্বর-এর আর পালাবার উপায় নেই। জোড় নম্বর উঠলে, লোক মাত্র জোড় নম্বরের রসিদখানা অপরকে দেখিয়ে গর্ববোধ করত। আর যদি বিজোড় নম্বর উঠত, তাহলে বিজোড় সংখ্যার রসিদ খানা দেখাত। আশ্চর্য হয়ে গিয়ে লোক পরস্পর বলাবলি করত, 'দেখ, অমুকের বরাত কী, রোজই বাজিমাৎ করছে।' প্রথম যারা এটা করত, তারা এটাকে গোপন রাখত। কিন্তু যখন রহস্যটা ফাঁস হয়ে গেল, তখন সকলেই ওই একই পথ অবলম্বন করল। ফলে, দশ আনা লাগিয়ে লোকে আট আনা পেতে লাগল। আজকের দিনের লোক বুঝতে পারবে না যে, সেদিন ওই দু আনা ক্ষতির পরিমাণ কত বড়। কেননা, তখনকার দিনে যে-কোন মধ্যবিত্ত পরিবারের দৈনিক বাজার খরচ হত মোট চার আনা। সেদিনকার দিনে বাজারে পারশে, ট্যাংরা, বাগদা চিংড়ি, ভেটকি প্রভৃতি মাছের দর ছিল তিন আনা থেকে চার আনা সের, আর কাটা বড় রুই মাছের দর ছিল ছয় আনা সের। তিনটা বড় বড় বেগুন পাওয়া যেত এক পয়সায়, আলুর সের ছিল দু পয়সা থেকে চার পয়সা, আধ পয়সায় এক আঁটি নটে কিংবা কলমী শাক পাওয়া যেত, যার ওজন হবে আধ সেরের কাছাকাছি। মাংস ছয় আনা সের ছিল, আর হাঁসের ডিমের দাম ছিল এক পয়সায় একটা।

সুতরাং শেষের দিকে যখন পরস্পরকে টেক্কা দেওয়ার জেদ মানুষকে গ্রাস করল, তখন বহুলোক ও পরিবার তুলোর খেলার প্রকোপে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। সংবাদপত্রে এই নিয়ে আন্দোলন হতে লাগল। খেলার সূচনা থেকে প্রায় আট দশ মাস উত্তীর্ণ হবার পর সরকার খেলাটা বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু যারা সর্বস্বান্ত হল, তাদের প্রায় সবাই বাঙালী, আর যাদের সিন্দুকে বাঙালীর পয়সাটা গিয়ে পৌঁছল, তারা মারবাড়ী।

খেলাটা উঠে যাবার পর আবার রাতারাতি পট পরিবর্তন হল। কেউ তুলোর খেলার

দোকানকে রূপান্তরিত করল খাবারের দোকানে, কেউ ডাইং-ক্লিনিং-এর দোকানে, কেউ ছাতার দোকানে, কেউ ঘড়ির দোকানে, কেউ স্টীল ট্রাঙ্কের দোকানে, কেউ বা আবার চপ-কাটলেটের দোকানে।

শহরের বুকের ওপর প্রকাশ্যভাবে দিনের আলোয় এরূপ ব্যাপক জুয়ার স্রোত পূর্বে বা পরে আর কখনও হয়নি।

## ৩৩ কলকাতার শেয়ার বাজার

১৯৩৬ সালে সবেমাত্র স্টক একসচেঞ্জের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার পদে নিযুক্ত হয়েছি। পথে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বন্ধু বললেন, 'কী, শেষকালে ভবের তরী এমন এক ঘাটে ভেড়ালেন, যেখানে ধনস্থানে শনিলাভ ঘটে।' বন্ধু যে সত্যের অপলাপ করেছিলেন, তা নয়। তবে, শেয়ার বাজারের সংস্পর্শে এলে, লোকে যেমন শনির কোপে পড়ে, তেমনই আবার একাদশ বৃহস্পতির যোগও ঘটে। শেয়ার বাজারে লোকে যেমন সর্বস্বান্ত হয়, তেমনই আবার রাতারাতি বড়লোকও হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনেক বাঙালীই শেয়ার বাজার থেকে পয়সা কামিয়েছেন। তাদের মধ্যে দুজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হচ্ছেন রাজা রামমোহন রায় ও রানী রাসমণি।

তার মানে, শেয়ার বাজার হচ্ছে শাঁখের করাত। অদৃষ্টের চাকা এখানে দুদিকেই ঘোরে, শেয়ার বাজারে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা আমার চোখের সামনেই ঘটল। আমি ১৯৩৬ সালের অকটোবর মাসে যেদিন স্টক একসচেঞ্জের চাকরিতে ঢুকলাম, সেদিন ইনডিয়ান আয়রন শেয়ারের দাম ছিল ছ টাকা বার আনা। তখন ইনডিয়ান আয়রনের প্রতি লোকের দারুণ আকর্ষণ। সকলেই ইনডিয়ান আয়রন কিনছে। দামও ধীরে ধীরে উঠছে। বড়দিনের ছুটির আগে দাম উঠে দাঁড়াল আঠার টাকা আট আনায়। তার মানে, তিন মাসে দাম বার টাকা এগিয়ে গেল।

কিন্তু পরের তিন মাসে যা ঘটল তা অভূতপূর্ব। প্রত্যহই ইনডিয়ান আয়রন-এর দাম লাফাতে লাগল। দুনিয়ার সকলের কাছেই সেদিন ইনডিয়ান আয়রন স্বর্ণতরু বলে মনে হয়েছিল— যা মাত্র নাড়া দিলেই টাকা ঝরে পড়বে। সেদিন দেখেছি, পথচারী অন্য কাজে ব্যবসা-পাড়ায় এসে যাবার পথে দু-চারশ আয়রন কিনছে, আর ফেরবার পথে পাঁচ-সাতশ টাকা মুনাফা নিয়ে ঘরে যাচ্ছে। পানওয়ালা, বিড়িওয়ালা, ফেরিওয়ালা, কেউ সেদিন বাদ যায়নি। সকলেই ইনডিয়ান আয়রন কিনে রোজ দু-চারশ টাকা কামিয়েছে।

১৯৩৭ সালের প্রথম তিন মাস এইভাবেই কাটল। সকলের কাছেই সেদিন ইনডিয়ান আয়রণ পরশমণি। তারপর এপ্রিল মাসের চার তারিখের কথা। বেলা সাড়ে বারোটার সময় আমার ঘরে একজন দালাল ঢুকলেন, কী একটা পরামর্শের জন্যে। জিজ্ঞেস করলাম, 'জী, আয়রনকা ভাও ক্যায়া?' বললেন, ৭৯ টাকা ১২ আনা। সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ উৎসাহ ও উত্তেজনার সঙ্গে বললেন, 'দেখিয়ে না, পনর দিনকা বীচমে আয়রনকা ভাও সৌ রূপিয়াসে জিয়াদা হো যায়েগা।' এই কথা উনি বলবার পরমুহূর্তেই শুনতে পেলাম, বাজার থেকে উত্থিত হল এক আর্তনাদ। শব্দ শুনতেই দালালটি বাজারের দিকে ছুটলেন।

আমি ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কি?' উত্তর এল, 'নেপালের এক রানা ৮০,০০০ আয়রন বেচেছেন, আয়রনের দাম পড়ছে।' পড়তে পড়তে কয়েক লহমার মধ্যেই আয়রন-এর দাম নেমে এল ৬০ টাকায়। যারা আয়রন কিনেছিল, তাদের প্রত্যেকেরই শেয়ার প্রতি বিশ টাকা করে লোকসান হল। সেদিনের কেনাবেচার ফলে, মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াল আঠার কোটি টাকা। অনেকেই সর্বস্বান্ত হল। সাধারণ লোক পালিয়ে গেল। সমস্ত লোকসানের বোঝাটা বাজারের দালালদের ঘাড়ে চাপল। কর্তৃপক্ষ লেনদেনের হিসাব চুকাবার জন্য বাজার দুদিনের জন্য বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু এই দুদিনের মধ্যেই বাজারের দালালরা ওই আঠার কোটি টাকার ঘাটতি এমন সুষ্ঠুভাবে মেটালেন যে, 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা এক প্রবন্ধ লিখে স্টক একসচেঞ্জকে অভিনন্দন জানালো।

শেয়ার বাজার চিড়িয়াখানা নয়, কিন্তু চিড়িয়াখানার অনেক জন্তুজানোয়ারের নাম শেয়ার বাজারের দালালরা বহন করে। যেমন 'বুল' বা ষাঁড়, 'বেয়ার' বা ভল্লুক। এরা হচ্ছে যথাক্রমে 'তেজীওয়ালা' ও 'মন্দীওয়ালা'। একই ঘটনা বা সংবাদকে অবলম্বন করে, কেউ 'তেজী' ধ্যান করে, আবার কেউ 'মন্দী' ধ্যান করে। এরই ফলে হয় তেজী-মন্দীর লড়াই। তেজীওয়ালাদের সঙ্গে মন্দীওয়ালাদের লড়াই অনেক সময় সত্যিকারের ষাঁড়ের লড়াইকেও ম্লান করে দেয়। কলকাতার শেয়ার বাজারে সবচেয়ে বড় তেজী-মন্দীর লড়াই ঘটেছিল। আজ থেকে ৭০ বছর আগে—দুই ভাইয়ের মধ্যে। এঁরা হচ্ছেন কলকাতার মারবাড়ী সমাজের বিখ্যাত 'নাথানী' পরিবারের বলদেওদাস ও রামেশ্বরলাল। সেদিন বাজারে দাঁড়িয়ে এক ভাই ক্রমাগত হাওড়া জুট মিলের শেয়ার বেচে গেলেন, আর আরেক ভাই তা কিনে গেলেন। দিনের শেষে দেখা গেল এক ভাইয়ের কাছে অপর ভাইয়ের লোকসান দাঁড়িয়েছে ৯৪ লক্ষ টাকা। এক ভাই যখন অপর ভাইকে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের ওপর ৯৪ লক্ষ টাকার চেক দিল, তখন ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের তো চক্ষু ছানাবড়া। তিনি টেলিফোন করে জেনে নিলেন চেকখানা ঠিক কিনা।

নাথানীরা 'দুধওয়ালা' নামে পরিচিত। এঁরা শেয়ার বাজার থেকে অনেক পয়সা কামিয়েছিলেন। টাকার সদ্ব্যয়ও করে গেছেন। ভারতের নানা স্থানে যে সব 'দুধওয়ালার ধরমশালা' আছে, সেগুলো তাঁদেরই অবদান। কিন্তু উত্তরকালে লক্ষ্মী তাঁদের চঞ্চলা হলেন। ধনাঢ্যতা তাঁদের ম্লান হয়ে গেল।

শেয়ার বাজারের এককালের অনেক আমীরই, পরবর্তীকালে ফকির হয়েছেন। এ রকম একজন দালাল, আমার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। নাম ভাদরমল ঝুনঝুনওয়ালা। ভাদরমলের পিতামহ ছিলেন সিউদতরায়, আর পিতা প্রেমসুক। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে কলকাতার মারবাড়ী সমাজে এঁদের স্থান ছিল সবার শীর্ষে।

এঁদের প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধি একটা ঘটনা থেকে বোঝা যাবে। ১৯০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর বেলা তিনটের সময় ভাদরমলের বাবা ঘোড়ার গাড়ি (তখনও কলকাতায় মোটর গাড়ির চলন হয়নি) করে নিজ আপিস থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। মাত্র দু-একদিন হল হ্যারিসন রোডে ট্রামের প্রবর্তন হয়েছে। প্রেমসুকবাবুর গাড়ি ক্লাইভ স্ট্রীট অতিক্রম করে, যেমন হ্যারিসন রোডে এসে পড়েছে, হঠাৎ ট্রামের টম্ টম্ শব্দ শুনে ঘোড়াটা গেল

বিগড়ে। ট্রামের সঙ্গে লাগল সংঘর্ষ। ঘোড়া জোতবার ব্যোমটা গাড়ির দরজার ভিতরে গিয়ে আঘাত হানল প্রেমসুকবাবুর বুকে। সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমসুকবাবুর মৃত্যু হল। কলকাতার মারবাড়ী সমাজ শোকবিক্ষুব্ধ চিত্তে ছুটে এল ঘটনাস্থলে। নিষ্ঠাবান মারবাড়ী প্রধানরা বিধান দিলেন, প্রেমসুকবাবুর ময়না-তদন্ত হতে পারে না, বা মড়া বাসিও থাকতে পারে না। অবিলম্বেই সৎকার করা দরকার। সেদিন ঘোড়দৌড়ের মাঠে 'ভাইসরয় কাপ' বাজী খেলার দিন। বড়লাট লর্ড কার্জন স্বয়ং ঘোড়দৌড়ের মাঠে। সকলে ছুটল ঘোড়দৌড়ের মাঠের দিকে, সরাসরি লর্ড কার্জনের কাছে দরবার করবার জন্য! লর্ড কার্জন আদেশ দিন, 'অবিলম্বে নিমতলার ঘাটে করোনারস্ কোর্ট বসুক ও প্রেমসুকের লাশ খালাস করে দিক।' নিমতলার ঘাটে 'করোনারস্ কোর্ট বসা, কলকাতার ইতিহাসে সেই প্রথম ও শেষ। এ থেকেই ভাদরমলদের প্রতিপত্তির আভাস পাওয়া যাবে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যখন শেয়ার বাজারে মহাধুম পড়ে গিয়েছিল, তখন শেয়ার বাজার থেকে অনেকেই মোটা টাকা কামিয়েছিলেন। আজ সেনট্রাল অ্যাভেনিউর ধু'ধারে যে সব প্রাসাদোপম সৌধ শহরের শোভাবর্ধন করছে, তার প্রায় সবই প্রথম মহাযুদ্ধের সময় শেয়ার-বাজার থেকে অর্জিত অর্থে তৈরি।

সে সময় ভাদরমলও অনেক পয়সা কামিয়েছিলেন। কিন্তু ভাদরমলের ঘাড়ে চেপেছিল কতকগুলি বদ নেশা। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া কেনা। এক সময় ঘোড়দৌড়ের মাঠে ভাদরমলের সতেরোটা ঘোড়া দৌড়াত। মেয়েছেলের শখও তাঁর বিলক্ষণ ছিল। দেশীয় রাজপরিবারের এক রাজকুমারীকে ভাদরমল রক্ষিতা হিসাবে রেখেছিলেন বলে শুনেছি। এ সব বৈভব শেয়ার বাজার থেকে অর্জিত অর্থের ওপ্নর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সামনে বিশ-পনেরো বছরের মধ্যে ভাদরমল একেবারে কাহিল হয়ে গেল। বাজারে যা কিছু কেনা-বেচা করে, সবেতেই তার লোকসান। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চোট আর ভাদরমল সামলাতে পারল না। একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেল। এককালের বাদশাহ্ ভাদরমল আশ্রয় নিল দর্মাহাটা স্ট্রীটে প্রকাশ্য রাজপথের সামনে এক বাড়ির রোয়াকে। ওই রোয়াকের ওপরেই ভাদরমল একদিন তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

সমসাময়িককালে ভাদরমলের ঠিক বিপরীতটা ঘটেছে বাংগুর পরিবারের। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এক সুদর্শন তরুণ রিক্তহস্তে পাড়ি মেরেছিল সুদূর রাজস্থান থেকে কলকাতা শহরে—ভাগ্যান্বেষণে। সঙ্গে ছিল একটা লোটা ও একখানা কম্বল। আর ছিল তার অসাধারণ আত্মবিশ্বাস ও বৃহস্পতির আশীর্বাদ। কোথাও আশ্রয় না পেয়ে নিমতলা ঘাটের সিঁড়ির ওপরই দু'তিন রাত কাটাল। নিমতলা ঘাটে তখন প্রত্যহ সকালে স্নান করতে আসতেন, তখনকার দিনের কলকাতার শেয়ার বাজারের বড় দালাল নারায়ণ সোনী। ছেলেটি তাঁর নজরে পড়ল। জিজ্ঞাসাবাদে জানলেন, ছেলেটি তাঁদেরই মহেশ্বরী সম্প্রদায়ভুক্ত। ছেলেটিকে বাড়ি নিয়ে গেলেন এবং নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। যৌতুকরূপে দিলেন বেঙ্গল কোল কোম্পানির ৫০০ শেয়ার। ওই ৫০০ শেয়ারই ছেলেটির অদৃষ্ট ফিরিয়ে দিল। ওই শেয়ারগুলোর সঙ্গে বাঁধা ছিল লক্ষ্মীর অঞ্চল। ধুলোমুঠি ধরে, তো কড়িমাঠিতে পরিণত হয়। মাগনীরাম, রামকুমার, গোবিন্দলাল, নরসিংদাস এঁরা পরবর্তীকালে বাজারের প্রথম পর্যায়ের দালালের স্থান অধিকার করলেন।

শেয়ার বাজারে তাঁদের দালালী ব্যবসা এখনও আছে। কিন্তু নরসিংদাসের আমলে বাংগুররা হয়েছেন ভারতের শিল্পসাম্রাজ্যের অন্যতম অধিপতি।

শেয়ার বাজার থেকে যে শুধু মারবাড়ীরাই পয়সা করেছেন, তা নয়। অতীতকালে অনেক বাঙালীও পয়সা করেছেন। তাঁদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে প্রসাদদাস বড়াল, তুলসীদাস রায়, শ্যামলাল লাহা, নন্দলাল রায়, গিরীন্দ্রমোহন পাইন, নবকৃষ্ণ দে, সুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

দীর্ঘ ৩৪ বছর (১৯৩৬-১৯৬৯) শেয়ার বাজারে কাটিয়েছি। কিন্তু বুঝতে পারিনি কিসের জোরে, লোক সেখানে পয়সা উপার্জন করে—ঝুঁকি নেবার ক্ষমতা, না মনের বল, না অদৃষ্টের সুপ্রসন্নতা? অনেক সময় টাকা হাতের মধ্যে এসেও পালিয়ে যায়। আমার নিজের অভিজ্ঞতা তাই বলে। ১৯৪৫ সাল। একদিন বার্ড-হিলজারস কোম্পানীর চীফ অ্যাকাউনটেন্ট আমার ঘরে এসেছেন। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলেন, 'সুর, এতদিন শেয়ার বাজারে রয়েছ, কিছু পয়সা কি কামিয়েছ?' বললাম, 'না, আমি কখনও শেয়ারের কেনাবেচা করি না।' সাহেব বললেন, 'রাতারাতি বড়লোক হতে চাও তো কিছু সাউথ করনপুরা কোল কোম্পানির শেয়ার কিনে ফেল। দাম শেয়ার প্রতি কমসে কম বিশ টাকা বাড়বে। যদি ৫০০০ শেয়ার কেন, তাহলে লাখ টাকা কামাতে পারবে।' তখনকার দিনের লাখ টাকা আজকের দিনের কোটি টাকারও বেশি। লোভ সামলাতে পারলুম না। তার পরের দিনই ৩০ টাকা দরে ৫,০০০ সাউথ করনপুরা শেয়ার কিনে ফেললুম। কিন্তু আমি কেনবার পরই দাম পড়তে শুরু করল। ২৬ টাকায় এসে ঠেকল। তার মানে ৫,০০০ শেয়ারে ২০,০০০ টাকা লোকসান। এর বেশি টাকা আমার ব্যাঙ্কে ছিল না। সুতরাং ২৬ টাকাতেই শেয়ারগুলো বেচে দিলাম। কিন্তু আমি বেচবার পরের দিন থেকেই সাউথ করনপুরার দাম উঠতে লাগল। কয়েক দিনের মধ্যে দাম গিয়ে পৌঁছাল ৫৬ টাকায়। মনে মনে আক্ষেপ করতে লাগলাম, 'আহা শেয়ারগুলো যদি একদিন আগে না বেচতাম, তাহলে আজ আমি লাখ টাকার মালিক হতাম।' আজ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি, এ বিপর্যয় কেন ঘটেছিল—আমার মনের দুর্বলতা? না সঙ্গতির সংকীর্ণতা? না অদৃষ্টের অপ্রসন্নতা?

এবার শেয়ার বাজারের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু বলে এই নিবন্ধ শেষ করব। কলকাতায় শেয়ারের কেনাবেচার সূচনা হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে। পুরো একশ বছরের ওপর দালালরা কেনাবেচা করতেন একটা খোলা মাঠের ওপর এক নিমগাছের তলায়। ১৯০৪ সালে ওখানে যখন বাড়ি তৈরি হয়, তখন দালালরা আশ্রয় নিলেন প্রকাশ্য রাজপথে। দালালদের কোন সংগঠনও ছিল না, নিয়মকানুনও ছিল না। ফলে সওদার নিষ্পত্তি নিয়ে প্রায়ই তাঁদের মধ্যে বচসা হত। এরূপ বচসা একদিন এক বিরাট দাঙ্গায় পরিণত হল, মারবাড়ী ও চোবেদের মধ্যে। এই ঘটনার পরেই সাহেব দালালরা সংগঠন তৈরি করে নিয়মকানুন প্রণয়ন করতে চাইলেন। ফলে, ১৯০৮ সালে বর্তমান 'ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপিত হল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় অ্যাসোসিয়েশনের সমৃদ্ধি বাড়ল। তখন ষ্টক এক্সচেঞ্জের আস্তানা ছিল ২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেসে। ১৯২৭ সালে স্টক এক্সচেঞ্জ নিজের বাড়ি তৈরি করবার জন্য ৭ নং

লায়নস রেঞ্জের জমিটা কিনল। জমিটা ছিল বিডন ষ্ট্রীটের সাতুবাবু-লাটুবাবুদের। চারজন শরিক ছিলেন, তাঁদের অন্যতমা ছিলেন মতী চন্দ্রপ্রভা দেবী। শীঘ্রই সেই জমিতে বর্তমান পাঁচ-তলা বাড়ি তৈরি করা হয়। বাঙলার তদানীন্তন শাসনকর্তা স্যার স্টানলি জ্যাকসন ১৯২৮ সালের ২ জুলাই তারিখে নূতন ভবনের দ্বার উদঘাটন করেন। স্টক এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং-এর মত এত মজবুত বাড়ী ব্যবসা-পাড়ায় খুব কমই আছে। এর দোতলার দেওয়ালই হচ্ছে চওড়ায় পাঁচ ফুট। এর উপরতলায় হচ্ছে দালালদের আপিস ও নীচের তলায় হচ্ছে বাজারের কেনাবেচার স্থান ও ষ্টক এক্সচেঞ্জের নিজ আপিস। সমস্ত বাড়িটা লণ্ডন ষ্টক এক্সচেঞ্জের অনুকরণে তৈরি।

আগে শেয়ার বাজার স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু ১৯৫৭ সালের ১০ অক্টোবর তারিখের পর থেকে, শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রণীত 'সিকিউরিটিজ কনট্রাকটর রেগুলেশন অ্যাক্ট' অনুযায়ী। এছাড়া আরও এক পরিবর্তন স্টক এক্সচেঞ্জের ইতিহাসে ঘটেছে। আমি যখন স্টক এক্সচেঞ্জে চাকরি নিয়েছিলাম, তখন বেশির ভাগ দালালই ইংরেজ ও বাঙালী। আজ তাঁদের স্থান অধিকার করেছে মারবাড়ী, গুজরাটী ও উত্তরপ্রদেশের লোকেরা।

## ৩৩০ নিউ মার্কেটের ইতিহাস

ইংরেজরা যখন প্রথম কলকাতায় আসে তখন তারা বাস করত বর্তমান বি-বা-দী বাগ অঞ্চলে। সেজন্য তারা তরিতরকারি ও মাছ-মাংস কিনতো লালবাজারে কিংবা টেরেটি বাজারে, আর পোশাক-আশাক ও অন্যান্য বিলাসদ্রব্য চীনা বাজারে। তখনকার দিনে চীনা বাজারে সব দোকানদারই ছিল বাঙালি আর খরিদ্দার ছিল সাহেব-মেম। চীনা বাজারের বাঙালি দোকানদারদের একটা অপবাদ ছিল; তারা নাকি সাহেব-মেমেদের ঠকাতো। অন্তত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের কলকাতার অধিবাসী সুপ্রিম কোর্টের অ্যাটর্নি উইলিয়াম হিকি, সেই কথাই তাঁর স্মৃতিচারণে বলে গেছেন। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখনীয় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর ডিরোজিওর 'ইয়ং বেঙ্গল' ছাত্রমণ্ডলীর অন্যতম ও বিখ্যাত বাগ্মী রামগোপাল ঘোষের পিতারও চীনাবাজারে একটা বইয়ের দোকান ছিল।

তারপর সাহেবরা যখন কসাইটোলা, ধর্মতলা ও চৌরঙ্গী অঞ্চলে বসবাস শুরু করল, তখন তারা তিনটে বাজার স্থাপন করল, শেরবরণের বাজার, চৌরঙ্গীর বাজার ও চাঁদনী চক। শেরবরণের বাজারটা ছিল, আজ যেখানে 'স্টেটসম্যান' অফিস অবস্থিত সেখানে। আর চৌরঙ্গীর বাজার ছিল, চৌরঙ্গী ধর্মতলা ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে। চৌরঙ্গী বাজারটা ছিল সবচেয়ে বড় বাজার। এই বাজারটা নীলামে হস্তান্তরের পর, এটার নূতন নামকরণ করা হয় 'ধর্মতলা বাজার'। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ এপ্রিল তারিখে নীলামদার টুলো অ্যাণ্ড কোম্পানি, বাজারটা নীলামের জন্য যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, তা থেকে আমরা জানতে পারি যে, যে জমির ওপর বাজারটা অবস্থিত ছিল তার আয়তন ছিল নয় বিঘা। ওই বাজারে ২০৭টা পাকা দোকান ঘর, ১৪৩টা খিলানযুক্ত দোকান ঘর ও ৩৬টা খুব বড় কাঁচা গুদাম ঘর ছিল। বাজারের চৌহদ্দী সম্বন্ধে ওই বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল যে এটি

"bounded by General Shibbert's house on the east, by the Dhurrumtolah Road to the north, by the Chowringhee Road to the West, and by the Jaun Bazar Road to the south."

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পাথুরিয়াঘাটার যদুলাল মল্লিক এই বাজারটা কিনে নেন!

শেরবরণ বাজার ও ধর্মতলা বাজার উঠে গেছে। কিন্তু চাঁদনী চক এখনও জীবিত। সারা ভারতের রাজধানী হিসাবে কলকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলে সাহেবরা যখন জেঁকে বসে, তখন তারা জিনিসপত্তর হয় ধর্মতলার বাজার, আর তা নয়তো চাঁদনী চক্ থেকে কিনত। কিন্তু অভিজাত সম্প্রদায়ের সাহেব-মেমরা কলকাতার বিশিষ্ট দোকান থেকেই তাদের জিনিসপত্তর কিনত। এসব দোকানে হয় পোশাক-আশাক-জুতা, আর তা নয়তো স্টেশনারি জিনিস, বিলাসদ্রব্য ও বই বিক্রি হত। র‍্যানকিন অ্যাণ্ড কোম্পানি পোশাক তৈরি করত, কাথবার্টসন অ্যাণ্ড হারপার জুতো তৈরি করত, ট্রেইল অ্যাণ্ড কোম্পানি স্টেশনারি জিনিস বেচত, আর ডবলিউ নিউম্যান ও থ্যাকার স্পিনকের দোকানে স্টেশনারি জিনিস ও বইপত্তর পাওয়া যেত। এ ছাড়া, বাজারের সমতুল কলকাতায় দু-তিনখানা বিভাগীয় দোকান ছিল। সবচেয়ে বড় বিভাগীয় দোকান ছিল হোয়াইটওয়ে লেডল-এর দোকান। আয়তনে দোকানটা যেমন ছিল বড়, ওর পণ্যসম্ভারও তেমনি ছিল বিচিত্র। এখানে যে কোনও জিনিস কিনতে পাওয়া যেত। হোয়াইটওয়ে লেডল ছাড়া, আরও তিনটে বিভাগীয় দোকান ছিল। সেগুলো হচ্ছে হল অ্যাণ্ড অ্যাণ্ডারসন, আর্মি অ্যাণ্ড নেভি স্টোরস ও ফ্রানসিস হ্যারিসন অ্যাণ্ড হ্যাদাওয়েয়ের দোকান।

দেশী লোকদের সঙ্গে সাহেব-মেমরা ধর্মতলার বাজার ও চাঁদনী চক্ থেকে জিনিস কেনা অসুবিধা বোধ করল। দোকানদাররা শুধু যে ওজনে মারত তা নয়, দামেও ঠকাতো। সেজন্য ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সিভিলিয়ান সাহেবরা কলকাতা করপোরেশনের কাছে, এক বাজার প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন করে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে এই আবেদন অনুক্রমে এক স্পেশাল কমিটি বসানো হয়। কমিটি সঙ্গে সঙ্গেই সাহেব-মেমেদের জন্য এক বাজার স্থাপনের সুপারিশ করে। কলকাতার অভিজাত পল্লী চৌরঙ্গীর লিণ্ডসে স্ট্রীট ও বারটরাম স্ট্রীটের সংযোগস্থলে দুই লক্ষ আঠারো হাজার টাকায় ২৫ বিঘা জমি কেনা হয়। সঙ্গে সঙ্গেই বাজার নির্মাণের কাজ আরম্ভ করে দেয় ঠিকাদার বার্ন অ্যাণ্ড কোম্পানি। ছয় লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার ন'শ পঞ্চাশ টাকা ব্যয়ে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই বাজারের নির্মাণ কার্য সমাধা হয়ে যায়। আনুষ্ঠানিকভাবে বাজারটা খোলা হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারি তারিখে। কোন কোন কাগজে লেখা হয়েছে বাজারটা সেপ্টেম্বর মাসে খোলা হয়েছিল, সেটা একেবারেই ভুল। আরও ভুল লেখা হয়েছে যে বাজারটার নাম প্রথমে হগ্ মার্কেট ছিল, পরে স্বাধীনোত্তরযুগে ওর নাম হয়েছে 'নিউ মার্কেট'। এটা নতুন বাজার বলে গোড়া থেকেই এটার নাম ছিল 'নিউ মার্কেট'। এ নামটার সঙ্গেই সেকালের ও একালের লোক বেশি পরিচিত। মাত্র ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ২ ডিসেম্বর তারিখ থেকেই এর নামকরণ করা হয় 'স্যার স্টুয়ার্ট হগ্ মার্কেট' সংক্ষেপে হগ্ মার্কেট। স্যার স্টুয়ার্ট হগ্ ছিলেন কলকাতা করপোরেশনের চেয়ারম্যান, ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ নভেম্বর পর্যন্ত। তাঁর

আমলে এবং তাঁর চেষ্টাতেই বাজারটা নির্মিত হয়েছিল বলে, তাঁর অবসর গ্রহণের পর তাঁর সম্মানার্থে বাজারটার নামকরণ করা হয় 'স্যার স্টুয়ার্ট হগ মার্কেট'। কলকাতা করপোরেশনের 'প্রোট্রেট গ্যালারি'তে স্যার স্টুয়ার্ট হগের একখানা ব্রোমাইড ছবি টাঙানো আছে।.

নিউ মার্কেটই কলকাতার সর্বপ্রথম মিউনিসিপ্যাল মার্কেট। তারপর অবশ্য কলকাতা করপোরেশন আরও কতকগুলি বাজার স্থাপন করেছে। যথা ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে স্যার চার্লস অ্যালেন মার্কেট, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে লেক রোড মার্কেট, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে গড়িয়াহাট রোড মার্কেট, ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে পার্ক সার্কাস মার্কেট, ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে নিউ আলিপুর মার্কেট ও ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে মানিকতলা মার্কেট। কিন্তু এতগুলো করপোরেশন মার্কেট স্থাপিত হলে কি হবে? এদের কোনটাই নিউ মার্কেটের সম্মান, মর্যাদা ও গৌরব অর্জন করতে পারেনি। উল্লেখনীয় যে ১৯৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এসব বাজারগুলো থেকে করপোরেশনের লাভ হত, কিন্তু তারপর থেকে ক্রমাগতই লোকসান হচ্ছে।

স্থাপত্যে নিউ মার্কেট এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এর নকশা তৈরি করেছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির তৎকালীন আর্কিটেক্ট আর.বায়নে। এর জন্য তিনি পুরস্কার পেয়েছিলেন হাজার টাকার। আর মৌলিক সৌধটা তৈরি করেছিল বার্ন অ্যাণ্ড কোম্পানি। পরে এর অনেক সম্প্রসারণ ঘটেছে। খুব বড় রকমের সম্প্রসারণ ঘটে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে, যখন পাঁচ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯৪৭ টাকা ব্যয়ে পূর্বদিকের ব্লকটা তৈরি করা হয়। উত্তরদিকের সম্প্রসারণ ঘটে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে।

রাজধানীর সাহেব-মেমদের বাজার বলেই, নিউ মার্কেটের ছিল এক বিশেষ মর্যাদা। বাঙালিরা যে নিউ মার্কেটে জিনিসপত্তর কিনতে যেত না, তা নয়। তবে তারা বিলেত-ফেরত ব্যারিষ্টার বা ওই শ্রেণীর বাঙালি। আজ সাহেবরা এদেশ থেকে চলে গিয়েছে বটে কিন্তু নিউ মার্কেট তার প্রাচীন ঐতিহ্য হারায়নি। এখন অনেক বাড়ির গৃহিনীরা নিউ মার্কেট থেকে জামা-কাপড় কিনে এনে, প্রতিবেশীদের কাছে গর্বের সঙ্গে বলেন—'এটা নিউ মার্কেট থেকে কেনা!'

নিউ মার্কেটে পাওয়া যায় না এমন কিছু নেই! একদিকে যেমন পাওয়া যায় তরিতরকারি-সবজি থেকে মাছ-মাংস ইত্যাদি। অপরদিকে তেমনই পাওয়া যায় রুটি, কেক্, ফলমূল, মেওয়া থেকে আরম্ভ করে পোশাক-আশাক, জুতো, বই, খবরের কাগজ, স্টেশনারি জিনিস ও নানারকম বিলাসদ্রব্য থেকে আরম্ভ করে হীরা-জহরত ও মূল্যবান অলঙ্কার পর্যন্ত। শুধু তাই নয়, আপনি যদি নিজের ওজন নিতে চান বা শক্তি পরীক্ষা করতে চান, তারও ব্যবস্থা আছে নিউ মার্কেটে। আগেও বাঙালি মেয়েরা নিউ মার্কেটে যেত, তবে জিনিস খরিদ করবার জন্য নয়। কালীঘাটের ফেরত চিড়িয়াখানা ও যাদুঘর দেখে, নিউ মার্কেটে ঢুকতো বাজারের জাঁকজমক দেখবার জন্য। তার মানে, নিউ মার্কেট কলকাতার একটা দ্রষ্টব্য স্থান ছিল। কিন্তু আজ সেখানে অন্য দৃশ্য। আজ মেয়েরা নিউ মার্কেটে যায় শাড়ি, ব্লাউজ, ছেলে-মেয়েদের জামা-জুতো ও নানারকম বিলাস দ্রব্য কিনতে। যারা কিনতে যায় তারা মনে মনে বেশ আত্মগরিমার সুখ পায়। দুশো টাকায়

নিউ মার্কেট থেকে যে জিনিসটা তারা কিনবে, মার্কেটের বাইরের দোকানে সেটা হয়তো পঞ্চাশ টাকা কমে পাবে, কিন্তু ওই পঞ্চাশ টাকার জন্য তারা আত্মগরিমার সুখটা জলাঞ্জলি দেবে না।

আগেকার দিনে নিউ মার্কেটে দেখেছি সাহেব-মেম, গোরা পল্টন ও গোরা জাহাজের নাবিক গিজগিজ করছে। আজ কিন্তু সে দৃশ্য আর সেখানে নেই।

১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে এক বিধ্বংসী আগুনে নিউ মার্কেটের এক অংশ পুড়ে যায়। কর্তৃপক্ষ, নিউ মার্কেটকে ভেঙে ওখানে একটা চারতলা বাড়ি তৈরি করবার প্রকল্প নিয়েছিল। মনে হয় তাতেই নেপথ্যে অগ্নিদেব অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছিলেন। নিউ মার্কেটের ঐতিহ্য মানুষের হাতে নষ্ট হয়ে যাবে, এটা বোধ হয় তিনি চান না, যে রকমভাবে মানুষ তার কুৎসিত পরিকল্পনায় নষ্ট করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত সেনেট হাউসটাকে। সেজন্যই নিউ মার্কেটের অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পড়ে মনে জেগে উঠেছিল—'অগ্নি স্বাহায় নমঃ'।

## ৩৩ কলকাতার মিষ্টির দোকান

বাঙালীর প্রসিদ্ধি তার রসনার জন্য। সেজন্যই বাঙালী মেয়েরা ৬৪ রকম ব্যঞ্জন হরেক রকম মিষ্টান্ন বানাতে জানত। এ সম্বন্ধে উত্তর ভারত বাঙলার কাছে পরাহত। উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ মিষ্টান্ন ছিল ক্ষীরের তৈরি লাড্ডু। তবে 'দিল্লীকা লাড্ডু' কি পদার্থ, তা আমরা জানি না। লাড্ডু ছাড়া বিহার উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশের মিষ্টান্ন ছিল ক্ষীরের তৈরি পেড়া। উত্তর ভারতে ছানার তৈরি মিষ্টান্নের কোন বালাই ছিল না। ছানার তৈরি মিষ্টান্ন বাঙলারই বৈশিষ্ট্য। ছানা দিয়ে হরেক রকম মিষ্টান্ন তৈরি করত বাঙালী মেয়েরা। এছাড়া তারা মিষ্টান্ন তৈরি করত ক্ষীরের, ময়দার, নারকেলের ও ডালবাটার। ঘরে ঘরে এগুলো তৈরী হত। ময়দার মিষ্টান্নের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল জিভেগজা। ক্ষীরের খাবারের মধ্যে ক্ষীরের পুতুল, আর নারকেলের খাবারের মধ্যে চন্দ্রপুলি ও নারকেল নাড়ু। জিভেগজাটা ছিল খুব একটা প্রিয় খাদ্য। আমাদের ছেলেবেলায় আমরা দোকান থেকে জিভেগজা কিনতাম এক পয়সায় চারখানা, তার সঙ্গে কিছু বোঁদে ফাউ।

ছানার খাবারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মিষ্টান্ন ছিল সন্দেশ। কলকাতায় সন্দেশের দোকানের মধ্যে কোনটা সবচেয়ে প্রাচীন তা বলা কঠিন। আমার ছেলেবেলায় প্রতি পাড়াতেই সন্দেশের দোকান দেখেছি। নতুন বাজারে মাখন ময়রার সন্দেশই ছিল চমৎকার। ওরা কেবল সন্দেশই বানাত। কড়া ও নরম দু'রকম পাকেরই। সেকালের মিষ্টান্ন সম্বন্ধে জীবনতারা হালদার বলেন, 'আমাদের ছেলেবেলায় জোড়াসাঁকো ছিল মিষ্টির জন্য বিখ্যাত। এখনকার মত তখন অলিগলিতে মিষ্টান্নের দোকান ছিল না। জোড়াসাঁকো অঞ্চলে দোকান ছিল দশ বারোটা। সে সময় ময়দার মিষ্টিরই বেশি চল ছিল। ময়দার মিষ্টির মধ্যে আবার বেশি চলত গজা ও মতিচুর। সাতুবাবুর বাজারে ছিল সবথেকে বড় ছানাপট্টি। দরমাহাটা স্ট্রীটেও ময়রাপট্টি ছিল। সেখানে বিখ্যাত ছিল নাথ ময়রার কাঁচাগোল্লা। বউবাজারে নবকৃষ্ণ গুঁই-এর ছানার পোলাউ, পান্তুয়া, দরবেশ ও বোঁদের স্বাদ ছিল সুন্দর। পান্তুয়া পরে রূপান্তরিত হয় লেডিকেনিতে। লর্ড ক্যানিং একবার মুর্শিদাবাদ পরিদর্শনে যান। মুর্শিদাবাদের সেরা ময়রা তাঁর জন্য দশসেরি পান্তুয়া বানালেন। উপহার দিলেন লেডি ক্যানিং-এর হাতে। সে থেকে লোকেরা মিষ্টিটার নাম দিল লেডিকেনি। তারপর কলকাতাতেও লেডিকেনি তৈরি হতে লাগল।

কিন্তু পরে কলকাতা প্রসিদ্ধ হয়ে গেল তার রসগোল্লার জন্য। এর আবিষ্কারক ছিলেন নবীন চন্দ্র দাস। আবিষ্কারের ইতিহাসটা আমি অন্যত্র দিয়েছি। ('বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী শতবার্ষিকী স্মরণিকা'য়)। নবীন প্রথম দোকান করেছিল মাথাঘষা গলিতে। দোকান না চলায়, পরে দোকান করলেন বাগবাজারে আপার চিৎপুর রোডের ওপর শক স্ট্রীটের ঘোড়ার ট্রাম ডিপোর সন্নিকটে। এখানেই নবীন রসগোল্লা সৃষ্টি করেছিল। যেহেতু কলকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানি ওখানে ট্রাম চালাবার জন্য কলকাতা করপোরেশনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২ অক্টোবর তারিখে, তা থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে নবীন রসগোল্লা আবিষ্কার করেছিল ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পর। ১১ এপ্রিল ১৯৮৮

তারিখের 'বর্তমান' পত্রিকায় গৌতম হোড় লিখেছেন—'নবীন চন্দ্র দাস রসগোল্লা সৃষ্টি করেছিলেন ১৮৬৮-তে।' মনে হয় ওই তারিখটা ভুল। রসগোল্লা জনপ্রিয় হবার পর ওর বাচ্ছা সংস্করণ রসমুণ্ডী বেরোয়। রসগোল্লার দাম ছিল, দু'পয়সা। আর রসমুণ্ডী এক পয়সাতে চারটে পাওয়া যেত। ফাউ চাইলে দোকানী একটা ফাউও দিত। গৌতম হোড় আরও লিখেছেন, 'সিমলার নকুড় নন্দীর দোকানও ১৪৪ বছরের পুরনো।' এটাও সন্দেহজনক উক্তি। কেননা কেউই জানে না কলকাতার মিষ্টির দোকান কত প্রাচীন। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে নকুড় নন্দীর শ্বশুরমশাই হচ্ছেন গিরীশচন্দ্র দে। কড়া পাক সন্দেশের জন্য গিরীশের অসাধারণ প্রসিদ্ধি ছিল।

কলকাতায় শোনপাপড়ি চালু করেন নেপাল চন্দ্র হালুইকর। তাঁর আদি দোকান ছিল আরমেনিয়ান স্ট্রীটে। শোনপাপড়ি অবশ্য নেপাল হালুইকরের সৃষ্ট জিনিষ নয়। আগে থাকতেই এর প্রচলন ছিল বিহার ও উত্তরপ্রদেশে। স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ মহেন্দ্রনাথ দত্ত মশাই বলেছেন যে উত্তরভারতের মিষ্টান্ন যথা অমৃতি, জিলাপি, বালুসাই, রাবড়ি ইত্যাদি তাঁর সময়েই (ঊনিশ শতকের শেষপাদে) কলকাতায় আমদানী হয়। এটাই ঠিক কথা বলে মনে হয়, কেননা কলকাতায় উত্তরভারতের মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারকদের আগমন ঘটে ১৮৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার সঙ্গে উত্তরভারতের রেলপথে যোগাযোগ স্থাপনের পর।

আমার ছেলেবেলায় (তার মানে বিংশ শতাব্দীর মুখপাতে) শ্যামবাজারের পাঁচমাথায় প্রসিদ্ধ সন্দেশ-দইয়ের দোকান ছিল হরিদাস মোদকের। হরিদাস মোদকের দোকান ছিল শ্যামবাজার বাজারের পূর্বদিকে একখানা চালা ঘরের মধ্যে শ্যামবাজার ব্রিজ রোডের ওপর। ওই রাস্তা বিস্তৃতকরণ করে আর. জি. কর রোড সৃষ্টির সময় হরিদাস মোদকের দোকান উঠে আসে পাঁচমাথার সামনে আপার সারকুলার রোডে। (এখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড)। ও'দের দোকানটা এখনও জীবিত। সন্দেশ, ছানার জিলাপি ও জিভেগজার জন্য দোকানটা এখনও বিখ্যাত। শ্যামবাজারের মস্থুলিয়াটোলায় ছিল দ্বারিকচন্দ্র ঘোষের দোকান। দ্বারিকচন্দ্ররও সুনাম ছিল সন্দেশ ও দইয়ের জন্য। বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশকের শেষে দ্বারিকের একখানা দোকান প্রতিষ্ঠিত হয় শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে। (আগে ওই ঘরে ছিল বিপিন ময়রার দোকান)। পরে কলকাতার নানা জায়গায় দ্বারিকের দোকানের শাখা খোলা হয়। কলকাতার বাইরে দেওঘরেও একখানা দোকান খোলা হয়। কিন্তু পরে গৃহবিবাদে দ্বারিকের দোকানগুলির হয় বিলুপ্তি, আর তা নয় তো অবনতি ঘটে। এখন শ্যামবাজারের শ্রেষ্ঠ মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক ফড়িয়াপুকুর স্ট্রীটের 'সেন মহাশয়-এর দোকান। 'কেশব ভোগ' ও 'মালাই চপ' এঁদের বিখ্যাত।

বহুবাজার অঞ্চলে নবকৃষ্ণ গুঁইয়ের দোকানের এখন বৃদ্ধি ঘটেছে। ওঁদের তৈরি ছানার মুড়কি তুলনাহীন ও অদ্বিতীয়। পাশে ভীম নাগের দোকানের আয়তন ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। অথচ একসময় ভীম নাগই ছিল কলকাতার শ্রেষ্ঠ মিষ্টান্ন বিক্রেতা। আমরা দেখেছি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিকালে কলেজ স্ট্রীট ও বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীটের মোড়ে পুরানো অ্যালবার্ট বিলডিং-এর তলায় অবস্থিত আর ক্যামব্রের বইয়ের দোকানে গল্পগুজব করে, বাড়ি ফেরবার পথে তাঁর গাড়ি দাঁড় করাতেন ভীম নাগের দোকানের

সামনে, এবং ওরা ওঁর হাতে তুলে দিত আধসের সন্দেশ, যা ওঁর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাত না, গাড়িতেই মিষ্টান্নবিলাসী আশুতোষ ওটা শেষ করতেন। তবে ভীম নাগের দোকান সাইজে ছোট হয়ে গেলেও ওঁদের তৈরি সন্দেশ গুণ ও স্বাদের দিক দিয়ে পুরানো ঐতিহ্যই বহন করে।

এখন কলকাতার অলিতে গলিতে মিষ্টান্নের দোকান। তবে যে সব দোকান প্রসিদ্ধ এবং কোন্ জিনিসের জন্য বিখ্যাত তার উল্লেখ করছি। শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ের কাছে যোগমায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ভাপা সন্দেশ, শৈল সুইটস্-এর ল্যাংচা, ফড়িয়াপুকুরের মোড়ে 'অমৃত'-এর দই, 'জলযোগ'-এর দই ও বড়দিনের সময় নানারকম কেক ইত্যাদি, রাধা সিনেমার নীচে কে. সি. ঘোষের রসমালাই ও মালাই চপ, গোপাল মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের নোনতা, ঢাকাই পরটা, ঢাকাই শোনপাপড়ি, কড়াপাকের অমৃতি ও ক্রিম রোল, রঙমহল থিয়েটারের পাশে নদীয়া সুইটস্-এর পানতুয়া ও সরপুরিয়া-সরভাজা, গরাণহাটার মোড়ে সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সকালবেলা জিলিপি ও বিকেলবেলা মালপো, সুকিয়া স্ট্রীটের নন্দলাল ঘোষের দোকানের রাবড়ি, জোড়াসাঁকোয় নেপাল হালুইকরের গাজরের হালুয়া, বিবেকানন্দ রোড ও সেনট্রাল অ্যাভেন্যুর মোড়ে শর্মার দোকানের কালাকাঁধ ও কাজু বরফি, কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে কলেজ রো-এর ভিতরে সন্তোষ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ছানার পায়েস, শিয়ালদহের কাছে নাটোর সুইটস্-এর রসকদম্ব, 'মধুরিমা'র রসকদম্ব, সত্যনারায়ণ গুপ্তের সন্দেশ, কমলা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের কমলাভোগ, নাগের ঘিয়েভাজা গজা, হ্যারিসন রোড ও চিৎপুর রোডের মোড়ে ইন্দ্রের দোকানের 'বেদনা' বোঁদে, ধর্মতলায় শর্মা কিংবা কল্পতরুর নানারকম মিষ্টান্ন (কম দামী পেঁড়া সমেত), জানবাজারে সরস্বতী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের দই ও বেলের মোরব্বা, তালতলায় যশোদা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের যশোধি, মল্লিকবাজারের ল ী সুইটস্-এর সন্দেশ (বিশেষ করে কাঁচাগোল্লা), বেকবাগানে 'মেঠাই'-এর কড়াপাক সন্দেশ, তেওয়ারির জিলিপি ও লাড্ডু, ভবানীপুরে সেন মশায়ের রোজক্রীম ও দ্বারিক-এর নিঁখুতি, হরির হরিভোগ বা কেক সন্দেশ ইত্যাদি।

তবে আমাদের ছেলেবেলার অনেক মিষ্টান্ন এখন প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যেমন তিলকুটো, জিভেগজা, চিত্রকুট, ক্ষীরের বরফি, বেলের মোরব্বা, ছানার গজা ইত্যাদি। ওগুলো প্রতি মিষ্টান্নের দোকানেই পাওয়া যেত। কোনো কোনোটা এখন মাত্র বিশেষ দোকানেই পাওয়া যায়।

## ৩৩০ কলকাতার গঙ্গার ঘাট

অষ্টাদশ শতাব্দীর কলকাতায় একদিকে যেমন শহর গড়ে উঠেছিল ও পথ রাস্তা তৈরি হচ্ছিল, অপর দিকে তেমনই ভাগীরথীর তীরে ঘাটসমূহ নির্মিত হচ্ছিল। এসকল ঘাট হয় সরকারী ব্যয়ে আর তা নয় তো বড়লোকদের পয়সায় তৈরি হচ্ছিল। সরকারী ব্যয়ে বোধ হয় মাত্র দুটো ঘাটই তৈরি হয়েছিল। একটা হচ্ছে পুরানো কেল্লারঘাট (যা থেকে কয়লাঘাট স্ট্রীট নামের উৎপত্তি হয়েছে,) আর অপরটা হচ্ছে বাগবাজারে পুরানো বারুদখানার ঘাট। উচ্চ ও নিম্ন, এই উভয় কোটির লোকই এই সকল ঘাটে প্রাতঃস্নান করত। আমরা পড়ি যে মহারাজ নবকৃষ্ণদেব প্রত্যহ প্রাতে তাঁর শোভাবাজার রাজবাটি থেকে নগ্নপদে বেরিয়ে বাগবাজারে আসতেন গঙ্গাস্নান করতে। সঙ্গে থাকত একজন বর্ণাঢ্য পোষাকপরা ছত্রধারী। স্নান সেরে ফেরবার পথে তিনি একবার করে বনমালী সরকারের বাড়িতে ঢু করতেন বনমালীর ছেলে রাধানাথের সঙ্গে গল্পগুজব করবার জন্য।

মেয়েরা সেযুগে ছিল কট্টর অসূর্যম্পশ্যা। সেজন্য সাধারণ ঘরের মেয়েরা ভোর রাতেই গঙ্গাস্নান সেরে সূর্যোদয়ের পূর্বেই বাড়ি ফিরত। আর অভিজাত সম্প্রদায়ের মেয়েরা পালকি করেই গঙ্গাস্নানে আসত। পালকিবাহকরা আরোহিণী সমেত পালকিটাকে গঙ্গার জলে চুবিয়ে দিত। তখন আরোহিণী পালকির ভিতরেই স্নান করতেন ও বস্ত্র পরিবর্তন করতেন।

রাজা নবকৃষ্ণ ঠিক কোন ঘাটে স্নান করতেন তা আমরা জানি না। তবে মনে হয় সেটা বাগবাজারের পুরানো বারুদখানার ঘাট। কেননা, পরবর্তীকালে ওই ঘাটটার যেখানে অবস্থান ছিল, সেখানেই তৈরি হয়েছিল পাশাপাশি দু'টা ঘাট। একটা মহারাজ নবকৃষ্ণের ঘাট ও আর একটা দুর্গাচরণ মুখুজ্যের ঘাট। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে শোভাবাজার রাজবাটিতে যে দুর্গাপূজা হয়, তার প্রতিমা বিসর্জন, বাগবাজারে মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের ঘাটেই হয়।

১৭৮৫ সালে মার্ক উড কলকাতায় যে মানচিত্র (যেটা ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম বেলী প্রকাশ করেছিলেন) তৈরি করেছিলেন, তাতে মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের ঘাটের কোন উল্লেখ নেই। সেজন্য নবকৃষ্ণ দেবের ঘাটটা ওই তারিখের পরেই তৈরি হয়েছিল। বাগবাজারের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ঘাট হচ্ছে অন্নপূর্ণার ঘাট বা রসিক নিয়োগীর ঘাট। রসিক নিয়োগীর ঘাটটাও মার্ক উডের ম্যাপে নেই। বাগবাজারের পুরাতন বারুদখানার ঘাট থেকে শুরু করে দক্ষিণে চাঁদপাল ঘাট পর্যন্ত মাত্র ৩৯টা ঘাট মার্ক উডের ম্যাপে দেখানো আছে। উত্তর থেকে দক্ষিণে যথাক্রমে সে ঘাটগুলো হচ্ছে—ওলড্ পাউডার মিল ঘাট, রঘু মিত্রের ঘাট, কাশীরাম মিত্রের ঘাট, বনমালী সরকারের ঘাট, কেটুয়া ঘাট, রথতলা ঘাট, সুতানটি ঘাট, আহিরীটোলা ঘাট, মানিক বসুর ঘাট, মদন দত্তের ঘাট, টুনুবাবুর ঘাট, নিমতলা ঘাট, জোড়াবাগান ঘাট, গোকুলবাবুর ঘাট, লাটুমার ঘাট, পাথুরিয়া ঘাট, শিবতলা ঘাট, হাটখোলা ঘাট, হরিনাথ দেওয়ানের ঘাট, শোভারাম বসাকের ঘাট, নবারের ঘাট, বৈষ্ণবদাস শেঠের ঘাট, কদমতলা ঘাট, কাশীনাথবাবুর ঘাট, হুজুরীমলের

ঘাট, নয়ন মল্লিকের ঘাট, বলরাম চন্দ্রের ঘাট, বড়বাজার ঘাট, ব্যারোটা সাহেবের ঘাট, জ্যাকসন ঘাট, ফোরম্যানস্ ঘাট, ব্লাইট সাহেবের ঘাট, ওলড ফোর্ট ঘাট, নিউ ওয়ার্ক ঘাট, কাঁচাগুড়ি ঘাট, ও চাঁদপাল ঘাট। মোট ৩৯টা ঘাট। এ সকল ঘাটের মধ্যে অনেকগুলি অবশ্য এখন আর নেই। আবার অনেক নূতন ঘাটও তৈরি হয়েছে।

বলা হয় কলকাতার সবচেয়ে প্রাচীন ঘাট হচ্ছে পুরানো কেল্লার পিছনের ঘাটটা, যেটা মার্ক উড বা উইলিয়াম বেলীর মানচিত্রে 'ওলড ফোর্ট ঘাট' বলে চিহ্নিত হয়েছিল। তবে প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে আর দুটো ঘাটেরও দাবী উপেক্ষনীয় নয়। তার মধ্যে একটা হচ্ছে চাঁদপাল ঘাট, আর অপরটা হচ্ছে সুতানটি ঘাট যেখানে ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জোব চার্নক এসে অবতরণ করেছিলেন। বড়বাজার ঘাটও বেশ প্রাচীন ঘাট, কেননা আমরা ইংরেজদের একেবারে গোড়ার দিকের খাতায় 'গ্রেট বাজার'-এর উল্লেখ পাই। বনমালী সরকারের ঘাটও খুব পুরানো ঘাট, কেননা বনমালী সরকার ছিলেন ইংরেজদের গোড়ার দিকের 'ডেপুটি ট্রেডার'! বনমালীরই সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন কলকাতার 'কালা জমিদার' গোবিন্দরাম মিত্র। বনমালী ও গোবিন্দরাম দু'জনেরই বাড়ি ছিল কুমারটুলিতে। বনমালীর প্রাসাদোপম বাড়ি তৎকালীন কলকাতার এক প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। তবে ভাগীরথীগামী বিদেশী নাবিকদের কাছে গোবিন্দরামের বিরাট নবরত্ন কালী মন্দিরটাই দিকচিহ্ন হিসাবে 'ব্ল্যাক প্যাগোডা' নামে আখ্যাত হত। গোবিন্দরাম নিজে কোন গঙ্গার ঘাট তৈরি করেন নি। তবে গোবিন্দরামের পুত্র রঘুনাথ মিত্র 'রঘু মিত্তিরের ঘাটটা তৈরি করে দিয়েছিলেন।

ধর্মীয় ব্যাপারের দিক দিয়ে কাশীরাম মিত্রের ঘাটটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘাট ছিল। এখানেই শবদাহ করা হত এবং অন্তর্জলীর জন্য মুমূর্ষদের নিয়ে আসা হত। কলকাতার অন্যান্য শ্মশান ঘাট হচ্ছে কাশীপুরের রামকৃষ্ণ মহাশ্মশান, নিমতলার শ্মশান ও সাহানগরের কেওড়াতলার শ্মশান। তবে শবদাহের সংখ্যার দিক দিয়ে কাশীরাম মিত্রের ঘাটটাই একসময় সবচেয়ে কর্মব্যস্ত ঘাট ছিল। সেজন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে একবার প্রস্তাবিত হয়েছিল যে নিমতলা ও কাশীরাম মিত্রের ঘাটের মধ্যে আর একটা শবদাহের ঘাট নির্মাণ করবার, কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত হয়নি। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ইনফ্লুয়েনজা মহামারীর সময় যখন কলকাতা শহরে হাজার হাজার লোক ওই মহামারীর প্রকোপে মারা গিয়েছিল, তখন কাশী মিত্তিরের ঘাটে মড়া পোড়ানোর এক সমস্যা প্রকাশ পেয়েছিল। প্রতিদিন শত শত মড়ার খাট গঙ্গার ধারে লাইন দিয়ে রাখা হয়েছিল এবং ওই লাইন বাগবাজার স্ট্রীট পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল।

মড়া-পোড়ানোর ঘাট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার কথা বলি। এটা ১৯০৪ সালে নিমতলা ঘাটে ঘটেছিল। ওই বছরের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ একদিন বিকালবেলা কলকাতার সবচেয়ে বিত্তবান সম্রান্ত স্বর্ণ ব্যবসায়ী 'প্রেমসুকরায় সিউদত্রমল'-এর মালিক প্রেমসুকরায় ঝুনঝুনওয়ালা নিজ গাড়িতে (কলকাতায় তখন মোটর গাড়ির আবির্ভাব ঘটেনি) করে বাড়ি ফিরছিলেন। কলকাতার হ্যারিসন রোডে তখন সবে ট্রামগাড়ির প্রচলন হয়েছে। প্রেমসুকবাবুর গাড়িটা ক্লাইভ স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলে আসা মাত্রই গাড়ির ঘোড়াটা ট্রাম গাড়ির ঢং ঢং শব্দ

শুনে বিগড়ে গিয়ে পথছুট হয়ে ট্রাম গাড়িতে ধাক্কা মারে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির একটা যোয়াল গাড়ির ভেতরে ঢুকে প্রেমসুকবাবুর বুকে সজোরে আঘাত করে। অকুস্থলেই প্রেমসুকের মৃত্যু ঘটে। সংবাদ পেয়ে সেখানে ছুটে যায় কলকাতার মারবাড়ী সমাজ। দুর্ঘটনায় নিহত প্রেমসুকের শবব্যবচ্ছেদ তার বরদাস্ত করবে না। ছুটে যায় লাটভবনে বড়লাট লর্ড কার্জনের কাছ থেকে বিনা ব্যবচ্ছেদে শব ছেড়ে দেবার জন্য অনুমতি পত্র সংগ্রহের জন্য। লাটভবনে গিয়ে শোনে বড়লাট ঘোড়দৌড়ের মাঠে গেছেন 'ভাইসরয় কাপ' বাজির খেলা দেখবার জন্য। সেখানে গিয়ে তাঁরা অনুমতি-পত্র সংগ্রহ করে যে, নিমতলা ঘাটে করোনারস্ কোর্ট' বসুক এবং বিনা ব্যবচ্ছদেই প্রেমসুকবাবুর লাস ছেড়ে দেওয়া হউক। কলকাতার ইতিহাসে এই প্রথম ও শেষ নিমতলা ঘাটে 'করোনারস্ কোর্ট'-এর অধিবেশন হয়েছিল।

নিমতলা, কেওড়াতলা ও কাশীপুরের শ্মশানঘাট বিখ্যাত হয়ে আছে শহরের বিখ্যাত ব্যক্তিদের শেষ বিশ্রামস্থল হিসাবে। সেজন্য এসব ঘাটে আছে তাঁদের স্মৃতিসৌধ। কাশীপুরে আছে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও শিশিরকুমার ভাদুড়ির, আর কেওড়াতলায় আছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দমোহন সেনগুপ্ত, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বীরেন শাসমল ও যতীন দাসের। কিন্তু নিমতলা সকলকে ছাপিয়ে গিয়েছে, কেননা এখানে আছে রবীন্দ্রনাথের।

বড়বাজার ছোটুলাল দুর্গাপ্রসাদ ঘাটে আছে তিনশত নরনারীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক ফলক। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৬ মে তারিখের ঝড়ে বঙ্গোপসাগরে ডুবে যায় যাত্রীসহ 'স্যার জন লরেনস্' নামে এক জাহাজ। ওই জাহাজে ছিল রথযাত্রা উপলক্ষে পুরীগামী ১১০০ নরনারী। এই দুর্ঘটনায় মর্মাহত হয়ে কলকাতার দয়ার্দ্র ইওরোপীয়ান মেমসাহেবরা ছোটুলাল দুর্গাপ্রসাদের ঘাটে ওই ফলকটা লাগিয়ে দিয়েছিল। আর ওই সলিল সমাধি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'সিন্ধুতরঙ্গ'।

কলকাতার গঙ্গার ঘাটসমূহ যে মাত্র স্নানার্থীদের জন্যই ব্যবহৃত হত তা নয়। রেলপথে উত্তর ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের পূর্বে এগুলি ব্যবহৃত হত যাত্রী ও মাল পরিবহণের জন্য। অবশ্য এখনও হয়।

মালপরিবহণের সম্পর্কে কদমতলা ঘাটে একবার ঘটেছিল এক চকমপ্রদ ঘটনা। বৈষ্ণবচরণ শেঠ ছিলেন সেকালের (অষ্টাদশ শতাব্দীর) এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী। সাহেবদের সঙ্গেই ছিল তাঁর কারবার। একবার বর্ধমানের চিনি ব্যবসায়ী গোবর্ধন রক্ষিত বৈষ্ণবচরণের ফরমাস অনুযায়ী নৌকাযোগে বহু টাকার চিনি পাঠিয়ে দেয়। নৌকাগুলি কদমতলার ঘাটে এসে ভিড়লে, বৈষ্ণব-চরণের কর্মচারীরা দস্তুরী না পাওয়ায় গোবর্ধনের আনীত চিনি নিম্নমানের বলে ঘোষণা করে। গোবর্ধন রুষ্ট হয়ে চিনির বস্তাগুলো নদীতে ফেলে দিতে থাকে। বৈষ্ণবচরণের কানে যখন এই সংবাদ গিয়ে পৌঁছায়, বৈষ্ণবচরণ তখন ছুটে এসে গোবর্ধনের রাগ প্রশমন করে, ও অবশিষ্ট যা চিনি ছিল তাই নিয়েই তাকে আনীত সমস্ত চিনির দাম দিয়ে দেয়। এই ঘটনা সেকালের বাঙালী ব্যবসায়ীদের সততা সম্বন্ধে বিশেষ আলোকপাত করে।

সেকালের গঙ্গার ঘাটগুলো কলকাতা থেকে পালাবারও পথ ছিল। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের

১৯ জুন তারিখে সিরাজউদ্দৌলা যখন কলকাতার দুর্গ অবরোধ করে, তখন দুর্গস্থ নরনারীরা দুর্গের পিছনের ঘাট দিয়ে ফলতায় পালিয়ে গিয়েছিল। আবার ১৮৯৬-৯৭-এর প্লেগ মহামারীর সময় ও ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় জাপানী বোমাবর্ষণের সময় হাজার হাজার নরনারী কলকাতার ঘাটসমূহ থেকেই নৌকাযোগে শহর থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

ভাগীরথীর উভয়তীরস্থ স্থানসমূহের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম রূপে এক সময় হোর মিলার কোম্পানির ফেরী সারভিস কলকাতার আরমেনিয়ান ঘাট থেকে কালনা পর্যন্ত যেত। ধরণী রায়ের সঙ্গে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে 'সারভিস' বন্ধ হয়ে যায়। পরে কলকাতার পোর্ট কমিশনাররা আহিরীটোলা থেকে বেলুড় মঠ পর্যন্ত একটা সারভিস্ অনেকদিন চালু রেখেছিল। কিন্তু সেটাও পরে বন্ধ হয়ে যায়। এখন বাগবাজার থেকে হাওড়া ব্রিজ পর্যন্ত একটা নূতন 'সারভিস' চালু হয়েছে। বর্তমানে মেটিয়াবুরুজ হইতে বরানগর পর্যন্ত সারভিস চালু হয়েছে।

কালের আবর্তনে কলকাতার গঙ্গার ঘাটগুলির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। পুরানো অনেক ঘাট বিলুপ্ত হয়েছে। আবর নতুন ঘাটও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু গঙ্গার মাহাত্ম্য নষ্ট হয়নি। হিন্দুরা এখনও সমবেত হয় ঘাটগুলিতে প্রতিমা বিসর্জনের সময় এবং বিশেষ বিশেষ পর্ব যথা দশহরা, মহালয়া, দুর্গাপূজা, মকরসংক্রান্তি, শিবরাত্রি প্রভৃতি উপলক্ষে স্নান করবার জন্য।

## কলকাতার পতিতাপল্লীর পদাবলী

সাম্প্রতিক কালের ঘটনাবলী দেখে মনে হয় যে শীঘ্রই কলকাতার রূপজীবিকারা মিছিল করে পথে নেমে পড়বে এবং উদাত্তকণ্ঠে চিৎকার করবে 'আমাদের দাবি মানতে হবে'। কেননা, মাত্র কয়েকদিন আগেই সংবাদপত্রে পড়লাম যে প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটের পতিতারা স্থানীয় সমাজবিরোধীদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে কর্তৃপক্ষ মহলে এক স্মারকলিপি দিয়ে এসেছে। আবার জোড়াসাঁকো অঞ্চলের এক খুনের সংবাদে পড়ি যে খুনের মূল কারণ ওই অঞ্চলে এক নূতন পতিতাপল্লীর 'প্রভুত্ব' নিয়ে দুই সমাজবিরোধী দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এসব ঘটনাবলীর সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় যে যুগের হাওয়ার অগ্রগতির সঙ্গে শহরের পতিতারাও সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুতঃ সে যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে যে যুগের মানুষরা পতিতাদের ঘৃণা করত। এমনকি যারা নাট্যশিল্পী ছিল, তাদেরও বিরূপ দৃষ্টিতে দেখত। আমরা ইতিহাসে পড়ি যে রঙ্গালয়ের প্রথম অবস্থায় ভদ্রপরিবারের মেয়েরা থিয়েটার দেখতে যেত না, যেহেতু বারাঙ্গনারা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করত। গিরিশচন্দ্রই ভদ্রপরিবারের মেয়েদের মন থেকে এই সঙ্কোচটা দূর করেন, থিয়েটারের দ্বিতলে চিক-এর আড়ালে মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র আসনের ব্যবস্থা করে। কিন্তু আজকের সমাজপতিদের কাছে পতিতারা ঘৃণিত জীব নয়। সমাজে তারাও মর্যাদাসম্পন্ন এক শ্রেণী। তারাও মায়ের জাত, তবে পদস্খলিতা মাত্র। তারাও তো সমাজের একটা অভাব

পূরণ করে। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যাবে যে এক শ্রেণীর মেয়েরা যদি এই পথে না আসত, তাহলে সমাজে কি বিশৃ  লাই না প্রকাশ পেত, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে যেখানে পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যা অনেক কম। এখানে উল্লেখনীয় যে প্রাচীন ভারতে বারাঙ্গনাদের অন্য দৃষ্টিতে দেখা হত। রাজসভায় ও উৎসব-অনুষ্ঠানে তাদের জন্য মর্যাদামণ্ডিত আসন সংরক্ষিত হত। (আমার 'ভারতের বিবাহের ইতিহাস' বইখানা দেখুন)

কলকাতায় পতিতাদের আগমন ঠিক কবে ঘটেছিল, তা আমরা সঠিকভাবে জানি না। তবে সবচেয়ে প্রাচীন নজির যা আছে, তা হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নের। তখনই শহরে পতিতাপল্লী বেশ জাঁকালো ভাবে গড়ে উঠেছিল। কেননা, ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১ ফেব্রয়ারি তারিখের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 'কনসালটেশনস্' বই থেকে খবর পাওয়া যায় যে কোম্পানি ঈশ্বরী ও ভবী নামে দু'জন বারবনিতার মাল নিলামে বিক্রি করছে। ওই তারিখের আগেই যে শহরে বেশ্যাপল্লী ছিল তার সংবাদ আমরা পাই সিরাজ কর্তৃক কলকাতা আক্রমণের সময় (১৭৫৬) যে সব বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হয়েছিল এবং যার জন্য মীরজাফর ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল, তার নামের তালিকা থেকে। সেই বণ্টন তালিকায় আমরা রতন, ললিতা ও মতিবেওয়া নামে গোবিন্দরাম মিত্রের আশ্রিতা তিনজন গণিকার নাম পাই।

[illegible] সাহেব লিখে গেছেন যে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ইউরোপীয় জাহাজসমূহের নামকরা চিৎপুর অঞ্চলের বেশ্যাপল্লীতে আনাগোনা করত। পরবর্তীকালে চিৎপুর-গরাণহাটার বেশ্যাপল্লীই সোনাগাজী (পরে সোনাগাছিতে রূপান্তরিত হয়েছিল) নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। সোনাগাজীর উল্লেখ আমরা প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'-ও পাই। কিন্তু তার অনেক আগে সাহিত্যেও আমরা কলকাতার বারবনিতাদের উল্লেখ পাই। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত গ্রন্থসমূহে আমরা কলকাতার বারবনিতাদের উল্লেখ পাই। তাদের মধ্যে বেশ্যাপ্রধানা ছিল বকনাপিয়ারী। ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলীর অব্যবহিত পরেই কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রীটে (শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর পেছনে) নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয় হয়েছিল। ওই নাটকে বিদ্যার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল ষোড়শবর্ষীয়া রাধামণি বা মণি, রানী ও মালিনীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিল প্রৌঢ়া জয়দুর্গা ও বিদ্যার সহচরীর ভূমিকায় রাজকুমারী বা রাজু। এদের সকলেকেই বরানগরের পতিতাপল্লী থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছিল। বরানগরের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে একটা কথা মনে পড়ে গেল। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কলকাতায় এসেছিল এক অবৈধ বণিক বা 'ইনটারলোপার', নাম আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন। হ্যামিলটনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকে আমরা জানতে পারি যে তাঁর সময়ে [illegible] প্রশিক্ষণ দেবার জন্য বরানগরে এক বিদ্যায়তন বা 'সেমিনারি' ছিল।

[illegible] শহরের মধ্যে সোনাগাজীই ছিল সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বেশ্যাপল্লী। সোনাগাজী বলতে [illegible] গরাণহাটা, দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট, মসজিদ বাড়ি স্ট্রীট, চিৎপুর রোড ইমামবকস্ [illegible] লেন, ইত্যাদি অঞ্চল বুঝাত। এছাড়া, বেশ্যাপল্লী ছিল রামবাগানে মিনার্ভা [illegible] আশেপাশে। আরও বেশ্যাপল্লী ছিল শোভাবাজারের রাজবাড়ির পিছনে

ফুলবাগানে, শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর সামনে ও কালাচাঁদ সান্যাল লেনে,হরলাল মিত্র স্ট্রীটের শেষপ্রান্তে বাগবাজারের খালের মুখে, উল্টডাঙ্গায়, মেডিকেল কলেজের সামনে হাড়কাটা গলিতে বা প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে, মেডিকেল কলেজের দক্ষিণে ছানাপট্টির পিছনের সরু গলিটার ভিতরে, শ্যামবাজারের কম্-বলিটোলায়, গ্রে স্ট্রীট প্রভৃতি জায়গায়। তবে কলকাতায় এমন একটা বেশ্যাপল্লী ছিল, যেখানে সব প্রদেশেরই, বিশেষ করে ওড়িশার বেশ্যারাই বাস করত। সেটা হচ্ছে ধুকুরিয়া বাগান, জানবাজারের রানী রাসমণির বাড়ির কাছে রামহরি মিস্ত্রি লেন ও উমা দাস লেনে। এছাড়া শহরের আরও নানা জায়গায় বেশ্যারা ছড়িয়ে ছিল, যেমন বালাখানায়, গৌরীবেড়ে, জানবাজার ইত্যাদি জায়গায়। কালীঘাট ও চেতলাও বেশ্যাদের পীঠস্থান ছিল। কালীঘাটের বেশ্যাদের কথা আমরা জনৈকা ইংরেজ মহিলা মিসেস এলিজা ফে-র বিলাতে এক বান্ধবীর কাছে লিখিত পত্রে পড়ি।

এখানে একটা কথা বলা দরকার যে সেকালের বটতলার সাহিত্য সংস্থাগুলি গড়ে উঠেছিল সোনাগাছির বেশ্যাপল্লীরই আশেপাশে। এখানে আরও বলা দরকার যে রঙ্গালয় ও অভিনয় কলার প্রথম অধ্যায় রচিত হয়েছিল শহরের বারবণিতাদের নিয়ে। বস্তুতঃ সে যুগের নামজাদা অভিনেত্রীদের মধ্যে যাঁরা যশস্বিনী হয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই পতিতাপল্লীর অধিবাসিনী ছিলেন। যথা ক্ষেত্রমণি, কাদম্বিনী, খাদুমণি, হরিদাসী, রাজকুমারী, বিনোদিনী, নারায়ণী, তারাসুন্দরী, আঙুরবালা, আশ্চর্যময়ী প্রমুখ। এদের সকলকেই রূপজীবিকা মহল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। এঁদের অভিনয় দেখে চমকিত হয়েছিলেন ১৮৮৩ থেকে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ সময়কালে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস থেকে এইসব রূপজীবিকারা অন্তর্হিত হল বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশকে যখন শিশিরকুমার ভাদুড়ির সঙ্গে অভিনয় করতে লাগলেন শিক্ষিতা মহিলারা।

বর্তমান শতাব্দীর ত্রিশের দশকের গোড়ায় 'লীগ অভ্ নেশনস্'-এর এক সমীক্ষা দল যখন কলকাতায় এসেছিলেন পতিতাবৃত্তি সম্বন্ধে সরজমিনে তদন্ত করবার জন্য, তখন তাঁরা দেখেছিলেন যে পার্ক সার্কাস অঞ্চলে সোভিয়েতদেশীয় বারাঙ্গনারা কেন্দ্রীভূত হয়ে খুব জাঁকালো রকমের বেশ্যাবৃত্তি চালাচ্ছে। তখন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বারাঙ্গনারা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট অঞ্চলে, আর ইউরোপীয় বারাঙ্গনারা পার্ক ষ্ট্রীট অঞ্চলে।

গত শতাব্দীর দুই মহাপুরুষ শিবনাথ শাস্ত্রী ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন পতিতাদের দুর্দশায়। কথিত আছে যে বিদ্যাসাগর মশায় একদিন শীতের রাত্রে পথের ধারে কনকনে শীতের মধ্যে বারবনিতাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পকেট থেকে অনেকগুলো নোট বের করে তাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিলেন—'মা লক্ষ্মীরা, তোমরা ঠাণ্ডায় থেক না, অসুখ করবে, যাও, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়'।

## ৩৬০ কলকাতার রাস্তার নামাবলী

কলকাতায় মোট ২১৪২ টা বড় রাস্তা ও গলি আছে। অধিকাংশ রাস্তার ইতিহাসই আমাদের জানা ছিল না। এ সম্বন্ধে বিশেষ অনুশীলন করে আমি ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে আমার 'কলকাতা ঃ পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস' (জেনারেল প্রিনটারস, ১৯৮১) গ্রন্থতে সন্নিবেশিত করি। সেই গ্রন্থে রাস্তাগুলিকে আমি দশ ভাগে ভাগ করেছি। এ দশটা ভাগ হচ্ছে—

(১) অধিকাংশ রাস্তাই কোন বিশিষ্ট লোকের নামে নামাঙ্কিত, (পরে দেখুন)

(২) কতকগুলো রাস্তার নাম জাতি বা পদবী বা বৃত্তিবাচক। যথা—আহিরীটোলা স্ট্রীট, আহিরীপুকুর রোড, উড়িয়াপাড়া লেন, কপালিটোলা রোড, কপালিবাগান লেন, কলুটোলা স্ট্রীট, কসাই পাড়া লেন, কাঁসারিপাড়া রোড, কামারডাঙ্গা রোড, কুণ্ডু লেন, কুমারটুলি স্ট্রীট, কুমারপাড়া লেন, খালাসীতলা রোড, গোঁসাই লেন, গোপ লেন, গোয়াবাগান লেন, গোয়ালটুলি লেন, জেলিয়াপাড়া লেন, তাঁতিবাগান রোড, দর্জিপাড়া লেন, নাথের বাগান স্ট্রীট, পটুয়াটোলা লেন, পার্শিবাগান লেন, প্রামাণিক ঘাট রোড, বেদিয়াডাঙ্গা রোড, বেনিয়াটোলা স্ট্রীট, বেনিয়াপুকুর রোড, বেপারীপাড়া লেন, ব্রাহ্মণপাড়া লেন, মেছুয়াবাজার লেন, যোগীপাড়া মেন রোড, শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, শেঠপুকুর রোড, শেঠবাগান লেন, সৎচাষীপাড়া রোড, সাঁতরাপাড়া লেন, সিকদারপাড়া লেন, সিকদার বাগান স্ট্রট, স্যাকরাপাড়া লেন, হালদার লেন, হালদার বাগান লেন ও ছুতোরপাড়া লেন ইত্যাদি।

(৩) কতকগুলি রাস্তা উদ্যান বা ফলফুলের নাম বা কোন আঞ্চলিক বড় বৃক্ষের নাম বহন করছে—যথা ইডেন গার্ডেন রোড, একডালিয়া রোড, কলাবাগান লেন, কেয়াতলা রোড, ক্যাসুরিনা অ্যাভেন্যু, চাঁপাতলা লেন, ঝাউতলা রোড, ডালিমতলা লেন, ইণ্টালী রোড, দেওদার স্ট্রীট, নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, নিউ কাশিয়াবাগান লেন, নিমতলা ঘাট স্ট্রীট, পানবাগান লেন, পাম অ্যাভেন্যু, ফার্ণ রোড, ফুলবাগান রোড, বকুলতলা রোড, বকুলতলা লেন, বাঁশতলা গলি, বাগবাজার স্ট্রীট, বালিগঞ্জ গার্ডেন, তালতলা স্ট্রীট, বেলগাছিয়া রোড, ম্যাণ্ডেভিনা গার্ডেন, শীলস্ গার্ডেন লেন, সবজিবাগান লেন, আমড়াতলা লেন, মথুর সেন গার্ডেন লেন, সিংহিবাগান লেন, মোহনবাগান লেন, নন্দনবাগান লেন, হোগলকুড়িয়া, সিমুলিয়া ইত্যাদি।

(৪) কতকগুলি রাস্তার সঙ্গে ঠাকুরদেবতার বা সাধুসন্ত বা দেবায়তনের নাম সংশিষ্ট। যথা—ওলাইচণ্ডী রোড, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কালী টেম্পল লেন, কালীঘাট রোড, গুরু নানক সরণী, ঘোড়বিবি লেন, গৌরাঙ্গ মন্দিররোড, গ্রীকচার্চ রো, ক্যাথিড্রাল রোড, চণ্ডীতলা লেন, চৌরঙ্গী রোড, চ্যাপেল রোড, জগন্নাথ টেম্পল রোড, ধর্মতলা স্ট্রীট, পঞ্চাননতলা রোড, পার্শিচার্চ স্ট্রীট, বদ্রিদাস টেম্পল স্ট্রীট, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল লেন, মদনমোহন তলা স্ট্রীট, মনসাতলা রো, শীতলা লেন, ষষ্টিতলা রোড, সর্বমঙ্গলা লেন, চিৎপুর রোড, সিদ্ধেশ্বরী রোড, হনুমানজী লেন, হরিসভা স্ট্রীট, ব্রাহ্মসমাজ রোড ইত্যাদি।

(৫) কতকগুলি রাস্তার নাম মিস্ত্রী, ওস্তাগর, খানসামা, মুদি, ধোপানি প্রভৃতির নাম

থেকে উদ্ভুত। যেমন আসগর মিস্ত্রী লেন, গুলু ওস্তাগর লেন, চমরু খানসামা লেন, ছকু খানসামা লেন, ছিদাম মুদী লেন, রানীমুদির গলি, পাঁচি ধোপানীর গলি, বুদ্ধু ওস্তাগর লেন, মিস্ত্রীপাড়া লেন, রহিম ওস্তাগর রোড, রামহরি মিস্ত্রীর লেন ইত্যাদি।

(৬) কতকগুলি রাস্তা ও জায়গার নামকরণ করা হয়েছে পন্যদ্রব্য অনুযায়ী। যথা—কটন স্ট্রীট, তুলাপটি, কাঠগোলা লেন, দইহাটা স্ট্রীট, খ্যাংড়াপটি, সিন্দুরিয়াপটি, গরাণহাটা স্ট্রীট, চাউলপটি রোড, দরমাহাটা স্ট্রীট, মীনাপাড়া রোড, সুরতীবাগান স্ট্রীট, মুরগীহাটা ও চিংড়িহাটা লেন।

(৭) কতকগুলি রাস্তা ও জায়গা এককালের পুকুরের নাম বহন করে, যেমন কাঁটাপুকুর লেন, চুনাপুকুর লেন, ঝামাপুকুর লেন, তনুপুকুর রোড, তালপুকুর রোড, নলপুকুর লেন, পদ্মপুকুর রোড, শ্যামপুকুর স্ট্রীট, জোড়াপুকুর লেন, হেদুয়া, গোলদিঘি ও লালদিঘি।

(৮) কতকগুলি রাস্তার একটু অদ্ভুত ধরনের নাম আছে, যেমন চোরবাগান লেন, হাতিবাগান রোড, হাতিবাগান লেন ইত্যাদি।

(৯) ছ'টি রাস্তার নাম সাংস্কৃতির বিশিষ্টতা বহন করছে। বইয়ের নামে দু'টো রাস্তা আছে, যথা—বিশ্বকোষ লেন ও স্বর্ণলতা স্ট্রীট। আর চারটা রাস্তা হচ্ছে লাইব্রেরী রোড, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট ও ন্যাশনাল লাইব্রেরী রোড, বয়েজ ওন লাইব্রেরী রো।

(১০) আনেক রাস্তার নামের উৎপত্তির খেই আমরা হরিয়ে ফেলেছি, যেমন গরিয়া, গরচা, গোবরা, তিলজলা, ঢাকুরিয়া, শিয়ালদহ, তপসিয়া, ট্যাংরা, চেতলা, নৈনান ও সিঁথি। এগুনির উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক কলকাতা বিশারদ অনেক আজগুবি গল্প ফেঁদেছেন, কিন্তু সে সবের কোন ভিত্তি নেই।

এবার কতকগুলো রাস্তা সম্বন্ধে বলব।

(১) অকটারলনী রোড—রানী রাসমনি অ্যাভেন্যু দ্রষ্টব্য।

(২) অরবিন্দ সরণী—প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা, দার্শনিক যোগী ও পণ্ডিচেরী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা অরবিন্দ ঘোষের (১৮৭২-১৯৫০) নামে চিহ্নিত। রাস্তাটি পুরাতন গ্রে স্ট্রীটের (দ্রঃ) পরিবর্তিত নাম। এর বর্দ্ধিত অংশ এখন গ্রে স্ট্রীট এক্সটেনশন নামে পরিচিত। উত্তর কলকাতায় অবস্থিত।

(৩) অশ্বিনী দত্ত রোড—দক্ষিণ কলকাতার এই রাস্তাটি প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ও রাজনৈতিক নেতা অশ্বিনী কুমার দত্তের (১৮৫৬-১৯২৬) নামে চিহ্নিত। দক্ষিণ কলকাতায় অবস্থিত রাস্তাটা ৭৪ নং মহানির্বাণ রোড থেকে বেরিয়েছে।

(৪) আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড—বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিদ ও জীববিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর ( ১৮৫৯-১৯৩৭) নামে চিহ্নিত। পুরাতন লোয়ার সারকুলার রোডের পরিবর্তিত নাম। বৌবাজারের মোড় থেকে শুরু হয়ে ৫৮ নং চৌরঙ্গী রোডে গিয়ে শেষ হয়েছে।

আবদুল হামিদ স্ট্রীট। পুরাতন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটের পরিবর্তিত নাম। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট দেখুন।

আমহার্স্ট স্ট্রীট—বর্তমান নাম রামমোহন সরণী (দ্রঃ)। ১৬৭ নং বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে উত্তর দিকে মানিকতলা পর্যন্ত গিয়েছে। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ

রাস্তাটি নির্মিত হয় ও তৎকালীন বড়লাট লর্ড আমহার্স্টের (১৮২৩-১৮২৮) নামে অভিহিত হয়।

আরকুহার্ট স্কোয়ার—হেদুয়ার পূর্বদিকের রাস্তা। পুরাতন নাম কর্নওয়ালিস স্কোয়ার। আরকুহার্ট স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যক্ষ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন।

আশুতোষ মুখার্জি রোড—পুরাতন রসা রোডের এক অংশের নাম। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪-১৯২৪) প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্, গণিতজ্ঞ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। ভবানীপুরে অবস্থিত।

ইলিয়ট রোড—জন ইলিয়ট সেকালের কলকাতা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এবং পুলিশ ও কনজারভেনসীর বড়কর্তা ছিলেন। আগে এই রাস্তার নাম ছিল 'আহম্মদ জমাদারের রাস্তা।'

উড স্ট্রীট—হেনরী উড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। এই রাস্তারই এক বাড়িতে 'হিন্দু স্টুয়ার্ট' (কর্নেল স্টুয়ার্ট) বাস করতেন। বাঙলার ছোটলাটও কিছুকাল ওই বাড়িতে বাস করতেন। ২২ নম্বর পার্ক স্ট্রীট থেকে রাস্তাটা বেরিয়েছে।

ওলড্ কোর্ট হাউস স্ট্রীট—পুরাতন আদালতের (এখন যেখানে সেণ্ট এ ুজ গির্জা) সামনের রাস্তা বলে একে ওলড্ কোর্ট হাউস স্ট্রীট বলা হয়। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে এই রাস্তাটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। রাজভবনের পূবদিক থেকে বেরিয়ে রাস্তাটা রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনে এসে শেষ হয়েছে।

ওলড্ পোষ্ট অফিস স্ট্রীট—বর্তমান হাইকোর্টের কাছে সেকালের বড় ডাকঘর ছিল। আগে এখানে অনেক বড় বড় লোকের বাসভবন ছিল। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান অধিকৃত স্থানে নূতন কোর্ট হাউস (সুপ্রিম কোর্ট) নির্মিত হয়। তারপর থেকে এটা এটর্নীপাড়া হয়। ১৮৬২ থেকে ১৮৭২ সময়ে বর্তমান হাইকোর্ট নির্মিত হয়। বর্তমান হাইকোর্টের পশ্চিমাংশেই সুপ্রিম কোর্ট ছিল। ৫ নং কিরণশঙ্কর রায় রোড থেকে রাস্তাটা বেরিয়েছে।

ওলড্ মেয়রস্ কোর্ট—শোভাবাজার রাজবাটির পিছনের রাস্তা। নবকৃষ্ণ দেবের আমলে শোভাবাজার রাজবাটিতে যে জাতিমালা কাছারী ছিল, এ তার স্মৃতি বহন করছে। ৮২ নং যতীন্দ্রমোহন অ্যাভেন্যু থেকে রাস্তাটা বেরিয়েছে।

কয়লাঘাট স্ট্রীট—কয়লার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। এটা কেল্লার ঘাটে যাবার রাস্তা ছিল। তা থেকেই বিকৃত উচ্চারণে বর্তমান নামকরণ হয়েছে। ১৮নং স্ট্র্যাণ্ড রোড থেকে বেরিয়ে রাস্তাটা বি-বা-দী বাগের সামনে এসে শেষ হয়েছে।

ওয়েস্টন স্ট্রীট—চার্লস ওয়েস্টনের নামে এই গলির নামকরণ হয়েছিল। ওয়েস্টন কলকাতার একজন নামজাদা ব্যক্তি ছিলেন, এবং নন্দকুমারের মামলায় একজন জুরি ছিলেন। তিনি তাঁর দানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ৭২ নম্বর বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট থেকে রাস্তাটা বেরিয়েছে।

এণ্টনী বাগান লেন—ইংরেজরা আসবার আগে এণ্টনী ছিলেন একজন বড় লবণ ব্যবসায়ী। পরে তিনি সাবর্ন চৌধুরীদের নায়েব ছিলেন। এখানে এণ্টনী সাহেবের বাসভবন, বাগান ও গদি ছিল। এন্টনী পরে কাঁচরাপাড়ায় বাস করতেন। ৬৩ নং আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড থেকে বেরিয়েছে।

এসপ্ল্যানেড রো—বর্তমান রাজভবন নির্মিত (১৮০৩) হবার পূর্বে এই রাস্তাটি ধর্মতলার মোড় থেকে বরাবর চাঁদপাল ঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জনপ্রবাদ এই রাস্তার ওপর ওয়ারেন হেস্টিংস-এর বাসভবন ও কাছারী ছিল। ব্যারনেস ইম্পফকে বিয়ে করবার পর তিনি হেস্টিংস স্ট্রীটের বাড়িতে উঠে যান। তাঁর এই হেস্টিংস স্ট্রীটের বাড়িতেই পরে বার্ন কোম্পানির অফিস ছিল। ১৭ নং গভর্নমেন্ট প্লেস ইষ্ট থেকে রাস্তাটা বেরিয়েছে।

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট—বিধান সরণী (দ্রঃ) পূর্ব নাম। বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিসের নামে অভিহিত এই রাস্তাটি কলকাতার লটারী কমিটি (১৮২০-৪০) কর্তৃক নির্মিত হয়। আগে শহরের কেন্দ্রস্থলে এটাই সবচেয়ে বড় রাস্তা ছিল।

কাউনসিল হাউস স্ট্রীট—আগে (১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে) এখানে একটি কাউনসিল হাউস বা মন্ত্রণাগৃহ ছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে সে বাড়িটা ভেঙে ফেলা হয়। ১নং হেয়ার স্ট্রীট থেকে রাস্তাটা বেরিয়েছে।

কাজি নজরুল ইসলাম অ্যাভেন্যু—কলকাতার পূর্বপ্রান্তে ভি. আই. পি. রোডের নাম। 'বিদ্রোহী কবি' কাজি নজরুল ইসলামের (১৮৯৮-১৯৭৬) নামে রাস্তাটি নামাঙ্কিত।

কালীচরণ ঘোষ রোড—কলিকাতা করপোরেশনের এটাই উত্তরতম রাস্তা। এখানেই করপোরেশনের সীমানা শেষ। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড থেকে বেরিয়ে রাস্তাটি সর্পিলগতিতে দমদম রেল স্টেশনের সিঁড়িতে গিয়ে শেষ হয়েছে।

কালীঘাট রোড—২-বি শ্যামাচরণ মুখার্জি রোড থেকে বেরিয়ে কালীঘাট মন্দিরে গিয়ে শেষ হয়েছে। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট কর্তৃক রাস্তাটি বর্তমান শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছে। আগেকার Road to colligot থেকে রাস্তাটি স্বতন্ত্র।

কাশীনাথ দত্ত রোড—ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড থেকে বেরিয়ে রাস্তাটি পশ্চিম দিকে বরানগর বাজার পর্যন্ত গিয়েছে। পূর্ব দিকে কালীচরণ ঘোষ রোডের ন্যায় পশ্চিম দিকে রাস্তাটি কলিকাতা করপোরেশনের উত্তরতম সীমানা।

কিড স্ট্রীট—বর্তমান নাম মহম্মদ ইশাক রোড(দ্রঃ)। বোটানিক্যাল গার্ডেনের প্রতিষ্ঠাতা লেফটানেণ্ট কর্ণেল রবার্ট কিডের নামে এর নামকরণ হয়েছিল। এঁর ছেলে জনস কিড ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে খিদিরপুরে এক ডক্ প্রতিষ্ঠা করেন। কিড সাহেবের নাম থেকেই 'কিডারপুর' বা খিদিরপুর হয়। ৩০ নং জহরলাল নেহেরু রোড থেকে রাস্তাটি বেরিয়েছে।

কিরণশঙ্কর রায় রোড—পূর্ব নাম হেস্টিংস স্ট্রীট(দ্রঃ)। রাজনীতিজ্ঞ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (বিধান চন্দ্র রায়ের আমলে) কিরণশঙ্কর রায়ের (১৮৯১-১৯৪৯) নামে পরিবর্তিত। ৫ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড থেকে রাস্তাটা বেরিয়েছে।

কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রীট—কৃষ্ণরাম পলাশী যুদ্ধের আমলের লোক। লবণের ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। পরে তিনি হুগলির দেওয়ান হন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় কৃষ্ণরাম বসু লাখ টাকার চাল বিতরণ করেন। রাস্তাটি শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর পিছনে।

ক্যানিং স্ট্রীট—বর্তমান বিপ্লবী রাসবিহারী স্ট্রীট(দ্রঃ)। ক্যানিং স্ট্রীটের পুরাতন নাম মুরগীহাটা। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রাস্তাটি তৈরী হয় ও বড়লাট লর্ড ক্যানিং-এর নামে নামাঙ্কিত হয়।

ক্যামাক স্ট্রীট—উইলিয়াম ক্যামাক, লর্ড কর্ণওয়ালিস ও লর্ড ওয়েলেসলীর আমলের একজন সিনিয়র মার্চেণ্ট ছিলেন। এই রাস্তার আশেপাশে তাঁর বহু সম্পত্তি ছিল। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলার জজ নিযুক্ত হন। আগে এই রাস্তার নাম ছিল 'ডানকান বস্তিকা রাস্তা'।

ক্রস স্ট্রীট—বর্তমান নাম যমুনালাল বাজার স্ট্রীট (দ্রঃ)। নয়নচাঁদ মল্লিক বড়বাজারে একটা পাকা রাস্তা তৈরি করে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দান করেন। সেটাই ক্রস স্ট্রীট।

ক্লাইভ স্ট্রীট—বর্তমান নাম নেতাজী সুভাষ রোড (দ্রঃ)। পুরাতন কেল্লা থেকে বড়বাজারে শেঠদের বাড়ি যাবার রাস্তা। সেটাই বিস্তৃত করে ক্লাইভ স্ট্রীট হয়। (লর্ড ক্লাইভের নামে অভিহিত)। বর্তমান শতাব্দীর চল্লিশের দশকে সেই নাম পরিবর্তিত করে নেতাজী সুভাষ রোড রাখা হয়। এটাই ইংরেজ আমলে কলকাতার ব্যবসাপাড়া ছিল। এখনও অংশত তাই।

গরিয়াহাট রোড—১৯নং আশুতোষ চৌধুরী অ্যাভেন্যু থেকে রাস্তাটা বেরিয়েছে। ঢাকুরিয়া ব্রীজ থেকে রাস্তাটার নাম গরিয়াহাট রোড সাউথ।

আশুতোষ চৌধুরীর অ্যাভেন্যু—১/১ সৈয়দ আমির আলি অ্যাভেন্যু থেকে রাস্তাটা বেরিয়েছে। (পরে দেখুন)

গান ফাউণ্ডারী রোড—বর্তমান নাম খগেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী রোড। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের চিড়িয়ামোড় থেকে রাস্তাটা পশ্চিম দিকে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত চলে গিয়েছে। এই রাস্তার ওপর কাশীপুর গান অ্যাণ্ড শেল ফ্যাকটরী ও সর্বমঙ্গলা এবং চিত্তেশ্বরী দেবীর মন্দির। চিড়িয়ামোড় থেকে পূব দিকের রাস্তাটার নাম দমদম রোড।

গিরিশ অ্যাভেন্যু—১১৪নং যতীন্দ্রমোহন অ্যাভেন্যু (দ্রঃ) থেকে রাস্তাটা আরম্ভ। রাস্তাটি চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যু ও যতীন্দ্রমোহন অ্যাভেন্যুর বিস্তৃতি। অনন্য সাধারণ অভিনেতা ও নাট্যকার এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একান্ত শিষ্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৬-১৯১২) নামে রাস্তাটি অভিহিত।

গ্রাণ্টস্ লেন—কোম্পানির একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী চার্লস গ্রাণ্টের নামে এর নামকরণ। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ম্যাপে দেখতে পাওয়া যায় যে তখন মাত্র কয়েক ঘর ইংরেজ এই রাস্তার ধারে বাস করত। ৮২নং বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট থেকে রাস্তাটি বেরিয়েছে।

গ্রে স্ট্রীট—বর্তমান নাম অরবিন্দ সরণী। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রাস্তাটি তৈরি হয়। গ্রে সাহেব তখন বাঙলার ছোটলাট ছিলেন।

চার্ণক প্লেস—জিঃ পি. ও.-র সামনে পূর্বদিকের রাস্তা।

চিৎপুর রোড—বর্তমান নাম রবীন্দ্র সরণী (দ্রঃ)। এটা অতি পুরানো কালের পথ। মুঘল বাদশাহদের আমল থেকেই রাস্তাটির অস্তিত্ব। তখন এটা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অপ্রশস্ত বন্যপথ ছিল। এই রাস্তা দিয়ে কাপালিক ও শাক্ত সন্ন্যাসীরা চিত্তেশ্বরী দেবীর কাছে পূজা দিয়ে কালীঘাটে যেতেন। ইংরেজ আমলে চিৎপুর রোড প্রশস্ত ও সুগম করা হয়েছিল। কলকাতার রাজপথে জল দেওয়া এই চিৎপুর রোডেই শুরু করা হয় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩ মে তারিখ থেকে রবীন্দ্র সরণী নামে অভিহিত।

চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যু—১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট গঠিত হবার পর এই রাস্তাটি তৈরির কাজ শুরু হয়। প্রথম দফায় এটা বৌবাজার স্ট্রীট পর্যন্ত আসে। তখন বাঙলার প্রথম ছোটলাট স্যার ফ্রেডেরিক হ্যালিডের নামে (এর পুরাতন নাম অনুযায়ী) হ্যালিডে স্ট্রীটই ছিল। পরে এটা বিডন স্ট্রীট পর্যন্ত এলে এর নাম রাখা হয় সেন্ট্রাল অ্যাভেন্যু। পরে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ মে থেকে ওই নাম পরিবর্তন করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নামে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যু রাখা হয়। শ্যামবাজার ভূপেন বসু অ্যাভেন্যুর মোড় থেকে উত্তর অংশের নাম 'যতীন্দ্রমোহন অ্যাভেন্যু' ও তার উত্তর অংশের নাম 'গিরিশ অ্যাভেন্যু'।

চোরবাগান—মুক্তারামবাবু স্ট্রীট (দ্রঃ)।

চৌরঙ্গী প্লেস—১৮নং জহরলাল নেহেরু রোড থেকে বেরিয়েছে।

চৌরঙ্গী রোড—৬০ নং জহরলাল নেহেরু রোড থেকে বেরিয়েছে।

চৌরঙ্গী স্কোয়ার—'স্টেটসম্যান' পত্রিকা বিলিডিং-এর সামনের রাস্তা। স্টেটসম্যান' পত্রিকার পাশের রাস্তার নাম 'চৌরঙ্গী অ্যাপ্রোচ'।

চৌরঙ্গী লেন — ২ নং সদর স্ট্রীট থেকে বেরিয়েছে।

জহরলাল নেহেরু রোড—আগের নাম চৌরঙ্গী রোড। চৌরঙ্গী রোডই ইংরেজদের নির্মিত কলকাতার প্রথম রাস্তা যেটা 'রোড' অ্যাখ্যা পায়। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের উট সাহেবের ম্যাপে ধর্মতলা থেকে পার্ক স্ট্রীট পর্যন্ত 'চৌরঙ্গী রোড' বলে দেখানো হয়েছে। ওর দক্ষিণের অঞ্চলকে চৌরঙ্গী গ্রাম বলা হত। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের আপজনের ম্যাপে ওই অঞ্চলকে 'ডিহি বিরজি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই চৌরঙ্গীর জঙ্গল কাটানো শুরু হয়েছিল।

জানবাজার রোড—সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি (দ্রঃ) রোডের পুরাতন নাম। আগে সমগ্র করপোরেশন স্ট্রীট (পরে সুরেন্দ্র ব্যানার্জি রোড দ্রঃ) জানবাজার রোড নামে পরিচিত ছিল। জানবাজার 'জান বাজার' (John's Bazar) শব্দের অপভ্রংশ। জন নামে এক সাহেব এখানে একটা বাজার স্থাপন করেছিলেন।

জেলিয়াপাড়া লেন—২নং হিদারাম ব্যানার্জি লেন থেকে বেরিয়েছে। কলকাতার প্রাচীন জেলিয়াদের বসতি। এক সময় বছরের শেষ দিনে 'জেলিয়াপাড়ার সঙ' প্রসিদ্ধ ছিল।

ডিঙ্গাভাঙ্গা লেন—৩৯ ও ৪০ নং লেনিন সরণীর মাধ্যের গলি। এই বইয়ে 'কলকাতার প্রাচীন খাল' অধ্যায় দেখুন।

ডেকার্স লেন—কলকাতার কালেকটর (১৭৭২) পি. এম. ডেকার্স সাহেবের নামে এটার নামকরণ হয়। ১নং ওয়াটারলু স্ট্রীট থেকে গলিটা বেরিয়েছে। এই ডেকার্স লেনেই এক সময় বাস করত একটি সুন্দরী মেয়ে যে শাড়ি পরত ও দিদিমার সঙ্গে কালীমন্দিরে যেত। পরে আত্মগোপন করে সে হলিউডে পালিয়ে গিয়ে হয়েছিল প্রখ্যাতা অভিনেত্রী মারল্ আবেরন।

ডোমতলা স্ট্রীট—১৪ ও ১৫ রাধাবাজার ষ্ট্রীটের মধ্যের গলি।

তিলজলা রোড—৮নং রামেশ্বর সাউ রোড (হাতিবাগান, এণ্টালী) থেকে বেরিয়েছে।

থিয়েটার রোড—বর্তমান নাম শেক্সপীয়ার সরণী (দ্রঃ)। ৪৬ নং চৌরঙ্গী রোড থেকে রাস্তাটা বেরিয়েছে। চৌরঙ্গী ও থিয়েটার রোডের মিলনস্থলে ১৮২৩ থেকে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একটা থিয়েটার ছিল। সেজন্য এর নাম হয়েছিল থিয়েটার রোড। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ মে তারিখে আগুন লেগে থিয়েটার বাড়িটা ভস্মীভূত হয়ে যায়। কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত জজ (১৮৬৬-১৮৭৭) মার্কবী সাহেব ওই জায়গায় নির্মিত এক বাড়িতে বাস করতেন।

দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রীট—মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বৃদ্ধপ্রপিতামহ দর্পনারায়ণ ঠাকুর ফরাসী গভর্ণমেণ্টের দেওয়ানী করে বহু পয়সা উপার্জন করেছিলেন। রাস্তাটি পাথুরিয়াঘাট অঞ্চলে অবস্থিত।

দিল্লীপটি—ক্যানিং স্ট্রীটের (বিপ্লবী রাসবিহারী স্ট্রীট ) সামনে কলুটোলার (বর্তমান নাম মৌলানা সউকত আলি স্ট্রীট) শেষাংশ।

ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লেন—দুর্গাচরণ সেকালের নামজাদা ডাক্তার ও স্বনামধন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা। রাস্তাটি তালতলা অঞ্চলে অবস্থিত।

দমদম রোড—ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের চিড়িয়ামোড় হতে রাস্তাটি পূব দিকে নাগের বাজার পর্যন্ত চলে গিয়েছে।

দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট—দুর্গাচরণ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী তারিণীচরণ মিত্রের পিতা। রাস্তাটি দর্জিপাড়ায় অবস্থিত।

দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় স্ট্রীট—দেওয়ান দুর্গাচরণ কোম্পানির পার্টনার আফিম এজেন্সীর সর্বেসর্বা ছিলেন। রাস্তাটি বাগবাজারে।

দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন—দ্বারকানাথ রবীন্দ্রনাথের পিতামহ। প্রথমে শুল্ক, লবণ ও অহিফেন বোর্ডের দেওয়ান ছিলেন। পরে স্বাধীন ব্যবসা করেন। 'কার টেগোর কোম্পানি'র প্রতিষ্ঠাতা। রাস্তাটি জোড়াসাঁকোয় অবস্থিত। এই রাস্তারই ৬নং বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের জন্ম ও মৃত্যু হয়।

ধর্মতলা স্ট্রীট—বর্তমান নাম লেনিন সরণী (দ্রঃ)। হর্নেল সাহেবের মতে আগে জানবাজারে বৌদ্ধদের একটি কেন্দ্র ছিল, এবং তা থেকেই ধর্মতলা নাম হয়েছিল।, অন্য মত অনুযায়ী ওই অঞ্চলে ধর্ম ঠাকুরের এক আস্তানা ছিল। অপর মত হচ্ছে এই রাস্তার মোড়ে যে মসজিদ আছে এবং হার্ট ব্রাদারস্-এর যেখানে ঘোড়ার আস্তাবল ছিল, সেখানে আগে একটা মসজিদ ছিল, তা থেকেই এর নাম ধর্মতলা হয়েছে। ধর্মতলায় শীলবাবুদের একটা বাজার ছিল। তাদের দখলের আগে ওখানে মেম্বা পীরের বাজার ছিল। আর ধর্মতলা ও চৌরঙ্গী রোডের মিলনস্থলেও একটা বাজার ছিল। ১৮৮৭ সালে যদুনাথ মল্লিক ওই বাজারটা কিনেছিলেন। চাদনীচকের কাছেও একটা বাজার ছিল। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের 'ক্যালকাটা গেজেট-এ দেখা যায় যে তখন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের নাম ছিল 'ধর্মতলা স্কোয়ার'।

নরদারণ অ্যাভেন্যু—১৭ ও ১৮ নং রাজা মনীন্দ্র রোড থেকে রাস্তাটা বেরিয়েছে ও দমদম রোডে গিয়ে শেষ হয়েছে।

নিমতলা ঘাট স্ট্রীট—১ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড থেকে বেরিয়েছে। এই রাস্তারই ৫৮ নং থেকে নিমতলা লেন বেরিয়েছে।

নিমু গোস্বামী লেন—আহিরীটোলার গোঁসাই বংশের নিমাইচাঁদ গোস্বামীর নামে অভিহিত। তাঁর চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত রাস সেকালের কলকাতায় এক দর্শনীয় ব্যাপার ছিল। এ থেকেই প্রবাদ হয়েছে—'জন্মের মধ্যে কর্ম, চৈত্র মাসে রাস'। রাস্তাটি আহিরীটোলায় অবস্থিত।

নীলমণি মিত্রের গলি—সিরাজ কর্তৃক কলকাতা লুণ্ঠনের (১৭৫৬) পর ইংরেজরা যে ক্ষতিপূরণ পেয়েছিল, তা এদেশীয় লোকদের মধ্যে বণ্টনের জন্য যে কমিশন গঠিত হয়েছিল নীলমণি মিত্র তার সদস্য ছিলেন।

নেতাজী সুভাষ রোড—আগের নাম 'ক্লাইভ স্ট্রীট' দ্রষ্টব্য।

পার্ক স্ট্রীট—সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্পের এখানে এক সুবৃহৎ বাগান (পার্ক) সহ বাড়ি ছিল। সেজন্যই এর নাম পার্ক স্ট্রীট হয়েছিল। এখানে গভর্ণর ভানসিটার্টেরও বাগানবাড়ি ছিল। 'পার্ক স্ট্রীট' নামকরণের পূর্বে এর নাম ছিল 'বেরিং গ্রাউণ্ড রোড' কেননা এই রাস্তা দিয়ে সাহেবদের শবাধার কবরখানায় নিয়ে যাওয়া হত। ৩০ সি জহরলাল নেহেরু রোড থেকে রাস্তাটা বেরিয়েছে। এই রাস্তায় সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ অবস্থিত। আগে ওই বাড়িতে Sans Souci'' থিয়েটার ছিল। এই থিয়েটারে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২ নভেম্বর তারিখে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী মিসেস ইসথার লীচ আগুনে পুড়ে মারা যান পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে ২ নং বাড়িতে 'এসিয়াটিক সোসাইটি' অবস্থিত।

পার্সিবাগান লেন—৯২ নং আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড় থেকে গলিটা বেরিয়েছে। এই গলির মুখে দক্ষিণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজ ও উত্তরে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর 'বোস ইনস্টিটিউট' অবস্থিত। এখন যেখানে সায়েন্স কলেজ নির্মিত হয়েছে আগে ওখানে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমসাময়িক বিখ্যাত বণিক রুস্তমজী কাওয়াসজীর এক সুন্দর বাগানবাড়ি ছিল। তা থেকেই গলিটার নাম পার্সিবাগান লেন হয়েছে।

প্যারীচরণ সরকার স্ট্রীট—প্যারীচরণ সরকার (১৮২৩-১৮৭৫) হেয়ার স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন। প্যারীচরণ শিক্ষক হিসাবে শিক্ষাদান ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি প্রণয়নেই জীবন শেষ করে গেছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ পুস্তক 'ফার্স্ট বুক অভ রিডিং' বহুকাল ইংরেজি শিক্ষার প্রথম সোপান ছিল। রাস্তাটি কলেজ স্ট্রীটে হেয়ার স্কুল ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী রাস্তা।

প্রতাপাদিত্য রোড—দক্ষিণ কলকাতায় ৭০ নং রাসবিহারী অ্যাভেন্যু থেকে বেরিয়েছে। রাজা প্রতাপাদিত্যের নামে রাস্তাটি অভিহিত।

প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট—পূর্ব নাম সুটারকিন স্ট্রীট। বেলী সাহেবের ম্যাপে রাস্তাটি সুটারকিন লেন' নামে দেখানো হয়েছে। তখন রাস্তাটি কসাইটোলা থেকে বেরিয়ে চাঁদনী চক লেনে গিয়ে পড়েছিল। এটা ওলন্দাজ শব্দ। এখন রাস্তাটি ৪৩ নং বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যু অতিক্রম করে চাঁদনী চক পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রফুল্ল সরকার 'আনন্দবাজর পত্রিকা'র প্রথম সম্পাদক ছিলেন।

প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড—রাস্তাটি দক্ষিণ কলকাতায় ৭১ নং দেশপ্রাণ শাসমল রোড (টালিগঞ্জ ব্রস্ ব্রেজ হতে নির্গত রাস্তা) থেকে বেরিয়েছে। আনোয়ার শাহ টিপু সুলতানের বংশধর ছিলেন।

প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট—আগে নাম ছিল হাড়কাটা গলি ও নিমু খানসামা লেন। রাস্তাটি ১৮/১ কলেজ স্ট্রীট থেকে বেরিয়েছে।

ফৌজদারী বালাখানা—চিৎপুর রোড ও কলুটোলার সংযোগস্থলের সন্নিহিত স্থান। এখানে হুগলির ফৌজদারের কলকাতার বাসভবন (বালাখানা) অবস্থিত ছিল।

ফ্রি স্কুল স্ট্রীট—বর্তমান নাম মির্জা গালিব স্ট্রীট। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের আগে ওখানে ছিল বাঁশের জঙ্গল। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জায়গাটা পরিষ্কার করে সাহেবদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তবে থেকেই এর নাম ফ্রি স্কুল স্ট্রীট। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এটাকে বাড়িয়ে ধর্মতলা স্ট্রীটের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এই রাস্তার এক বাড়িতে ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসকার উইলিয়াম থ্যাকারের জন্ম হয়। তাঁর পিতা রিচমণ্ড থ্যাকারে ২৪ পরগণার কলেকটর ছিলেন।

ফ্যান্সি লেন—আগে এখানে একটি ফাঁসিমঞ্চ ছিল। তা থেকে এর নাম ফ্যান্সি লেন হয়েছে। এর ওপর দিয়ে প্রাচীন কলকাতার পুরানো খাল লবণ হ্রদ পর্যন্ত গিয়েছিল। গলিটা ৫ নং গভর্নমেণ্ট প্লেস উত্তর থেকে বেরিয়েছে।

বড়বাজার—মনে হয় বড়বাজারের অস্তিত্ব ইংরেজ আমলের আগে থেকেই। কেননা ১৭০২-০৩ খ্রীষ্টাব্দের ইংরেজদের আয়-ব্যয়ের হিসাব বইয়ে একে 'গ্রেট বাজার' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য এটা বড়বাজারেরই ইংরেজি ভাষান্তর। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত বড়বাজারের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা গালগল্প ফেঁদেছেন।

বণ্ডেল রোড—২৫ নং আশুতোষ চৌধুরী অ্যাভেন্যু থেকে বেরিয়েছে।

আশুতোষ চৌধুরী অ্যাভেন্যু—১/১ সৈয়দ আমির আলি অ্যাভেন্যু থেকে বেরিয়েছে। স্যার আশুতোষ চৌধুরী (১৮৬০-১৯২৪) ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের একজন প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার ও বিচারপতি এবং বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোলডারস্ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

বনমালী সরকারের স্ট্রীট—তিনি প্রথমে পাটনার রেসিডেণ্ট-এর দেওয়ান ও পরে কলকাতার 'ডেপুটি ট্রেডার' ছিলেন। কুমারটুলিতে তাঁর প্রাসাদতুল্য বাড়ি সেকালের এক দ্রষ্টব্য জিনিষ ছিল।

বাঁকশাল স্ট্রীট—এই রাস্তার মোড়ে ওলন্দাজদের বাঁকশাল বা 'টোল' অফিস ছিল। তা থেকেই এর নামকরণ হয়েছে।

বাগবাজার স্ট্রীট—যেখানে বাগবাজার সার্বজনীন পূজা হয়, সেখানে সেকালে পেরিন সাহেবের বাগান ছিল। এটা সেকালের ইংরেজদের সখের ভ্রমণের স্থান ছিল। 'বাগান' শব্দ থেকেই 'বাগ' শব্দের উৎপত্তি। প্রাণকৃষ্ণ দত্তের মতবাদ এটা 'বাগুয়াবাজার' থেকে উদ্ভূত, ধোপে টেকে না। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে হলওয়েল বাগবাজার নামের উল্লেখ করেছেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে বাগবাজার অঞ্চলে প্রজাবিলি করা হয়। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি গঙ্গার ওপর প্রহরা দেবার জন্য বাগবাজারের সান্নিধ্যে ৩৩৮ টাকা ব্যয়ে এক রক্ষামঞ্চ নির্মাণ করে। এখানে গোরা ও দেশীয় উবয় শ্রেণীরই সৈন্য রাখা হত। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলা যখন কলকাতা আক্রমণ করে, তখন কোম্পানির সৈন্যরা অত্যন্ত সাহসের

সঙ্গে এ জায়গাটাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিল। আগে এখানে কোম্পানির বারুদখানাও ছিল। সেজন্য এর সামনের রাস্তাকে 'ওলড্ পাউডার মিল রোড' বলা হতো। কিছুকাল আগে পর্যন্ত বাগবাজারের বাজারটি কাঞ্চনপুর এস্টেটের সম্পত্তি ছিল। এখন অবাঙালী 'মোদী'দের হাতে গিয়েছে। (আগে পেরিন সাহেবের বাগান দেখুন)।

বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট—'আইন-ই-আকবরী'র অনুবাদক গ্লাডউইন সাহেবের দেওয়ান ছিলেন বারানসী ঘোষ। তাঁর খুল্লতাত পুত্র বলরাম ঘোষ চন্দননগরের ফরাসী গভর্ণমেন্টের দেওয়ান ছিল। বলরাম ঘোষের নামেও রাস্তা আছে। বলরামের ছেলে হরিঘোষ। তার নামেই হরি ঘোষের স্ট্রীট। হরি ঘোষ কোম্পানির দেওয়ানি করে বহু পয়সা উপার্জন করেছিলেন। তাঁর আবাসবাটিতে অনাহুতদের অন্নপ্রাপ্তির বিঘ্ন ঘটত না। সেজন্যই প্রবাদ আছে 'হরি ঘোষের গোয়াল'।

বিডন স্ট্রীট—বর্তমান নাম স্বামী অভেদানন্দ রোড। বাঙলার ছোটলাট স্যার সিসিল বিডনের নামে অভিহিত। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এই নামকরণ হয়।

বিধান সরণী—কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট দ্রষ্টব্য। প্রখ্যাত চিকিৎসক, রাজনীতিজ্ঞ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের (১৮৮২-১৯৬২) নামে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের নাম পরিবর্তিত করা হয়।

বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রীট—বৌবাজার ষ্ট্রীটের পরিবর্তিত নাম। সেকালে এর নাম ছিল 'পূর্বদিকের পথ' (Avenue to the Eastward)। লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে এর নাম ছিল বৈঠকখানা স্ট্রীট। বৌবাজারের প্রসিদ্ধ বেনিয়ান বিশ্বনাথ মতিলাল তাঁর এক পুত্রবধূকে বৌবাজারের বাজারটি দান করেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ম্যাপে লালবাজার থেকে শিয়ালদহ্ পর্যন্ত এই রাস্তাটি বৈঠকখানা স্ট্রীট' বা বৌবাজার' বলে চিহ্নিত। বিশ্বনাথ মতিলাল ১৯ শতকের দ্বিতীয় পাদ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

বিপ্লবী রাসবিহারী স্ট্রীট—ক্যানিং স্ট্রীট দ্রষ্টব্য।

বৃন্দাবন পাল লেন—ভূপেন বোস অ্যাভেন্যু থেকে বেরিয়েছে। এই গলির ভিতর বৃন্দাবন পালের বাড়ি। গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, ধর্মদাস সুর প্রমুখ অভিনেতারা এঁর বাড়িতেই প্রথম অভিনয় করতেন।

বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট—বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের নামে এই রাস্তার নামকরণ হয়েছে। আগে এর নাম ছিল কসাইটোলা এবং কসাইটোলাতেই শহরের বড় বড় দোকান অবস্থিত ছিল (১৭৮৪-১৭৮৮)। এই রাস্তার ওপর এক সময় অস্থায়ী 'গভর্ণমেণ্ট হাউস অবস্থিত ছিল।

বৈষ্ণবচরণ শেঠ স্ট্রীট—ইংরেজদের গোড়ার দিকের দালাল জনার্দন শেঠের পুত্র। তিনি বড়বাজারের বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন।

বৌবাজার স্ট্রীট—বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট দ্রষ্টব্য।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট—প্রাচীন নাম রাণী মুদীর গলি। বর্তমান নাম আবদুল হামিদ ষ্ট্রীট। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের উত্তর দিয়ে ওলড কোর্ট হাউস স্ট্রীট থেকে বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে গিয়ে পড়েছে। কলকাতার প্রাচীন খালটা এর গা দিয়ে গিয়েছিল।

ব্র্যাবর্ন রোড—৪৩এ বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোড থেকে বেরিয়েছে। লর্ড ব্র্যাবর্ন

বাঙলার গভর্নর ছিলেন। ব্যর্থ অস্ত্রোপচারের ফলে কলকাতাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। রাস্তাটির বর্তমান নাম বিপ্লবী ত্রৈলোক্য মহারাজ রোড।

ভীম ঘোষের লেন—ভীম ঘোষ সেকালের একজন বড়লোক ছিলেন। কিন্তু কৃপণ স্বভারের জন্য তাঁর অপবাদ ছিল।

ভূপেন বোস অ্যাভেন্যু—ভূপেন বোস (১৮৫৯-১৯২৪) কলকাতার প্রসিদ্ধ অ্যাটর্ণী ছিলেন। রাজনৈতিক জীবনে স্যার সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জির অনুগামী ছিলেন। কিছুকাল বিলাতে ভারত সচিবের সহকারী হিসাবে কাজ করেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ মার্চ তারিখে গান্ধীজি যখন সস্ত্রীক প্রথম কলকাতায় আসেন, তখন এঁর বাড়িতেই (বলরাম ঘোষ স্ট্রীটে অবস্থিত) ছিলেন। মণ্টেগু সাহেবের শাসন সংস্কার আইন প্রণয়নে সহায়তা করেছিলেন। পুরানো শ্যাম বাজার স্ট্রীটের খানিকটা অংশ বিস্তৃত করেই রাস্তাটি নির্মিত হয়েছিল। রাস্তাটি শ্যামবাজারের পাঁচমাথা থেকে শুরু হয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যু ও যতীন্দ্রমোহন অ্যাভেন্যুতে গিয়ে পড়েছে।

মটস্ লেন—মট সাহেব প্রাচীন কলকাতার একজন স্বাধীন ব্যবসায়ী ছিলেন। পরে তিনি পুলিশের বড়কর্তা হিসাবে কাজ করেন। বর্তমান নাম মণিলাল সাহা লেন।

মতিলাল শীল স্ট্রীট—মতিলাল শীলের (১৭৯২-১৮৫৪) নামে অভিহিত। রাস্তাটি ধর্মতলা অঞ্চলে অবস্থিত।

মথুর সেনস্ গার্ডেন লেন—মথুর সেন তেজারাতি ও ব্যাঙ্কিং কারবারে বহু পয়সা উপার্জন করেন। লাট সাহেবের বাড়ির ফটকের অনুকরণে তাঁর চারফটকওয়ালা প্রাসাদতুল্য বাড়ি ছিল।

মদনমোহন বর্মন স্ট্রীট—১৩৬ রবীন্দ্র সরণী থেকে বেরিয়েছে।

(ডঃ) মহম্মদ ইশাক্ রোড—কিড স্ট্রীট দ্রষ্টব্য।

মহাত্মা গান্ধী রোড—হ্যারিসন রোডের পরিবর্তিত নাম। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এর নির্মাণ আরম্ভ হয়ে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়। এই রাস্তা কলকাতার বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী নয়নচাঁদ মল্লিকের সাত মহল বসতবাড়ি গ্রাস করে। কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান স্যার হেনরি হ্যারিসনের নামে এর নামকরণ হয়। হাওড়া ব্রিজের সামনে ষ্ট্র্যাণ্ড রোড থেকে শিয়ালদহ ষ্টেশনের সামনে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড পর্যন্ত রাস্তাটি বিস্তৃত। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ আগষ্ট থেকে এই নূতন নামকরণ হয়।

মহানির্বাণ রোড—৩৩-এ মনোহরপুকুর রোড থেকে বেরিয়েছে।

মিডলটন স্ট্রীট—৪২ নং জহরলাল নেহেরু রোড থেকে রাস্তাটি বেরিয়েছে। এই রাস্তার নামকরণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেউ বলেন কলকাতার প্রথম বিশপ মিডলটন (১৮১৪-১৮২২), আবার অনেকে বলেন কলকাতার পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট ও পরে সুন্দবনের কমিশনার (১৭৯২) স্যামুয়েল মিডলটনের নামে রাস্তাটির নামকরণ হয়েছিল। স্যামুয়েল মিডলটনের এই অঞ্চলে বহু জমিজমা ছিল।

মির্জা গালিব স্ট্রীট—ফ্রি স্কুল স্ট্রীট দেখুন।

মুক্তারাম বাবুর স্ট্রীট—মুক্তারাম বাবুর পুরা নাম মুক্তারাম দে। ইনি সুপ্রিম কোর্টের দেওয়ান ছিলেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা হলে, তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

এই অঞ্চলের অপর নাম চোরবাগান।

ডঃ মেঘনাদ সাহা রোড—দক্ষিণ কলকাতার সার্দান অ্যাভেন্যুর পরিবর্তিত নাম।

যমুনালাল বাজার স্ট্রীট—ক্রস স্ট্রীট দেখুন।

রতন সরকার গার্ডেনস্ লেন—রতন সরকার ইংরেজ ক্যাপ্টেন ষ্ট্যাফোর্ডের দোভাষী ছিলেন।

রবীন্দ্র সরণী—চিৎপুর রোড দেখুন।

রয়েড স্ট্রীট—সুপ্রিম কোর্টের পিউনি জজ স্যার জন রয়েডের নামে এই রাস্তা অভিহিত। ৪২ নং মির্জা গালিব স্ট্রীট থেকে রাস্তাটা বেরিয়েছে।

রাজা গুরুদাস স্ট্রীট—রাজা গুরুদাস মহারাজ নন্দকুমারের পুত্র। জনপ্রবাদ, বর্তমান বিডন স্কোয়ারের নিকট মহারাজ নন্দকুমারের কলকাতার আবাস ভবন ছিল। আগে এ জায়গাটা চড়কডাঙ্গা নামে পরিচিত ছিল। রাজা গুরুদাস বাঙলার পঞ্চম নবাব নাজির মোবারক উদ্দৌলার দেওয়ান ছিলেন।

রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট—শ্যামবাজার আর. জি. কর রোড থেকে বেরিয়ে ২নং ডাক্তার এস. এন. চ্যাটার্জি সরণীতে গিয়ে শেষ হয়েছে।

রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট—৪৮৬ নং রবীন্দ্র সরণী থেকে শুরু হয়ে হাতিবাগান বাজারের অদূরে অরবিন্দ সরণীতে এসে পড়েছে। মহারাজ নবকৃষ্ণ নিজ ব্যয়ে এই রাস্তাটা তৈরি করেছিলেন।

রাজা বসন্ত রায় রোড—৮৬ নং রাসবিহারী অ্যাভেন্যু থেকে বেরিয়েছে।

রাজা মনীন্দ্র রোড—৬৯ নং ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড থেকে বেরিয়েছে।

রাণী মুদির গলি—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট দেখুন।

রাণী রাসমণি অ্যাভেন্যু—আগেকার অকটারলনী রোড ও লরেন্স রোডের নূতন নাম। অদূরে জানবাজারে রাণী রাসমণির (১৭৯৩-১৮৬১) বাড়ি। তিনি কলকাতার বিরাট ধনী প্রীতিরাম দাসের (মাড়ের) পুত্র রাজচন্দ্রের বিধবা স্ত্রী এবং দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরের (১৮৫৫) প্রতিষ্ঠাতা।

রামমোহন সরণী—আমহার্স্ট স্ট্রীট দেখুন।

রাসবিহারী অ্যাভেন্যু—খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী স্যার রাসবিহারী ঘোষের (১৮৪৫-১৯২১) নামে অভিহিত। রাসবিহারী বহু লক্ষ টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে গেছেন।

রাসেল স্ট্রীট—সেকালের সুপ্রিম কোর্টের জজ স্যার হেনরি রাসেলের (১৮০৬-১৩) নামে এই রাস্তাটির নাম হয়েছে। এই রাস্তার ধারেই রাসেলের বাড়ি ছিল। ৫ নং বাড়িতে বিশপ হেবার শেষের দিকে বাস করতেন। ১২ নং পার্ক স্ট্রীট থেকে রাস্তাটা বেরিয়েছে।

রিপন স্ট্রীট—বড়লাট লর্ড রিপনের নামে এর নামকরণ করা হয়েছিল। ৫৫ এ মির্জা গালিব স্ট্রীট থেকে রাস্তাটা বেরিয়েছে। বর্তমান নাম মুজাফফর আহমেদ স্ট্রীট।

লরেন্স রেঞ্জ—রাণী রাসমণি অ্যাভেন্যু দেখুন।

লায়নস্ রোড—যেখানে আজ রাইটারস্ বিল্ডিং অবস্থিত ওটা একটা পতিত জমি ছিল। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে টমাস লায়নস্ ওই জমিটা কোম্পানির জুনিয়র কর্মচারীদের

বাসগৃহ নির্মাণের জন্য লীজ নেন্। টমাস লায়নস্ সেকালের একজন বিখ্যাত স্থপতি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। কোম্পানির কর্মচারীদের বাসস্থান নির্মাণের পর ওখানে তিনি এক সারি বুটিকের মত ঘর তৈরি করেছিলেন। পিছনের রাস্তাটা লায়নস্ রেঞ্জ নামে অভিহিত হয়। এই রাস্তার ওপরই কলিকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ অবস্থিত।

লারকিনস্ লেন—কোম্পানির অ্যাকাউন্টটেন্ট-জেনারেল উইলিয়াম লারকিনসের নামে এই গলির নামকরণ। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের উডের ম্যাপে এ গলিটা দেখান আছে। ২০ নং ওলড কোর্ট হাউস থেকে রাস্তাটা বেরিয়েছে।

লিণ্ডসে স্ট্রীট—রবার্ট লিণ্ডসের (১৭৫৪-১৮৩৬) নামে এই রাস্তা অভিহিত হয়েছিল। তিনি কোম্পানির অধীনে একজন কর্মচারী ছিলেন। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঢাকার কালেকটর নিযুক্ত হন। ২২ নং জহরলাল নেহেরু রোড থেকে রাস্তাটা বেরিয়েছে। বর্তমান নাম নেলী সেনগুপ্ত সরণী।

লেনিন সরণী—ধর্মতলা স্ট্রীট দেখুন।

শঙ্কর ঘোষ লেন—আরপুলির রামশঙ্কর ঘোষ 'শঙ্কর ঘোষ' নামেই সাধারণে পরিচিত ছিলেন। বেনিয়ানের কাজ করে প্রচুর পয়সা করেছিলেন। রাস্তাটার নিকটে অবস্থিত ঠনঠনিয়া কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা। এই রাস্তার মুখেই বিদ্যাসাগর কলেজ অবস্থিত।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত লেন—সর্বপ্রথম রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় (১৮১৭-১৮৬২) হাইকোর্টের প্রথম বাঙালী জজ নিযুক্ত হন। কিন্তু তার অকালমৃত্যুতে শম্ভুনাথ পণ্ডিত (১৮২০-৬৭) ওই জজিয়াতিটা পান। তিনি কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ ছিলেন। রাস্তাটি ভাবানীপুরে অবস্থিত।

শশিভূষণ দে স্ট্রীট—১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে নেবুতলা লেনের নাম শশিভূষণ দে স্ট্রীট করা হয়। শশিভূষণ (১৮৬৮-১৯৫৮) কলিকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য ছিলেন। একমাত্র পুত্র মারা যাবার পর তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি নানারূপ জনহিতকর কাজের জন্য পৌরসংস্থার হাতে তুলে দেন।

যদুলাল মল্লিক রোড—৩৪ নং কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট থেকে বেরিয়েছে। যদুলাল মল্লিক পাথুরিয়াঘাটার মল্লিক বংশের লোক। তাঁর নির্ভীক বাগ্মীতার জন্য ইংরেজ সমাজে তিনি কলকাতার 'ফাইটিং কক' নামে অখ্যাত ছিলেন। (আগে দেখুন)।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড—১৪৪ নং আশুতোষ মুখার্জী রোড থেকে বেরিয়েছে। শ্যামাপ্রসাদ (১৯০১-১৯৫৩) হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেণ্ট ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার ছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার শিল্প ঢও বাণিজ্য মন্ত্রী ছিলেন।

শ্যামবাজার স্ট্রীট—এ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। পুরানো শ্যামবাজার স্ট্রীটের এক অংশ এখন প্রশস্ত করে ভূপেন বোস অ্যাভেন্যু হয়েছে।

সদর স্ট্রীট—এই রাস্তার ওপর সদর দেওয়ানী আদালত ছিল। ২৬ নং জহরলাল নেহেরু রোড থেকে বেরিয়েছে। এই রাস্তার ১০ নম্বর বাড়িতে বাসকালীন রবীন্দ্রনাথ 'নির্ঝরের স্বপ্নভগ্ন' রচনা করেছিলেন।

সাদার্ন অ্যাভেন্যু—কলকাতার সবচেয়ে চওড়া (১৫০ ফুট) রাস্তা। বর্তমান নাম মেঘনাদ সাহা রোড (দ্রঃ)।

সাহিত্য পরিষদ রোড—পুরানো নাম হোগলকুরিয়া লেন।

সুন্দরীমোহন অ্যাভেন্যু—প্রখ্যাত স্ত্রীরোগ চিকিৎসক ডাক্তার সুন্দরী মোহন দাসের (১৮৫৭-১৯৫০) নামে অভিহিত।

সুরেন্দ্র ব্যানার্জি রোড—আগে নাম ছিল জানবাজার রোড, পরে কর্পোরেশন স্ট্রীট। ১৯২৬ সালের ২৯ আগষ্ট থেকে বর্তমান নাম। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি (১৮৪৮-১৯২৫) প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা ছিলেন।

সুরেশ সরকার রোড—প্রখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। ১৫০ নং আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড থেকে বেরিয়েছে।

স্ট্র্যাণ্ড রোড—১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে লটারী কমিটি গঙ্গার ধারে এই রাস্তাটি তৈরি করে।

হরিণবাড়ী লেন—এখানে পুরানো জেলখানা ছিল।

হরিশ মুখার্জি রোড—ইনি একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সমাজসেবক (১৮২৪-১৮৬১)। ২৪৩ নং আচার্য জগদীশচন্দ্র মুখার্জি রোড থেকে বেরিয়েছে।

হাজরা রোড—৫১-এ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড থেকে বেরিয়েছে,

হেয়ার স্ট্রীট—স্বনামধন্য ডেভিড হেয়ারের (১৭৭৫-১৮৪২) নামে অভিহিত।

হেস্টিংস স্ট্রীট—কিরণ শঙ্কর রায় রোড দেখুন।

হো চি মিন সরণী—আগে নাম ছিল হ্যারিংটন স্ট্রীট। ৪৪ নং জহরলাল নেহেরু রোড থেকে বেরিয়েছে।

হ্যারিসন রোড—মাহাত্মা গান্ধী রোড দেখুন।

## ৩৩ পাঁচপল্লীর পাঁচালী

পাঁচপল্লী বলতে আমি উত্তর কলকাতার বাগবাজারের পাঁচ পল্লীর কথা বলছি। এ পাঁচপল্লী হচ্ছে—কুমারটুলি রাজবল্লভপাড়া, বোসপাড়া, মুখুজ্যেপাড়া, কাঁটাপুকুর ও নেবুবাগান। এর মধ্যে ঐতিহাসিক ঐতিহ্যমণ্ডিত হচ্ছে কুমারটুলি অঞ্চল। ওখানকার লোকদের কথাই আমরা ইতিহাসে পড়ি। ওখানেই ছিল ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডেপুটি ট্রেডার বনমালী সরকারের বাড়ি, যে বাড়িখানা সেকালের কলকাতার এক দর্শনীয় বস্তু ছিল। ওই বাড়ির সামনে দিয়েই প্রতিদিন সকালে পদব্রজে যেতেন মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাগবাজারের ঘাটে গঙ্গাস্নান করতে এবং স্নান সেরে ফেরবার পথে ওই বাড়িতে একবার ঢুঁ মারতেন। বনমালী সরকারের বাড়ির কাছে ওই কুমারটুলি পল্লীতেই ছিল কলকাতার সহকারী কালেক্টর গোবিন্দরাম মিত্রের বাড়ি, যাঁর নির্মিত নবরত্ন মন্দিরটা সেকালের নাবিকদের কাছে এক দিক্‌চিহ্ন ছিল। মন্দিরটা এখনকার শহিদ মিনারের চেয়েও উঁচু ছিল। ১৭৩৭ সালের ঝড়ে মন্দিরটা ধ্বসে পড়ে।

কাছেই ছিল গোকুল মিত্তিরের বাড়ি। ইংরেজদের রসদ সরবরাহ করে তিনি বহু পয়সা উপার্জন করেছিলেন। এত পয়সা যে বিষ্ণুপুরের রাজারা যখন অর্থ সঙ্কটের মধ্যে পড়েছিলেন তখন তাঁরা ওই গোকুল মিত্তিরের কাছে এসেই তাঁদের কুলদেবতা মদনমোহনের বিগ্রহ বন্দক রেখে টাকা ধার করেছিলেন। ওই বিগ্রহ জাগ্রত জানতে পেরে মিত্তিরমশাই ওর অনুরূপ এক মূর্তি নির্মাণ করিয়ে সেটাই ফেরত দেন বিষ্ণুপুরের রাজাদের যখন তাঁরা ঋণ পরিশোধ করতে আসেন। আসল বিগ্রহটা বাগবাজারে গোকুল মিত্তিরের বাড়িতেই থেকে যায়। সেজন্যই জায়গাটার নাম হয় মদনমোহনতলা। গোকুল মিত্তির খুব ঘটা করে রাসযাত্রা উৎসব করতেন। ওঁর বাড়ির সংলগ্ন ছিল এক বিরাট দীঘি। রাসের সময় ওই দীঘিতে চারখানা নৌকা ভাসিয়ে মেয়েদের কবির গান হত। তাছাড়া, গোকুল মিত্তিরের বাড়ির প্রাঙ্গণে রাসের মেলা বসত ও অনেক রকম সঙ বসানো হত।

কাছাকাছিই ছিল কালীশঙ্কর ঘোষের বাড়ি। কালীশঙ্কর ঘোষের বাড়ির কালীপূজা ছিল এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। বাড়ির কর্তা গিন্নী, বৌ-ঝি, ছেলে-পিলে, এমন কি ঝি-চাকর পর্যন্ত সে'দিন মেদ খেয়ে চুর হয়ে থাকত। বহু ছাগ, মহিষ বলি হত। একবার মদের ঝোঁকে কালীশঙ্কর নিজের গুরুদেবকে পর্যন্ত বলি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন।

গোকুল মিত্তিরের বাড়ির বিপরীত দিকে ছিল এক জোড়-বাংলা মন্দির। ওই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কাছে ডাকতরা নরবলি দিত। ১৮৬৪ সালের ঝড়ে ওই মন্দিরটা পড়ে যায়।

বাগবাজারের যে ঘাটে মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করতে আসতেন; তারই সামনে ছিল ইংরেজদের বারুদ খানা। ওখানেই ইংরেজরা স্থাপন করেছিলেন এক তোপমঞ্চ, সিরাজ যখন ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কলকাতায় আক্রমণ করেন তখন তাকে

প্রতিহত করবার জন্য। আবার ওই বারুদখানার সামনের রাস্তা চিৎপুরের পথ দিয়েই আসত কালীঘাট দর্শনে পুণ্যার্থী যাত্রীর দল।

ওই বারুদখানার দক্ষিণেই ছিল পেরিন সাহেবের বাগান-বাড়ি, যেখানে হামেশাই আসতেন ভারতের প্রথম বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস ও শহরের সাহেব-মেমেরা সান্ধ্যভ্রমণ করতে। সেই বাগানটার জমিতেই এখন কলকাতা করপোরেশনের মেটাল ইয়ার্ড, যেখানে বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গাপূজা হয়। পেরিন সাহেবের বাগানের 'বাগ' শব্দ থেকেই বাগবাজার নামের উদ্ভব। ওর সামনেই বাগবাজারের বাজার। আগে বাজারটা কাঞ্চনপুরের জমিদারদের ছিল, এখন অবাঙালী মোদীদের হাতে। ওই বাজারের পেছনেই ছিল রসিক নেওগীর বাড়ি, যিনি ওঁর বাড়ির সামনে ঙ্গার ধারে তৈরি করে দিয়েছিলেন কলকাতার একমাত্র চাঁদোয়া বিশিষ্ট ঘাট, নাম 'রসিক নিয়োগীর ঘাট', লোকমুখে যা অন্নপূর্ণার ঘাট নামে প্রসিদ্ধ, কেননা এর সামনেই ছিল অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির। ওই ঘাটের ওপরেই ছিল নিয়োগীদের বৈঠকখানা, যেখানে গিরিশ, ধর্মদাস, অর্ধেন্দু প্রমুখেরা রিহারসেল দিত যখন তারা গড়ে তুলেছিল এক নাট্যদল। আর ওই নিয়োগী বংশেরই ভুবনমোহন নিয়োগী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কলকাতার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়। আবার ওই নিয়োগী বংশেরই অপর এক বংশাবতংস কৃষ্ণকিশোর নিয়োগীর ছিল এক বিরাট গ্রন্থাগার, যা রাজা রাধাকান্ত দেবের গ্রন্থাগারের চেয়েও ছিল বড় এবং যা নিয়োগী মশাই দান করে দিয়েছিলেন 'ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী'কে (জাতীয় গ্রন্থাগারের পূর্বজ) ওই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সময়। তাঁরই ছেলে হচ্ছেন কবি হরিশচন্দ্র নিয়োগী (যাঁর নামে উল্টাডিঙ্গিতে একটা রাস্তা আছে), ও যাঁর ছেলে এর্টনী সুশীল নিয়োগী তাঁর স্ত্রী প্রমদাসুন্দরীর (নাড়াজোলের রাজকন্যা) নামে আর একটা ঘাট তৈরি করে দিয়েছেন গঙ্গার ধারে, রসিক নিয়োগীর ঘাটের পাশে।

কুমারটুলির কথায় আবার ফিরে আসছি। কুমারটুলিতে এখন কুমোররা বাস করে। কিন্তু কুমোররা যে এক জাতশিল্পী সে বোধ আমাদের ছিল না। সেটা প্রথম উপলব্ধি করেছিলাম যখন একজন কুমোর রাজ-সমাদর পেয়েছিলেন। কুমোর-পাড়ার তখন সবচেয়ে বড় কারিগর, ছিল গোপেশ্বর পাল। তার হাত ও মনের মধ্যে ছিল ভগবানের অসীম করুণা। দু-চার মিনিটের মধ্যে যে কোনো লোকের আবক্ষমূর্তি তিনি তৈরি করেদিতে পারতেন। তাঁর শিল্প শক্তির পরিচয় দেবার জন্য তিনি বিশের দশকের গোড়ায় আহুত হয়েছিলেন লণ্ডনের ব্রিটিশ এম্পায়ার একজিবিশনে। ডেক প্যাসেঞ্জার হয়ে যাচ্ছিলেন বিলাতে। একদিন হঠাৎ জাহাজের ক্যাপটেনের নজরে পড়ল, লোকটা সারাদিন ধরে মাটি নিয়ে কি গড়ে, আর ভাঙে। মুহূর্তের মধ্যে গোপেশ্বর তৈরি করে দিল ক্যাপটেনের মূর্তি। ক্যাপটেন বুঝলেন লোকটা মস্ত বড় শিল্পী। নিজের দায়িত্বে শিল্পীকে নিয়ে গিয়ে স্থান দিলেন সেকেণ্ড ক্লাস কেবিনে। এসব রূপকথার মত শোনায়, কিন্তু সবই সত্য। একজিবিশনে এসেছেন ডিউক অভ কনট। কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গোপেশ্বর তৈরি করে দিল ডিউক অভ কনটের মূর্তি। অবাক হয়ে গেল দর্শকরা। গোপেশ্বর পালের সমকক্ষ না হোক, এ রকম শিল্পী কুমোরটুলিতে বহুকাল ধরেই অবহেলিত।

এ সব কীর্তিমান লোকের কথা মনে পড়িয়ে দেয় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম

ভারতীয় সম্পাদক প্রফুল্ল মুখুজ্যের কথা। বাগবাজারেই তাঁর বাস, আমাদের প্রতিবেশী। প্রায়ই তিনি আমাকে বলতেন, ‘জানো অতুল, বাগবাজারের গণ্ডমূর্খ, আর নদের (নবদ্বীপের)পণ্ডিত, এ দুই-ই সমান।’ ইতিহাস তার সাক্ষ্য। অনেক উদ্ভট জিনিসও এখানে ঘটেছে। মুখুজ্যেপাড়ার দুর্গাচরণ মুখুজ্যের বাড়িতে ‘ছিল পক্ষীদের আড্ডা’। উদ্ভদ শখ ওঁদের। অভিজাত পরিবারের ছেলেরা এক একটা পাখীর বেশ ধারণ করে ওখানে এক একখানা ইটের ওপর বসে গাঁজা খেত। বাগবাজার স্ট্রীট দিয়ে মুখুজ্যে পাড়ায় ঢুকবার মুখেই ছিল জগবন্ধু দত্তের বাড়ি। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কালির ব্যবসা করে বহু পয়সা উপার্জন করেছিলেন। তাঁরই অর্থানুকূল্যে তৈরি হয়েছিল বাগবাজারের বিখ্যাত গৌড়ীয় মঠ। আবার এই বাগবাজার থেকেই উদ্ভুত হয়েছিল নাট্যাভিনয়, প্রথম রঙ্গালয়, প্রতিষ্ঠা ও থিয়েটার কালচার। এই বাগবাজারেই দোকানদারী করতেন ভোলা ময়রা, যিনি কবির গানে পরাহত করতেন সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিয়াল এণ্টনী ফিরিঙ্গীকে। আবার ভোলা ময়রারই নাতজামাই ছিলেন নবীন চন্দ্র দাস, যিনি স্বনামখ্যাত হয়েছেন রসগোল্লা উদ্ভাবন করে। ওই বাগবাজারেই বাস করতেন বিখ্যাত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী, ও বিধায়ক ভট্টাচার্য। এই বাগবাজারের অধিবাসী নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলন ও সম্পাদন করেছিলেন বাংলা ও হিন্দীতে বিখ্যাত ‘বিশ্বকোষ’, যার অসাধারণ গুরুত্বে মুগ্ধ হয়ে স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী, নগেন্দ্রনাথের বাড়ি এসেছিলেন তাঁকে অভিনন্দন জানাবার জন্য। ওই নগেন্দ্রনাথেরই পাশের বাড়িতে থাকতেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতা দীনেশচন্দ্র সেন, যাঁর বাড়িতে দু-তিনবার এসেছেন রবীন্দ্রনাথ ও হামেশা আসতেন নজরুল ইসলাম। আবার একখানা বাড়ি পরেই থাকতেন সেকালের একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক দক্ষিণারঞ্জন ন্যায়রত্ন। এই বাগবাজারেরই অধিবাসী ছিলেন পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটির সভাকবি মহামহোপাধ্যায় পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য। এখানেই বাস করতেন বিখ্যাত পণ্ডিত বংশ—ডক্টর পশুপতিনাথ শাস্ত্রী, অশোক শাস্ত্রী ও গৌরীনাথ শাস্ত্রী। এখানেই বাস করতেন বৈষ্ণব কুল চূড়ামণি রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ। আবার এখানেই বাস করতেন বিখ্যাত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শৈলজারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী রায় ও কালজয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যথা বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, কানাইলাল দত্ত, কিশোরীমোহন ঘোষ, বারীণ ঘোষ, হেমন্তকুমার বসু, নির্মলকুমার বসু ও শচীন মিত্র।

শহরের ভেতর এই বাগবাজার পল্লীর বুকের ওপর দিয়েই যেত রেলগাড়ি, যে রেল-লাইনের সংযোগ ছিল সারা ভারতের রেলপথের সঙ্গে।

কিন্তু বাগবাজারের সবচেয়ে বড় গৌরব যে, এখান থেকেই বেরিয়েছিল প্রথম জাতীয় পত্রিকা—‘অমৃতবাজার পত্রিকা’, তার দুই কর্ণধার শিশির কুমার ঘোষ ও মতিলাল ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন সারা ভারতের জাতীয় নেতারা মায় বাল গঙ্গাধর তিলক, অ্যানি বেসান্ত ও অন্যান্য অনেকে।

বাগবাজারের পাঁচপল্লীর পাঁচালীর শেষ নেই। কেননা, এই বাগবাজারেই স্থাপিত হয়েছিল ভারতের প্রথম পলিটেকনিক ইনষ্টিট্যুট। একদিন এক পাগল সাহেব শহরে এসে হাজির। পাগলামি ছাড়া লোক প্রতিভাবান হয় না। সাহেব বিলাতের রয়েল ইঞ্জিনীয়ার।

সাহেবের নাম ক্যাপটেন গেটাভেল। সাহেব বলল, আমি বিলাতের ঢঙে এখানে প্রবর্তন করব। পলিটেকনিক স্কুল, যেখানে ছেলেদের পুঁথি পড়ানোর সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হবে হাতের কাজ—যেমন লেদের কাজ, ইলেকট্রিকের কাজ, কারপেণ্ট্রির কাজ, বেতের কাজ, বই বাঁধাইয়ের কাজ, দর্জির কাজ ইত্যাদি, সবই বাধ্যতামূলক ভাবে। সাহেবের পরিকল্পনার কথা শুনে মুগ্ধ হলেন কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী। দিলেন চার লক্ষ টাকা। সেই টাকায় স্থাপিত হল কাশিমবাজার পলিটেকনিক স্কুল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হল ওই স্কুলেরই ছেলে যতীন্দ্রনাথ রুদ্র। ওই স্কুলেরই কাজকর্ম দেখে নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর 'তরুণের স্বপ্ন' বইয়ে লিখলেন—'কুটির শিল্প যদি চালাইতে যান, তবে একটা কাজ করা দরকার। একটি উপযুক্ত যুবককে কাশিমবাজার পলিটেকনিক অথবা ওই জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানে কিছু কাজ শিখাইয়া লইতে হবে।' স্কুলটা এক সময় বাগবাজারের গৌরব ছিল। আমি এক সময় ওই স্কুলের সেক্রেটারী ছিলাম। কিন্তু আমি চলে আসবার পর স্কুলের নূতন কর্তৃপক্ষ স্কুলের টেকনিকাল বিভাগটাকে বেচে দিল।

'সমবায় ম্যানসন' তৈরি হবার আগে কলকাতার বৃহত্তম বাড়ি ছিল এই বাগবাজারে নন্দলাল বসু ও পশুপতিনাথ বসুর বাড়ি। বাইশ বিঘা জমির ওপর বাড়ি। উত্তরাধিকার সূত্রে মামা প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের কাছ থেকে ওঁরা গয়ার জমিদারী পান। বার্ষিক আয় আট লক্ষ টাকা। ৬৫ নং বাগবাজার ষ্ট্রীটে একটা খোলা মাঠ ছিল। ওই মাঠেই এক সময় কলকাতার বিখ্যাত গাজন উৎসব, রামধন ঘোষের চড়ক হত। নন্দলাল বসু ও পশুপতিনাথ বসু ওই জমিতেই তাঁদের প্রাসাদোপম বাড়ি করেন। গৃহ প্রবেশ হয় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। বাড়িটার বৈশিষ্ট্য দোতলায় এক বিরাট হলঘর। সদ্য আমেরিকা প্রত্যাগত স্বামী বিবেকানন্দকে প্রথম সংবর্ধনা দেওয়া হয় ওই হলঘরে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় প্রথম স্বদেশী মিটিং হয় ওই হলঘরে। আবার পরবর্তীকালে সরোজিনী নাইডু প্রমুখরা ওখানেই বক্তৃতা করেন। ওই বাড়ির পশুপতি বসুর অংশটা ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে অধিগ্রহণ করেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ওখানে ডে-স্টুডেন্টস্ হোম স্থাপনের জন্য। পরে ওখানেই স্থাপিত হয় বাগবাজার মালটিপারপাস স্কুল।

শেষ করবার আগে বাগবাজারের আরও কয়েকটা প্রতিষ্ঠানের কথা বলব। বাগবাজারেই ছিল স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার কর্মস্থল। মুখুজ্যে পাড়ায় স্বামীজী স্থাপন করেছিলেন 'উদ্বোধন' সংস্থা। সারদা মা কলকাতায় এলে ওখানেই থাকতেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা এখন ওখানে থাকেন। আর বোসপাড়া ছিল ভগিনী নিবেদিতার কর্মকাণ্ডের লীলাক্ষেত্র। পল্লীর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি যে বিদ্যায়তনটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটাই আজও গৌরবে বিরাজ করছে 'নিবেদিতা স্কুল' নামে। সবশেষে বলি, বাগবাজার আজ অনন্যা তার 'গিরিশ মঞ্চের' জন্য।

বিশাল ময়দানটা (১৮১০ বিঘা) ছাড়া, কলকাতায় আছে কমসে কম ২০০টা পার্ক। সেগুলো যে মাত্র বড় রাস্তার ধারেই আছে, তা নয়। গলিঘুঁজির ভেতরও। তাছাড়া, কলকাতায় মেয়েদেরও দুটো পার্ক আছে। একটা উত্তরে, আর একটা দক্ষিণে।

কলকাতা শহর গড়ে উঠেছিল এলোমেলোভাবে। প্রথম দিকে ছিল তার অবিন্যস্ত রূপ। বড় রাস্তার ধারে এক সারি বাড়ির পেছনে তৈরি হয়েছিল আর এক সারি বাড়ি। দু সারি বাড়ির মাঝখানে সৃষ্ট হয়েছিল এক একটা করে সুর গলি। এরকমভাবে সারির পর সারি তৈরি হয়েছিল বাড়ি, আর সেগুলোর সঙ্গে গজিয়ে উঠেছিল অসংখ্য গলিঘুঁজি।

গলিঘুঁজির বাড়িগুলো সব ছিল অসূর্যম্পশ্যা। সেখানে সূর্যের আলো ও বাতাস ক্বচিৎ কদাচিৎ ঢুকত। ইংরেজ শাসকরা এটা লক্ষ্য করেছিল। চিন্তা করেছিল, এ-সব বাড়ির বাসিন্দাদের শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের জন্য চাই ফুসফুস। তাই তারা তৈরি করেছিল পার্কগুলো। এ-গুলোই হচ্ছে কলকাতার ফুসফুস।

কলকাতার পার্কগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্ক হচ্ছে ইডেন গার্ডেন। এর আয়তন হচ্ছে ১৩৩ বিঘা। বাকিগুলো অনেক কম মাপের। পার্ক সার্কাসের মাঠের আয়তন হচ্ছে ৬৫ বিঘা, দেশবন্ধু পার্কের ৪৫ বিঘা, আর্মড পুলিশ ফুটবল গ্রাউণ্ডের ৫০ বিঘা, যতীন্দ্রমোহন পার্কের ২০ বিঘা। জিমখানা পার্ক ও দেশপ্রিয় পার্কের আয়তনও তাই। উডবার্ন পার্কের আয়তন হচ্ছে ১৮ বিঘা, মার্কাস স্কোয়ারের ১১ বিঘা, রবীন্দ্র কাননের ১০ বিঘা। ওয়াটগঞ্জ পার্কেরও দশ বিঘা। আর রডন স্কোয়ারের ৯ বিঘা ১৭ কাঠা। কলকাতার বাকি পার্কগুলো সবই -এর চেয়ে কম মাপের।

সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পার্ক আছে করপোরেশনের তিন নম্বর, ডিস্ট্রিকটে, ৫৭টা। তারপর চার নম্বর ডিস্ট্রিকটে ৪১টা, এক নম্বর ডিস্ট্রিকটে ৩৭ টা দু'নম্বরে ২৯টা, আর কাশীপুরে ১২টা।

ইংরেজ চেয়েছিল কলকাতার ঘিঞ্জি অঞ্চলের বাসিন্দারা এই সব পার্কে এসে সকাল-বিকেলে হাওয়া খাবে। ইংরেজ আমলে ছেলে-বুড়ো সকলে করতও তাই। কিন্তু এখন সবই পাল্টে গেছে। লোকের দৈনন্দিন জীবন এমন উৎকটভাবে সমস্যাবহুল হয়ে উঠেছে যে লোক নিজ বাড়িতেই হাঁপ ছাড়বার সময়পায় না, পার্কে গিয়ে হাওয়া খাওয়া তো দূরের কথা! তা-হলেও ছুটিছাটার দিনে লোক পার্কে গিয়ে আরাম পায়।

তবু আজকাল অনেক পার্কে হাওয়া খাবার উপায় নেই। অবহেলা ও পৌরসভার কুকর্মের জন্য বড় বড় পার্কগুলোতে হাওয়া আর ঢুকতে পায় না। পার্কের রেলিংয়ে দোকান ঘর বসিয়ে সেগুলোতে হাওয়া ঢোকবার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গোলদীঘি ও দেশপ্রিয় পার্ক তার দৃষ্টান্ত। আরেক রকমভাবেও পৌরসভা পার্কগুলোতে হাওয়া ঢোকা বন্ধ করে দিয়েছে। ইংরেজ আমলে বিলাতি লোহা দিয়ে তৈরি রেলিংগুলো অপসারণ করে, তার জায়গায় পাঁচিল গেঁথে দেওয়া হয়েছে। সে রেলিংগুলো গেল কোথায়? কেউ জানে না। আজাদ হিন্দ বাগ বা হেদুয়া তার এক দৃষ্টান্ত।

ইংরেজরা আরও চেয়েছিল যে বড় রাস্তার ধারের পার্কগুলো রাস্তার শোভাবর্ধন করবে। কিন্তু ইটের পাঁচিল গেঁথে ও দোকানঘর বসিয়ে শহরের সে শোভা নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, হেদুয়া, গোলদীঘি ও অনুরূপ পার্কের পুকুরের হাওয়া আশপাশের বাড়িগুলোতে ঠাণ্ডা হাওয়া দিত, তা-ও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। হয়তো বাবুরা বলবেন যে রেলিং চুরি-যাবার ভয়ে তাঁরা এ-রকম করেছেন। কিন্তু এ-রকম যুক্তি বাবুদের গৌরব বর্ধন করে না, বাবুদের প্রশাসনিক অক্ষমতারই পরিচয় দেয়। কেননা, ইংরেজ আমলে তো এরকম চুরি হত না।

অনেক পার্কের মাঝে পুষ্করিণী পার্কের শোভা বর্ধন করত। কিন্তু আজ সেসব পুষ্করিণীতে পানা পড়ছে। অন্ততঃ রডন স্কোয়ার সম্বন্ধে আমরা সেই কথাই শুনছি। এর জন্য দায়ী কে? পানা, না বাবুদের অকর্মণ্যতা? ইংরেজ আমলে এরূপ ঘটলে যাদের হাতে পুষ্করিণী পরিষ্করণ ও সংরক্ষণের ভার ন্যস্ত থাকত, তাদের পিঠে ঘোড়ার চাবুক মেরে তাদের সক্রিয় করে তুলতো।

পার্কগুলোর পুষ্করিণীতে পানা পড়ছে। তার জন্য সেখানে ব্যবসায়িক সংস্থা বা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে, এটা মেয়েলি যুক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। কোন বিবেকবান পুরুষের উক্তি নয়। রডন স্কোয়ার ব্যবসায়িক সংস্থা হবে কি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হবে, সেটা আসল সমস্যা নয়। আসল সমস্যা হচ্ছে, ইংরেজ আমলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে পার্কগুলো সৃষ্ট হয়েছিল, সে উদ্দেশ্য কতটা সিদ্ধ হচ্ছে, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করারা জন্য পার্কগুলোর যথাযথ সংস্কার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে সেগুলোকে তাদের বর্তমান দুরবস্থা থেকে উদ্ধার করা। পানা পড়ছে বলে পার্কের পুষ্করিণীগুলোকে বুজিয়ে দিতে হবে, এর চেয়ে বড় মূঢ়তা আর কিছু হতে পারে না। যে শহরে জলের অভাবে দমকলবাহিনী যথাসময়ে আগুন নেভাতে পারে না সে শহরের জলাশয়গুলো বুজিয়ে দেবার মত গর্হিত অপরাধ আর কিছু হতে পারে না। বরং আগুন নেভাবার জন্য যেসব পার্কে জমি আছে সেখানে নতুন পুকুর কাটানো বা যেখানে জমি নেই সেখানে মাটির তলায় জলাশয় বা রিজারভয়ার নির্মাণ করাই আশু প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

## আগুন বোমা ও মন্বন্তর

১৯৪২-৪৩ সালটা কলকাতার পক্ষে এক দুর্দৈবের বৎসর ছিল। ওই বৎসর প্রথম ঘটেছিল এক মর্মন্তুদ অগ্নিকাণ্ড। কলকাতার ইতিহাসে এরকম নিদারুণ ও শোকাবহ অগ্নিকাণ্ড শহরে আগে আর কখনও ঘটেনি, পরেও না। ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৪২ সালের ৮ নভেম্বর রবিবার তারিখে। ৫-এ হালসীবাগান রোডে অবস্থিত 'আনন্দ আশ্রম' প্রাঙ্গণে কালীপূজা উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী এক আমোদ প্রমোদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। হোগলা দিয়ে এক প্যাণ্ডেল তৈরি করা হয়েছিল। ঘটনার দিন প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবিদ বিষ্ণু ঘোষ তার দলবল নিয়ে ব্যায়ামকৌশল দেখাচ্ছিল। বিষ্ণু ও ওর দলের তখন শহরে

খুব জনপ্রিয়তা। সেজন্য এক হাজারের ওপর মেয়ে, পুরুষ ও শিশু ওখানে জড়ো হয়েছিল। বেলা তখন পৌনে চারটা হবে। বিষ্ণুর দল বেশ সুশৃ লভাবেই তাদের ব্যায়াম কৌশল দেখাচ্ছিল। সকলে মুগ্ধনয়নে দেখছিল বিষ্ণুর তেরো বছরের ছেলে কেষ্টর ব্যায়ামকৌশল। এমন সময় মণ্ডপের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে লোক চিৎকার করে উঠল 'আগুন, আগুন'। মণ্ডপের দক্ষিণ দিকটা জ্বলে উঠল। লেলিহান অগ্নিশিখা ক্রমশ অগ্রসর হতে লাগল। ভেতরের সব লোকই গেটের দিকে ছুটে আসতে লাগল। ওইটাই একমাত্র বেরুবার পথ বলে ওখানে জমাট ভিড়। পুরুষরা অধিকাংশই পাঁচিল টপকিয়ে বেরিয়ে এল। পিছনে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে আটক হয়ে পড়ল মেয়ে ও শিশুরা। ১৯৯ জনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল। আহতদের মধ্যে ৩৯ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হল। তাদের মধ্যেও ১৪ জন হাসপাতালে মারা গেল। বিষ্ণুর ছেলে কেষ্টও এই অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে প্রাণ হারাল। সমস্ত শহরে বয়ে গেল শোকের স্রোত। কর্তৃপক্ষের টনক নড়ল। কর্তৃপক্ষ আইন জারি করল যে এর পর আর কেউ হোগলার মণ্ডপ তৈরি করতে পারবে না। সেই থেকেই কলকাতায় হোগলার মণ্ডপ তৈরি করা বন্ধ হয়ে গেল।

ওই ১৯৪২ সালের ২০ ডিসেম্বর তারিখে জাপানী বিমান প্রথম কলকাতায় হানা দিল। চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত শান্ত রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে যখন উচ্চনিনাদে সাইরেন বেজে উঠল, তখন শহরের অনেকেই নিদ্রামগ্ন ছিলেন এবং অনেকে শয্যাগ্রহণ করবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। সাইরেন বাজবার কিছুক্ষণ পরেই শোনা গেল জাপানী বিমানের গুড়গুড় শব্দ। এ মিত্রপক্ষীয় বিমানের পরিচিত শব্দ নয়। এ শব্দটার মধ্যে পূর্বে অপরিচিতির একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। তখন থেকেই কলকাতাবাসী জাপানী বিমানের শব্দের সঙ্গে পরিচিত হল। প্রথম দিন যখন বিমান অক্রমণ হল, তখন সিনেমা-হলগুলিতে রাত্রের শেষ চিত্র প্রদর্শন চলছে। সাইরেন বাজামাত্রই চিত্র-প্রদর্শন বন্ধ হয়ে গেল এবং দর্শকরা লবীতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করল। রাস্তায় তখনও যে-সব ট্রাম চলছিল, সেগুলো সঙ্গে সঙ্গেই থেমে গেল এবং যাত্রীরা অন্যান্য পথচারীদের সঙ্গে কাছাকাছি বাড়িতে আশ্রয় নিল। বিমানগুলো প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে কলকাতার ওপরে ঘুরতে লাগল। কলকাতায় ও উপকণ্ঠে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটা বোমা ফেলল। আক্রমণকারী বিমানগুলোকে বাধা দেবার জন্য ব্রিটিশ পক্ষের জঙ্গী বিমানগুলো আকাশে টহল দিল বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন আকাশ যুদ্ধ হল না। তারপর আক্রমণকারী বিমানগুলো চলে গেল। প্রথম দিনের বিমান আক্রমণে জনসাধারণের মনোবল অটুট রইল, এবং পরদিন স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম চলল।

কিন্তু তারপর বিমান-আক্রমণ তীব্র আকার ধারণ করল। কলকাতা শহরে ও উপকণ্ঠে বোমা পড়তে লাগল। যেদিন উত্তর কলকাতার হাতিবাগানে বোমা পড়ল, সেদিন মনে হল যেন আমাদের বাগবাজারের বাড়ির দেওয়ালের পাশে বোমা পড়ছে। বোমার আওয়াজে আমাদের কানের পর্দা ফেটে যাবার উপক্রম হল, যদিও প্রতিরোধক হিসাবে কানে তুলার ছিপি আঁটা ছিল।

এরপর লোকের মনোবল ভেঙে পড়ল। লক্ষ লক্ষ লোক কাতারে কাতারে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক

রোড দিয়ে, কোন যানবাহনের অভাবে, পায়ে হেঁটে বাঙলার বাইরে যেতে শুরু করল। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে এত ভিড় যে তিলার্ধ জায়গা রইল না! সকলেই চলেছে উত্তর মুখে। যাবার সময় অনেকে গরু-মোষ ইত্যাদি এক টাকা-দুটাকা দামে বা বিনামূল্যে অপরকে দিয়ে গেল।

তারপর ১৯৪৩ সালে এল এক মন্বন্তর। কলকাতার রাজপথে দেখলাম এক নিদারুণ দৃশ্য। রাজপথ মৃত ও মৃতকল্প লোকে ভরে গেল। গ্রামের হাজার হাজর নিঃস্ব ও বুভুক্ষু নরনারী সামান্য অন্নের প্রত্যাশায় ছুটে এল রাজধানীতে। কিন্তু রাজধানীতে খাদ্য কোথায়? চাউল দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় রাজধানীর লোকই অর্ধ-অনশনে দিন কাটাচ্ছিল। ফলে যারা অন্নের প্রত্যাশায় রাজধানীতে ছুটে এসেছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই না খেতে পেয়ে রাজধানীর ফুটপাথের ওপরই তাদের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। এই মন্বন্তরে কয়েক লক্ষ লোক মারা গেল। এই মন্বন্তর সম্বন্ধে মাইকেল এডওয়ার্ডস্ তাঁর 'দি লাস্ট ইয়ারস্ অব্ ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া' বইয়ে লিখেছেন—It was authoritatively remarked that Suhrawardy had made a handsome profit out of the sufferings of his fellow countrymen.'

## কলকাতায় প্রথম ব্রহ্মহত্যা

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ আগস্ট। কলকাতার ইতিহাসে একটা স্মরণীয় দিন। ওই দিন ইংরেজগণ কর্তৃক কলকাতায় প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল ব্রহ্মহত্যা। হিন্দুর দৃষ্টিতে ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ। পাছে ব্রহ্মহত্যার পাপ তাদের স্পর্শ করে, সেজন্য ৫ আগস্ট তারিখের প্রত্যুষেই কলকাতার লোকেরা শহর ছেড়ে গঙ্গার অপর পারে চলে গিয়েছিল।

যাকে নিয়ে এই ব্রহ্মহত্যা ঘটেছিল, তিনি হচ্ছেন মহারাজা নন্দকুমার রায়। সকলেরই জানা আছে যে ওয়ারেন হেষ্টিংস ষড়যন্ত্র করে মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে ব্যাপারটা বিশদভাবে অনেকেরই জানা নেই। সেটাই এখানে বলছি।

নন্দকুমারের পৈতৃক বাসস্থান ছিল বীরভূম জেলার ভদ্রপুর গ্রামে। পিতার নাম পদ্মনাভ রায়। তিনি ছিলেন মুরশিদকুলী খাঁর আমিন। নন্দকুমার ফারসী, সংস্কৃত, বাংলা ও পিতার কাছে রাজস্ব-সংক্রান্ত কাজ শিখে আলিবর্দী খাঁর আমলে প্রথমে হিজলি ও মহিষাদল পরগনার রাজস্ব আদায়ের আমিন ও পরে হুগলির ফৌজদারের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। পলাশী যুদ্ধের পর নন্দকুমার নানা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। এই সময় বর্ধমানের খাজনা আদায়ের কর্তৃত্ব নিয়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর সঙ্গে তাঁর বিরোধের সূত্রপাত হয়। হেষ্টিংস তখন কোম্পানির রেসিডেণ্ট ছিলেন।

উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়ে পরে নন্দকুমার কলকাতায় আসেন। কলকাতায় তিনি একজন খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়ে দাঁড়ান। তিনি প্রতিভাশালী ব্যক্তিও ছিলেন। তাঁর নানা রকম গুণে মুগ্ধ হয়ে বাদশাহ শাহ আলম তাঁকে 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

দেশের লোককে রেজা খাঁর অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য দেশের লোকেরও তিনি প্রিয় হয়েছিলেন। তিনি কোনরূপ অত্যাচার সহ্য করতে পারতেন না, এবং সব সময় অত্যাচারিতের পক্ষ নিয়ে দণ্ডধারণ করতেন। তাছাড়া, বিডন স্কোয়ারের নিকট তাঁর বাড়ির দ্বার সব সময়েই দরিদ্র দেশবাসীর জন্য উন্মুক্ত থাকত। প্রত্যহ এক বিরাট জনতা তাঁর বাড়িতে ভোজন করত।

এহেন নন্দকুমারের মত ব্যক্তির বিচার পৃথিবীর নবম আশ্চর্যরূপে পরিগণিত হয়েছিল। হেস্টিংস ও তাঁর কাউনসিলের সঙ্গে নন্দকুমারের বনিবনা ছিল না। তিনি হেষ্টিংস-এর রোহিলা যুদ্ধ ও ফৈজাবাদের সন্ধির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। হেষ্টিংস-এর সঙ্গে তাঁর বিরোধ চরমে ওঠে যখন ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের রানী অভিযোগ করেন যে হেষ্টিংস তাঁর কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছেন। ওই ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দেই নন্দকুমার অভিযোগ করেন যে, হেষ্টিংস মুন্নি বেগমের কাছ থেকে ৩,৫৪,১০৫ টাকা ঘুষ নিয়ে তাঁকে নাবালক নবাবের অভিভাবক নিযুক্ত করেছেন। হেস্টিংস প্রত্যভিযোগ আনলেন যে, নন্দকুমার কামালউদ্দিন নামে (কামালউদ্দিন হেস্টিংস-এরই আশ্রিত লোক) এক ব্যক্তিকে প্ররোচিত করেছেন হেস্টিংস-এর বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ আনবার জন্য। নন্দকুমার এ মামলায় সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত হন। তখন হেস্টিংস কামালউদ্দিন ও মোহনপ্রসাদ নামক আর এক ব্যক্তি দ্বারা নন্দকুমারের বিরুদ্ধে এক জালিয়াতির মামলা আনেন। এই মামলাতেই নন্দকুমারের ফাঁসি হয়।

মামলার বিষয়বস্তু ছিল একগাছা মোতির মালা ও কয়েকটি অলঙ্কার। ১৭৬৫ বঙ্গাব্দের (ইংরেজি ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের) আষাঢ় মাসে মহারাজা নন্দকুমার এই মোতির হার ও অলংকারগুলি মুরশিদাবাদে বলাকীদাস দামে এক ব্যক্তির কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন বিক্রয়ের জন্য। মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধের সময় মুরশিদাবাদে যে বিশৃ ল অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল, সে সময় বলাকীদাসের বাড়ি থেকে এগুলি লুণ্ঠিত হয়। ১৭৭২ বঙ্গাব্দে (১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) বলাকীদাস যখন কলকাতায় আসেন, নন্দকুমার তখন এগুলি তাঁর কাছ থেকে ফেরত চান। বলাকীদাস এগুলি ফেরত দিতে অসমর্থ হয়ে, নন্দকুমারের আনুকূল্যে একখানা দলিল তৈরি করে দেন। বলাকীদাস ওই দলিলে লিখে দেন যে, কোম্পানির ঢাকায় অবস্থিত খাজাঞ্চিখানায় তাঁর রোক টাকা আছে, তা ফেরত পেলে তিনি নন্দকুমারের ওই মোতির হার প্রভৃতির মূল্য বাবদ ৪৮,০২১ সিক্কা টাকা মূল্য হিসাবে এবং তার ওপর টাকায় চার আনা হিসাবে অতিরিক্ত ব্যাজ দেবেন। এই দলিল সম্পাদনের চার বছর পরে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে বলাকীদাসের মৃত্যু ঘটে। বলাকীদাস তাঁর মৃত্যুশয্যায় নন্দকুমারকে ডেকে বলেন ঃ 'আমি আমার স্ত্রী ও কন্যার ভার আপনার ওপর সমর্পণ করে যাচ্ছি। আমি আশা করি এতদিন আপনি আমার প্রতি যেরূপ আচরণ করেছেন, আমার স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গেও সেরূপ আচরণ করবেন।' এর কিছুদিন পরে যখন বলাকীদাসের বিষয়সম্পত্তি ও দেনাপাওনার নিষ্পত্তি হয়, তখন নিষ্পত্তিকারীরা নন্দকুমারের প্রাপ্য টাকাও তাঁকে দিয়ে দেন। তখন বলাকীদাসের উক্ত দলিল বাতিল করা অবস্থায় কলকাতার মেয়র আদালতের ফেজখানায় জমা পড়ে এবং সেখানা সেখানেই থেকে যায়।

হেস্টিংস নন্দকুমারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য, মেয়র আদালতের ফেজখানা থেকে ওই দলিলটা উদ্ধার করেন এবং ওরই ভিত্তিতে এক মামলা রুজু ক'রে বলেন যে দলিলখানা জাল।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ মে তারিখে কলকাতাবাসীরা স্তম্ভিত হয়ে গেল যখন তারা শুনল যে নন্দকুমারের ন্যায় ব্যক্তির বিরুদ্ধে জালিয়াতির মামলা আনা হয়েছে, এবং তাঁকে সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে রাখার জন্য নির্দিষ্ট জেলখানায় রাখা হয়েছে। সরকারের কাছে আরজি পেশ করা হল যে, নন্দকুমারের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে সাধারণ জেলখানায় রাখলে তাঁর ধর্ম নষ্ট হবে। কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। হেস্টিংস-এর প্ররোচনায় বিচারকরা সকলে একমত হয়ে রায় দিলেন যে 'শেরিফ যেন নন্দকুমারকে সাধারণ জেলখানাতেই রাখে।'

৮মে তারিখে নন্দকুমার প্রধান বিচারপতির কাছে এক আবেদন পত্রে বলেন যে, 'তাঁকে যদি সাধারণ জেলখানায় রাখা হয়, তা হলে তাঁকে জাতিচ্যুত হবার আশঙ্কায় আহার-স্নান প্রভৃতি পরিহার করতে হবে। সেজন্য তাঁকে এমন কোন বাড়িতে বন্দী করে রাখা হোক যা কোনদিন খ্রীশ্চান বা মুসলমান কর্তৃক কলুষিত হয়নি, এবং তাঁকে প্রতিদিন একবার করে গঙ্গায় স্নান করতে যেতে দেওয়া হোক'। কিন্তু বিচারকরা আবার একবাক্যে বললেন—'কয়েদীর এরকম আবদার কখনই মেনে নেওয়া যেতে পারে না।'

নন্দকুমার গোড়া থেকেই জেলখানায় আহার ত্যাগ করেছিলেন। সেজন্য ১০মে তারিখে প্রধান বিচারপতি ইমপে (হেস্টিংস-এর প্রাণের বন্ধু) নন্দকুমারের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবার জন্য একজন চিকিৎসককে পাঠিয়ে দেন। চিকিৎসক মন্তব্য করলেন, 'অনশন হেতু নন্দকুমারের এরূপ শারীরিক অবনতি ঘটেছে যে, পরদিন প্রাতের পূর্বেই নন্দকুমারকে খাওয়ানো দরকার।' সেজন্য বিচারকরা অনুমতি দিলেন যে প্রতিদিন প্রাতে একবার করে তাঁকে যেন জেলখানার বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু নন্দকুমার সে অনুমতি প্রত্যাখ্যান করেন। সেজন্য জেলখানার প্রাঙ্গণে একটা তাঁবু খাটিয়ে সেখানে নন্দকুমারের অবস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। নন্দকুমার সেখানে মিষ্টান্ন ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করতেন না।

বর্তমান রাইটার্স বিলডিং-এর পূব দিকে এখন যেখানে সেন্ট এণ্ড্রুজ গির্জা অবস্থিত, সেখানেই তখন সুপ্রিম কোর্ট ছিল। এখানেই ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ জুন তারিখে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে আনীত মামলার বিচার শুরু হয়। যে বিচারকমণ্ডলী নন্দকুমারের বিচার করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইমপে, হাইড্ চ্যাম্বারস্ ও লেমেস্টার। সরকারী পক্ষের উকিল ছিলেন ডারহাম, আর নন্দকুমারের পক্ষে ফারার। এই মামলায় দশজন ইওরোপীয় ও দুজন ইওরেশিয়ান জুরি নিযুক্ত হয়। দোভাষী ছিলেন হেস্টিংস ও ইমপে-র বন্ধু আলেকজাণ্ডার ইলিয়ট। তাঁর নাম প্রস্তাবিত হওয়া মাত্রই, ফারার আপত্তি তুলে বলেন যে, তাঁর মক্কেল একে তার শত্রুপক্ষের লোক বলে মনে করেন। কিন্তু ফারারের এ আপত্তি নাকচ হয়ে যায়। তারপর ফারার বলেন যে, তাঁর মক্কেলকে কাঠগড়ায় না পুরে যেন তাঁব উকিলের কাছে বসতে দেওয়া হয়। কিন্তু আদালত ফারারের এসব আবেদনও নাকচ করে দেয়।

তারপর আইনের লড়াই চলে। বিচারক চ্যাম্বারস্ মত প্রকাশ করেন যে বিলাতের আইন কলকাতায় চলতে পারে না। সুতরাং এ মামলা বিচার করার ক্ষমতা আদালতের এলাকার বাইরে। কিন্তু প্রধান বিচারপতি ইমপে ও অন্য বিচারকরা এর বিপরীত মত প্রকাশ করেন। সুতরাং মামলা চলতে থাকে।

নন্দকুমারকে তখন সওয়াল করতে বলা হয়। নন্দকুমার আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেকে 'নির্দোষ' বলে ঘোষণা করেন। তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করা হয়, 'কার দ্বারা আপনার বিচার হওয়া উচিত মনে করেন?' নন্দকুমার উত্তর দেন—'ঈশ্বর ও তাঁর সমতুল্য ব্যক্তি দ্বারা।' বিচারকরা নন্দকুমারকে জিজ্ঞাসা করেন—'কাকে আপনি সমতুল্য মনে করেন?' ফারার উত্তরে বলেন—'এটা তিনি আদালতের বিবেকের ওপর ছেড়ে দিতে চান!'

সমস্ত বিচারটাই হল একটা প্রহসন মাত্র। মীর আসাদ আলি, শেখ ইয়ার মহম্মদ ও কৃষ্ণজীবন দাস প্রভৃতি অনেকে নন্দকুমারের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন যে, তাঁরা স্বচক্ষে বলাকীদাসের ওই দলিল সম্পাদিত হতে দেখেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৮জুন তারিখে আদালত জুরিদের প্রতি তাঁদের অভিমত প্রকাশ করতে বলে। তাঁরা সকলেই একবাক্যে বললেন—নন্দকুমার দোষী, এবং তাঁর প্রতি কোনরূপ দয়া প্রদর্শন করবার সুপারিশ আমরা করতে পারি না।' আদালত নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেয়। (তখনকার বিলাতী আইন অনুযায়ী জালিয়াতি অপরাধে প্রাণদণ্ড হত)। শুধু তাই নয়। নন্দকুমারের সমর্থনে যারা সাক্ষী দিয়েছিল, তাদের অভিযুক্ত করবারও আদেশ দেয়।

কলকাতাবাসীর পক্ষ থেকে নন্দকুমারকে বাঁচাবার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল। কেননা, বিলাতে রাজার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার আবেদনে জুরিদের অনুমোদন থাকা চাই। জুরিরা সে অনুমোদন দিলেন না।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ আগস্ট তারিখে খিদিরপুরের কাছে কুলিবাজারের ফাঁসি মঞ্চে নন্দকুমারকে তোলা হল। অত্যন্ত প্রশান্ত মুখে ইষ্টদেবতার নাম করতে করতে নন্দকুমার ফাঁসিমঞ্চে উঠলেন। ইংরেজ-বিচারের যূপকাষ্ঠে বলি হলেন বাঙলার একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। সব শেষ হয়ে গেলে গঙ্গার অপর পারে সমবেত হিন্দু নরনারী 'বাপরে বাপ' বলে চীৎকার করে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের পাপ ক্ষালনের জন্য।

## রামমোহনের বাড়ী নিলামে

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রাজা রামমোহন রায় বিলাত যাত্রা করেন। তাঁর বিলাত যাত্রার ঠিক এগারো মাস পূর্বে, তাঁর মানিকতলার বসতবাটি ও বাগান নিলাম দ্বারা বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছিল ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জানুয়ারী তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায়। বিজ্ঞাপনটায় কি লেখা ছিল, তা পাঠকদের অবগতির জন্য আমি বিজ্ঞাপনটার হুবহু অনুলিপি নিচে দিচ্ছি।

ইশতেহার

স্থাবর ধন পাবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে বিক্রয় হইবেক।

সন ১৮৩০ সালে আগামী ২১ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার টালা কোম্পানির সাহেবরা তাহাদের নীলাম ঘরে নিচের লিখিত স্থাবর ধন পাবলিক অক্সেন অর্থাৎ নীলাম করিবেন বিশেষতঃ আপার সার্কুলার রোড শিমলার মানিকতলাস্থিত বাটী ও বাগান যাহাতে এক্ষণে বাবু রামমোহন রায় বাস করেন। ঐ বাটির উপরে তিন বড় হাল অর্থাৎ দালান, ছয় কামরা, দুই বারান্দা ও নীচের তলায় অনেক কুটরী আছে এবং ঐ বাটীর অন্তপাতি গুদাম ও বাবুর্চিখানা ও আস্তাবল প্রভৃতি আছে।

এবং ১৫ বিঘা জমির এক বাগানে অতি উত্তম সমভূমি ও পাকা রাস্তা ও তাহাতে নানাবিধ ফলের গাছ ও তিনটা বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। ঐ বাগানে কলিকাতার সীমার মধ্যস্থ গবর্নমেণ্ট হৌস হইতে গাড়ীতে বিশ মিনিটে পহুঁছান যায়।

ঐ বাটি ও ভূমির চতুঃসীমা এই, বিশেষত উত্তরদিকে গদাধর মিত্রের বাগান, দক্ষিণ দিকে সুকেশের ষ্ট্রীট নামে রাস্তা, পূর্বদিকে সার্কুলার রোড নামে সড়ক এবং পশ্চিমে ও উত্তর পশ্চিমে রূপনারায়ণ মল্লিকের বাগান।

ঐ বাটি ও বাগান যিনি দেখিতে চাহেন তাঁহার দেখিবার কিছু বাধা নাই।

এই বিজ্ঞাপনটায় প্রযুক্ত ভাষা সম্বন্ধে কিছু টীকার প্রয়োজন আছে। সেজন্য টীকাগুলি আমি এখানে সন্নিবিষ্ট করছি। বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত 'টালা কোম্পানি' হচ্ছে সেকালের কলকাতার সবচেয়ে বড় নিলামদার সংস্থা 'টুলো অ্যাণ্ড কোম্পানি', 'হাল' হচ্ছে 'হলঘর' ও 'সুকেশের ষ্ট্রীট' হচ্ছে 'সুকিয়া ষ্ট্রীট' (সুকিয়া ষ্ট্রীট বর্তমান শতাব্দীর বিশের দর্শকের শেষ পর্যন্ত কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হতে সারকুলার রোড পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল)। বিজ্ঞাপনের শেষাংশ বিশেষ লক্ষণীয়, কেননা এই অংশ ইঙ্গিত করে যে রামমোহনের ইচ্ছানুসারেই এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল।

উদ্ধৃত বিজ্ঞাপন থেকে যে তথ্যগুলি আমরা সংগ্রহ করতে পারি তা হচ্ছে—

(১) রামমোহনের বাটি ও বাগান শিমলা মানিকতলায় আপার সারকুলার রোডে অবস্থিত ছিল।

(২) বিজ্ঞাপন প্রকাশের সময় রামমোহন ওই বাড়িতেই বাস করতেন।

(৩) বাড়িটি দ্বিতল ছিল, এবং এর ওপর তলায় তিনটি বড় হল, ছয়টি কামরা ও দুটি বারান্দা ছিল। বাটির নীচের তলায় অনেকগুলি 'কুটুরি' ছিল, কিন্তু কোনো হল ছিল এরূপ কোনো উল্লেখ নেই।

(৪) ওই বাটির অন্তঃপাতী আরও ছিল গুদাম, বাবুর্চিখানা ও আস্তাবল প্রভৃতি।

(৫) উক্ত বাটি ছাড়া, আরও ছিল ১৫ বিঘা জমির ওপর একটি বাগান যার মধ্যে অতি উত্তম সমভূমি ও একটি পাকা রাস্তা, নানাবিধ ফলের গাছ ও তিনটা বৃহৎ পুষ্করিণী। এখানে 'এবং' ও 'ও' শব্দের ব্যবহার কি এই ইঙ্গিত করে না যে, বাড়িখানা হতে বাগানটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল? 'পাকা রাস্তার' উল্লেখ দেখে মনে হয় যে যখন বাড়ি ও বাগান একত্র ছিল, তখন ওই পাকা রাস্তা দিয়েই তাঁর বাড়িতে পৌঁছাতে হত।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে রামমোহন তাঁর বসতবাটি ও বাগান নিলামে তুলেছিলেন কেন? সমসাময়িক সংবাদপত্র বা অন্য কোনো সূত্র থেকে আমরা এর কোনো হদিশ পাই না। অনুরূপভাবে সমসাময়িক সংবাদপত্রসমূহ ওই নিলামের ফলাফল সম্বন্ধে কোনো আলোকপাত করে না। রামমোহন তৎকালীন কলকাতার একজন অতি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কলকাতায় তাঁর একাধিক বাড়ি ছিল। একখানা বাড়ি চৌরঙ্গীতেও ছিল। সুতরাং আর্থিক কৃচ্ছ্রতার জন্য তিনি তাঁর মানিকতলার বাড়ি ও বাগান নিলামে তোলেন নি।

তবে কারণটা কি?

মনে হয় সদ্য আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট নির্মাণের ফলে তাঁর বসতবাটি হতে, বাগানটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় তিনি মর্মাহত হয়েই বাড়িখানা নিলামে তুলতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

নীলামের কারণ ও ফলাফল জানা না থাকলেও উদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটার একটা অন্য মূল্য আছে। সকলেরই জানা আছে যে, রামমোহনের বসতবাড়ি সম্বন্ধে একটা বিতর্ক আছে। আমার মনে হয় এই বিজ্ঞাপনে প্রদত্ত রামমোহনের বাড়ির বিশদ বিবরণ, সেই বিতর্কের নিষ্পত্তিতে সাহায্য করবে। ওই বর্ণনার সঙ্গে যে বাড়ির মিল আছে, সেটাই যে রামমোহনের প্রকৃত বসতবাটি, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

ওই বাড়ি সম্বন্ধে ' রামকৃষ্ণ কথামৃত'-এর তৃতীয় ভাগ প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ বিশেষ আলোকপাত করে। ' ম' লিখেছেন—'৫ই আগস্ট ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে। গাড়ী দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী হইতে ছাড়িয়াছে। পোল পার হইয়া শ্যামবাজার হইয়া ক্রমে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে আসিয়াছে। ভক্তেরা বলিতেছেন, এইবার বাদুড়বাগানের কাছে আসিয়াছে। ঠাকুর বালকের ন্যায় আনন্দে গল্প করিতে করিতে আসিতেছেন। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে আসিয়া হঠাৎ তাঁহার ভাবান্তর হইল ঃ যেন ঈশ্বরাবেশ হইবার উপক্রম। গাড়ী রামমোহন রায়ের বাগান বাটীর কাছ দিয়া আসিতেছে। মাষ্টার ঠাকুরের ভাবান্তর দেখেন নাই; তাড়াতাড়ি বলিতেছেন, এইটী রামমোহন রায়ের বাটী। ঠাকুর বিরক্ত হইলেন; বলিলেন, এখন ও সব কথা ভাল লাগছে না। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন।' সুতরাং ম রামমোহন রায়ের বাড়িখানা সম্বন্ধে নৈকট্যসূচক 'এইটী' শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। বাড়িটা তিনি যে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ওপরই দেখেছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সেটাই তৎকালীন কলকাতা শহরের জনশ্রুতির প্রতিধ্বনি।

## কলকাতার হুজুগ ও হল্লা

এক সময় মশা-মাছির উপদ্রবে উত্ত্যক্ত হয়ে ঈশ্বর গুপ্ত বলেছিলেন এই নিয়েই সুখে আছি কলকাতায়। আজ পরিস্থিতিটা পাল্টে গিয়েছে। মশা-মাছি তো আছেই কিন্তু তারা আজ পরাস্ত হয়েছে কলকাতার হুজুগ হামলা ও হল্লার কাছে। হুজুগ হামলা হল্লা আজ কলকাতাকে গ্রাস করেছে। হুজুগ, হামলা, হল্লাই আজ নাগরিক জীবনের ছন্দ হয়েছে। কলকাতার লোকের এগুলো চাই-ই। এগুলো না হলে কলকাতার লোকের পেটে ভাত হজম হয় না। খবরের কাগজের লোকরাও পায় না ইন্ধন যোগাতে, লোকের পেটের ভাত হজম করিয়ে দিতে।

'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'আমাদের দাবি মানতে হবে' ও সঙ্গে সঙ্গে গিছিল ও তার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা মাইলব্যাপী গাড়ির লাইন—এসব এখন কলকাতায় মান্ধাতার আমলের জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন কলকাতায় চাই হুজুগ ও হামলা। হুজুগের অন্ত নেই। খেলার হুজুগ, বই মেলার হুজুগ, সার্বজনীন পুজোর হুজুগ থেকে আরম্ভ করে ফুচকাওয়ালাদের ওপর হামলার হুজুগ। এসব হুজুগ নেয়েই তো কলকাতার লোক বেঁচে আছে। মোট কথা একটা না একটা হুজুগ কলকাতায় চাই-ই। একবার সাম্প্রতিক কালের হুজুগগুলো স্মরণ করুণ যা নিয়ে রাজনৈতিক নেতারা অনেক 'শ্যাডো ফাইটিং' করলেন। তাতে গঙ্গার জল অনেক ঘোলা হয়ে গেল। হুজুগ উঠল 'সরষের তেল আর পাওয়া যাচ্ছে না।' সুযোগবাদীরা রাতারাতি তেলের দাম কিলো প্রতি দশ টাকা বাড়িয়ে দিল। বিচক্ষণতার সঙ্গে সরকার বললেন না, আগে যা দাম ছিল তার চেয়ে পাঁচ টাকা বেশি দামই 'ন্যায্য' দাম হবে। কিন্তু কে কার কথা শোনে? দোকানী সেই উঁচু দামেই তেল বেচতে লাগল। তার নীতি হচ্ছে—'ফেল কড়ি, নাও তেল'।

তারপর কাগজে বেরোল ভেলপুরীতে বিষ। অনেক ভেলপুরীওয়ালাকে ধরে নিয়ে গেল। ধরপাকড়টা বেশ সমারোহের সঙ্গেই হল। তারপর সব নীরব হয়ে গেল। আদালতের খবরে দেখলাম না যে তাদের আদালতে হাজির করা হয়েছে। আর হাসপাতালের খবরেও দেখলাম না যে ভেলপুরীখানেবালারা হাসপাতালে পড়ে রয়েছে। এ যেন একজন নামজাদা জাদুকরের 'ভ্যানিশিং ট্রিক্'। অন্তরালে কি রহস্য ঘটে গেল, কেউ জানল না।

সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক জীবন আবার সরব হয়ে উঠল। 'পাকড়াও,পাকড়াও', শালা ফুচকাওয়ালাদের পাকড়াও'। পুলিশ চোর ডাকাত ধরতে পারে না। মেয়েরা হারিয়ে গেলে তাদের খুঁজে বের করতে পারে না (যদিও বড়াই করেছিল যে দেব কে একমাসের মধ্যে খুঁজে বের করবে)। কিন্তু নিমেষের মধ্যে শহরের উপান্তে ফুচকাওয়ালাদের কারখানার সন্ধান বের করে ফেলল এবং সেখানে হামলা করল। সঙ্গে সঙ্গে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'-ওয়ালারা ছুটে এল তাদের 'স্বার্থ' রক্ষার জন্য। একটা সংগঠন তৈরি হল। তারা আবার 'ক্লাস' ডাকলেন প্রশিক্ষণ দেবার জন্য কিভাবে ফুচকা তৈরি করতে হয়, তা শেখাবার জন্য। শিক্ষক ও ছাত্র দু পক্ষই গরহাজির ওই ক্লাসে। ফুচকাওয়ালারা জিজ্ঞাসা করল, যারা প্রশিক্ষণ দেবে তাদের ক'পুরুষের অভিজ্ঞতা আছে ফুচকা তৈরির। বলল, 'আমাদের বাপ ঠাকুরদার আমল থেকে আমরা ফুচকা তৈরি করে আসছি, আমরা আবার আনাড়িদের কাছ থেকে কি শিক্ষা নেব?' কিন্তু মজার কথা, সংবাদপত্রে একটাও সংবাদ বেরোল না, কেউ ফুচকা খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে বা অমুক হাসপাতালে শুয়ে আছে। বরং সংবাদপত্রে উল্টোটাই বেরোল। রাজ্যের একজন বিশিষ্ট মন্ত্রী বিবৃতি দিলেন, তিনি তো হামেশাই ফুচকা খান, তবে প্রকাশ্যে নয়, অপরের অগোচরে, তাঁর চেহারা দেখলেতো মনে হয় না যে ফুচকা তাঁর শরীরের কোন ক্ষতি করেছে। কিন্তু যাঁরা ফুচকা খাওয়া থেকে বঞ্চিত এবং সেই কারণে পস্তাচ্ছেন, তাঁরা মন্ত্রী মহাশয়কে পরিহাস করে উঠলেন। আমরাও তো ছেলেবেলা থেকে আলুকাবলির সঙ্গে ফুচকা খেয়ে এসেছি, কিন্তু তার জন্য কোনদিন তো অসুস্থ হয়ে পড়িনি।

সে যাই হোক, ফুচকাওয়ালাদের ওপর হামলার নীট ফল যা দেখলাম তা হচ্ছে, এরফলে এদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য একটা সংস্থা ও তার অনুগামী একদল 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' আওয়াজ তোলবার লোক। হয়ত বা এর মধ্যেই তাঁদের নাম ভোটার তালিকাতেও উঠে গেছে। ঠিক এরকমভাবেই রিকশাওয়ালাদের ওপর হামলা চালিয়ে রিকশাওয়ালাদের এক সংস্থা ও দল তৈরি হয়েছে।

'হল্লা' তো আজকের নূতন জিনিস নয়। বহু বছর ধরে দেখে এসেছি ফুটপাতের ওপর ফিরিওয়ালাদের ধরবার জন্য মাসের শেষদিকে একটা করে 'হল্লা' বেরোত এবং ফিরিওয়ালাদের ধরে লরি বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হতো। একবার ওদের একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'তোমার কত টাকা ফাইন হল?' উত্তরে বলেছিল। 'ফাইন আবার কিসের বাবু? মাসের শেষের দিকে ওদের টানাটানি ঘটলেই কিছু প্রাপ্তিযোগের জন্য ওরা এরকম হল্লা করে। আমরা ওদের টানাটানির সমাধান করে দিই।'

হুজুগের কথাতেই আবার ফিরে আসছি। ভাবছি ফুচকার পর এবার কার পালা? মনে পড়ে গেল আমার ছেলেবেলার একটা হুজুজের কথা। ঘটনাটা আমি আমার 'শতাব্দীর প্রতিধ্বনিতে বিবৃত করেছি। সেখান থেকেই ওটা এখানে উদ্ধৃত করছি। 'একবার গুজব রটল যে পানে একরকম বিষাক্ত পোকা ধরেছে, যার ফলে পান খেলে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। লোক আতঙ্কিত হয়ে পান খাওয়া ছেড়ে দিল। তবে যারা গুণ্ডি দোক্তা ইত্যাদি খেত এবং সেই কারণে যাদের পান না খেলে চলত না, তারা জলে কেরোসিন তেল মিশিয়ে সেই জলে পানগুলো ধুয়ে নিয়ে তারপর খেত। তাদের ধারণা ছিল বিষে বিষক্ষয় হবে। সত্যি, পানে পোকা ধরেছিল কিনা জানি না। মনে হয় পানব্যবসায়ীদের জব্দ করবার জন্য কেউ এই গুজব রটিয়েছিল।'

আজকের শেষ হুজুগ। কতকগুলো পার্কে গাছ রোপণ করে কলকাতাকে আবার (এক সময় কলকাতা সবুজই ছিল) সবুজ করা হবে। উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় বাংলা বচন—'বিবি যখন মানুষ হবে, সাহেব তখন গোরে যাবে।'

## খেলার হুজুগ

খেলার হুজুগ যে আমাদের ছেলেবেলায় ছিল না, তা নয়। তবে আজকের মত এমন উৎকট ধরনের নয়। তাছাড়া, এ হুজুগটা প্রধানত ফুঠবল খেলাকেই কেন্দ্র করে ছিল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে মোহনবাগানের আই.এফ.এ. শিল্ড লাভই ছাত্রসমাজে এই হুজুগটা সঞ্চারিত করেছিল। আমার ক্ষেত্রে অবশ্য অন্য একটা কারণও ছিল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের মোহনবাগান বিজয়ীদলের দুই খেলোয়াড় শিব ভাদুড়ি ও বিজয় ভাদুড়ি আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন। এ দু'জনের কোলে-পিঠে চেপেই আমি ছেলেবেলায় মানুষ হয়েছিলাম (আমার 'শতাব্দীর প্রতিধ্বনি' দ্রঃ) এঁরাই ফুটবল প্রীতিটা আমার মনে জাগিয়েছিল।

ক্রিকেটটা আমাদের ছেলেবেলায় খুব জনপ্রিয় খেলা ছিল না। কলকাতায় প্রথম ক্রিকেট খেলা হয়েছিল ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি তারিখে ইটোনিয়ান সিভিল

সার্ভেন্টস্ দলের সঙ্গে অন্যান্য ইংরেজদের। তারপর এক শতাব্দীর ওপর ধরে সাহেবরাই এ খেলাটা খেলতো। কলকাতা রাজধানী শহর হলেও, পশ্চিম ভারতের পার্শি সম্প্রদায়ই এই খেলাটা ভারতীয়দের মধ্যে প্রবর্তন করেছিল। ইতিমধ্যে ভারতের সন্তান প্রিন্স রঞ্জিৎ সিংজি ইংলণ্ডের কাউণ্টি ও ইংলণ্ডের জাতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে চমকপ্রদ ব্যাটিং করে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে প্রশংসিত হয়েছিলেন।

কলকাতায় ক্রিকেটটা সাহেবরাই খেলতো। এসব সাহেবদের মধ্যে ছিল কলকাতার সওদাগরী অফিসের সাহেবরা, আসামের চা-বাগানের সাহেবরা ও বিহারের নীলকর সাহেবরা। কলকাতায় ব্রিটিশ, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইংরেজ মিশনারি পরিচালিত স্কুল কলেজগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক খেলা হত। তবে ভারত টেস্ট ম্যাচে অংশগ্রহণ করবার পূর্বে এ দেশের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতামূলক খেলা ছিল কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়ে, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এ প্রতিযোগিতা চলেছিল।

বাঙালিদের মধ্যে ক্রিকেট খেলাকে জনপ্রিয় করে তোলেন কোচবিহারের মহারাজা ও নাটোরের মহারাজা। এঁরা দু'জনেই বিলাত থেকে কোচ আনিয়ে বাঙালিদের মধ্যে উচ্চ মানের ক্রিকেট খেলা সম্বন্ধে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এসবই আমার জন্মের বহু পরে ঘটে। তবে ক্রিকেটের ক্ষেত্রে যে দু'জন কৃতিমান পুরুষকে চিনতাম ও যাঁদের খেলা দেখেছি, তাঁরা হচ্ছেন বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায় (এস. রায়.নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন) ও আমাদের পাড়ায় দুখীরামবাবু (ভালো নাম উমেশচন্দ্র মজুমদার)। দু'জনেই এদেশে অনেক দক্ষ বাঙালি ক্রিকেট খেলোয়াড় তৈরি করেছেন। তবে দু'জনের প্রশিক্ষণ দেবার পদ্ধতির মধ্যে ছিল আকাশ-পাতাল তফাৎ। সারদাবাবু খেলার সৌকর্যার্থে নানারকম সাজসরঞ্জামের ওপর জোর দিতেন। তাছাড়া ক্রিকেটের সাজসরঞ্জাম বিক্রির জন্য নিজের একটা দোকানও ছিল। ছেলেদের খেলায় উদ্বুদ্ধ করবার জন্য তিনি বলতেন, 'প্রকৃত শিক্ষা মাত্র স্কুল কলেজেই হয় না, প্রকৃত শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় খেলার মাঠে।' দুখীরামবাবুর ওসব কিছু বালাই ছিল না। তাঁর বাড়ির সামনে রামধন মিত্র লেনের গলিটাতেই (তখন কলকাতার রাস্তা পিচ দিয়ে মোড়া হয়নি) উইকেট বসিয়ে তিনি ছেলেদের খেলা শেখাতেন। তিনি ছিলেন 'এরিয়ান' ক্লাবের প্রাণপুরুষ। ক্রিকেট এবং ফুটবল দুইয়েতেই ছিল তাঁর সমান দক্ষতা। বহু ভাল ভাল খেলোয়াড় তিনি নিজে হাতে তৈরি করেছিলেন। আমাদের ছেলেবেলায় যেসব বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়ের নাম শুনেছি ও খেলা দেখেছি তারা হচ্ছে কার্তিক ও গণেশ দুই ভাই, টগরে ও ফগড়ে দুই ভাই (ভাল নাম রমণী মুখুজ্যে ও মোহিনী মুখুজ্যে)। শেষের দু'জনেই আমার সহপাঠী ছিল। শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর স্কুলের ফাস্ট ক্লাসে (এখনকার ক্লাস টেন) আমার ডান পাশে বসত টগরে ফগড়ে ও বাঁ পাশে ছোনে (বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় ছোনে মুজমদার, দুখীরামবাবুর ভাইপো)। সুতরাং ছেলেবেলা থেকেই বড় বড় খেলোয়াড়দের সাহচর্য লাভ করেছিলাম। আমার পরবর্তীকালের বিখ্যাত ক্রিকেটের শুটে ব্যানার্জি ছিল আমার ছাত্র, আমি ছিলাম ওর গৃহশিক্ষক।

সেযুগে সাহেবদের বড় ক্রিকেট ক্লাব ছিল ক্যালকাটা ক্লাব। তারাই উদ্যোগী হয়ে প্রথম

ইংলণ্ডের পয়লা নম্বর ক্লাব এম, সি,সি, কে এদেশে নিয়ে এসেছিল। বিলাতী সাহেবদের সে খেলাই আমি আমার জীবনে প্রথম দেখি।

এক সময় আমার স্মৃতিশক্তিটা কিংবদন্তীর মত ছিল। কিন্তু ইদানীংকালে শোক-তাপে জর্জরিত ও পারিবারিক অশান্তিতে বিপর্যস্ত হয়ে আমার স্মৃতিশক্তিটা ঠিক আগের মত নেই। তবে আমার যতদূর মনে আছে, এম.সি.সি. এসেছিল ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে। আমি তখন এম.এ. পড়ি। আমার সহপাঠী ছিল আমাদের পাড়ার শ্যামাচরণ (শ্যামাচরণ পরে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র স্পোর্টস এডিটর হয়েছিল)। একদিন শ্যামাচরণ আমাকে বলল, শুনেছিস এম. সি. সি. এবার ভারতে আসছে। জিজ্ঞাসা করলাম, এম, সি, সি, আবার কারা? শ্যামাচরণ জানাল, এম. সি. সি. হচ্ছে বিলাতের মেরেলিবোন ক্রিকেট ক্লাবের সংক্ষিপ্ত নাম—বিলাতের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট ক্লাব। শুধু বিলাতের নয়। ক্রিকেট খেলা সম্বন্ধে এব. সি. সি. যেসব নিয়মকানুন বানিয়ে দিত, সারা বিশ্বের ক্রিকেট ক্লাবসমূহকে তা মানতে হতো। শ্যামাচরণ বলে যেতে লাগল, এম, সি, সি আসছে আর্থার গিলিগানের অধিনায়কত্বে। ক্যালকাটা ক্লাব ওদের নিয়ে আসছে। আর ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা নাকি সমস্ত ব্যয় বহন করছে। যদিও এটা এম, সি, সি,-র কলকাতায় প্রথম সফর এবং এর পিছনে কোনরকম সরকারি স্বীকৃতি ছিল না, তথাপি এটা ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ সফর। কেননা, এই শফরের পদক্ষেপেই ভারতে প্রথম ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড স্থাপিত হয় ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে। এর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী ছিলেন দু'জন, গ্রাণ্ট গোভান ও অ্যাণ্টনি ডিমেলো। এঁরাই ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্রথম সভাপতি ও সেক্রেটারি হন। এই সময় ক্রিকেটের মুখপাত্র হিসাবে দিল্লিতে 'ইণ্ডিয়ান ক্রিকেটার' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করবার আয়োজন করা হয়। আমি এই পত্রিকার কলকাতার প্রতিবেদক নিযুক্ত হই। সুতরাং কিছুকাল আমাকে কলকাতার ক্রিকেট জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকতে হয়েছিল। এম, সি, সি-র খেলা দেখার জন্য শ্যামাচরণ দু'খানা টিকিট জোগাড় করেছিল। সুতরাং শ্যামাচরণের সঙ্গে আমাকে খেলা দেখতে যেতেই হ'ল। ইডেন গার্ডেনে গ্যালারিতে বসে আমরা খেলা দেখছি। একটা ভারি মজার ব্যাপার ঘটল। আমাদের সামনেই নিচের সারিতে বসে দু'জন কোট-প্যাণ্ট পরা (সেযুগে অফিসাররা ছাড়া অফিসের আর কোনও কর্মচারী কোট প্যাণ্ট পরতো না) লোক অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। আমরা ঠিক করতে পারছিলাম না, ওরা ভারতের কোন প্রদেশের লোক। ওরা যে ভাষায় কথা বলছি সে ভাষা আমরা মোটেই বুঝতে পারছিলাম না। ভাষা বুঝতে পারলে হয়তো আমরা বুঝতে পারতাম ওরা কোন প্রদেশের লোক। হঠাৎ শ্যামাচরণ বলে উঠল ওই শোন্, ওরা কি ভাষায় কথা বলছে। আমি শুনলাম, ওরা বলছে—'রা নঃ স্পেণ্ডিনো মনি ওয়াটারু ওয়াটারু'। শ্যামাচরণ বলল, বুঝলি ওরা কোন ভাষায় কথা বলছে? আমি বললাম, না। তখন শ্যামাচরণ বলল, বুঝলি না, ওরা ইংরেজি ভাষায় কথা বলছে। ওরা মদ্রদেশীয় লোক বলে ওই রকম বিকৃত উচ্চারণ করছে। ওরা বলছে রাজা জলের মত (ওয়াটারু ওয়াটারু) অর্থ ব্যয় করছে (স্পেণ্ডিনো মনি)।

ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড স্থাপিত হবার পরই ভারতের ক্রিকেট দল পেল সরকারি মর্যাদা। তখন ভারতীয় ক্রিকেট দলসমূহ সরকারী ক্রিকেট ম্যাচে খেলবার অনুমতি পেল। ১৯৩২ থেকে ১৯৪৮-৪৯ -এর মধ্যে ভারত কুড়িটা টেস্ট ম্যাচ খেললো স্বদেশে ও বিদেশে।

আমি এই কুড়িটা টেস্ট ম্যাচের কথাই এখানে বলব। কেননা, ১৯৪৮-৪৯-এর পর আমি আর খেলার মাঠে যাইনি।

এই কুড়িটা টেস্ট ম্যাচের মধ্যে সাতটা ইংল্যাণ্ডে (১৯৩২-এ ১টা, ১৯৩৬-এ ৩টে, ও ১৯৪৬-এ ৩টে) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আটটা ভারতে (৯৩৩-৩৪-এ ৩টে, ১৯৪৮-৪৯-এ ৫টা), এবং পাঁচটা অস্ট্রেলিয়ায় (১৯৪৭-৪৮)। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যে টেস্ট ম্যাচ হয়, তাতে ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন সি, কে, নাইডু, ১৯৩৬ সালের ম্যাচগুলিতে ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা ও ১৯৪৬ সালের ম্যাচগুলিতে পতৌদির নবাব (বড়)। ভারতে যে সাতটা টেস্ট ম্যাচ হয়েছিল, ১৯৩৩-৩৪ সালে অধিনায়কত্ব করেছিলেন সি, কে, নাইডু ও ১৯৪৮-৪৯ সালে লালা অমরনাথ। ১৯৪৭-৪৮ সালে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত টেস্ট ম্যাচসমূহেও লালা অমরনাথ। সেযুগে, সি, কে, নাইডুর মত অল-রাউণ্ডার খুব কম ছিল। অধিনায়কত্বে ভারতীয় লালা অমরনাথ ছিল আদর্শ। তাছাড়া,, ১৯৩৩-৩৪ খ্রীষ্টাব্দের খেলায় ভূমিকায় ক্রিকেটারদের মধ্যে প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরি (১১৮) করেছিলেন লালা অমরনাথ। তার পর সেঞ্চুরি অবশ্য অনেকেই করেছে। তবে উল্লেখনীয় হচ্ছে ১৯৩৬ সালের ম্যাঞ্চেষ্টার টেস্টে মুস্তাক আলি ও মার্চেন্টের সেঞ্চুরি। ওই ম্যাচে ওরা দু'জনে মিলে ১৭৫ মিনিটে ২৩৫ রান করেছিলেন। আর ব্যাটিং-এ যথাক্রমে ব্যক্তিগত গড় সংখ্যা ছিল ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াজির আলির ৩৫.০০ ও জাহাঙ্গীর খানের ২৩.৫০, ১৯৩৩-৩৪ খ্রীষ্টাব্দে দিলওয়ার হুসেনের ৪৯.২৫ ও লালা অমরনাথ-এর ২৭.২৮, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সি, রামস্বামীর ৫৬-৬৬ ও মহম্মদ নিসারের ২৮.৫৯, ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজয় মার্চেন্টের ৪৯.০০ ও লালা অমরনাথের ২৫.৩৩। ১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ডি, জি, ফাদকারের ৫২.৩৩ ও লালা অমরনাথের ২৮১৫ এবং ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বিজয় হাজারের ৬৭.৪৭ ও শুঁটে ব্যানার্জির ২৫.৪০।

আগেই বলেছি যে আগেকার দিনে খেলার হুজুগ এখনকার মত ছিল না। তবে খেলার দিন এলে বাড়ির মেয়েদের নাকালে পড়তে হত। কেননা, সকলেই টিফিন কেরিয়ারে করে খেলার মাঠে লাঞ্চ-টাইম-এ খাবার জন্য পরটা, আলুর দম ও ডিমের কালিয়া নিয়ে যেত। দেখতাম খেলার চেয়ে এগুলো উদরস্ত করার প্রবণতাই ছিল বেশি। টি, ভি'র দৌলতে বাড়ির মেয়েরা বোধ হয় আজকাল এই নাকালের হাত থেকে খানিকটা রেহাই পেয়েছে। তবে একটা বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটেছে। আগেকার দিনে মেয়েরা খেলা বুঝতো না। আজ টি, ভি-তে খেলা দেখবার জন্য ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরা সমানভাবেই উদগ্রীব। মেয়েদের কাছে উত্তমকুমার যা গাভাসকারও তাই।

## ৩৩০ বিপর্যস্ত কলকাতা

সম্প্রতি কলকাতা শহর অনবরত বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়েছে প্লাবনের প্রভাবে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে জাব চার্ণক কলকাতা শহর প্রতিষ্ঠা করবার পর থেকে, কলকাতার ইতিহাসে যে দুর্দৈব ঘটনা ঘটেনি তা নয়। ঝড়, জল, ভূমিকম্প ও মহামারী দ্বারা কলকাতা বহুবারই আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু কলকাতার লোকেরা কোনদিন প্রকৃতির এ রকম মহারোষের সম্মুখীন হয়নি। বিস্মৃতির অতল গর্ভ থেকে কলকাতার দুদৈব ঘটনা সম্বন্ধে সবচেয়ে পুরানো বিবরণ যা আমার তুলে আনতে পারি, তা হচ্ছে ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দের। ওই বছরে যে ঝড়-জল হয়েছিল, তাতে ধ্বসে পড়ে গিয়েছিল নব প্রতিষ্ঠিত শহরের অনেক ঘরবাড়ী। ভাগীরথী থেকে লবণ হ্রদ পর্যন্ত পূর্বদিকে যে খালটা চলে গিয়েছিল, তাতে অনেক নৌকা বিনষ্ট হয়েছিল। তারপর থেকেই ধর্মতলার পূর্বাংশের নাম হয় ডিঙ্গাভাঙ্গা। ওই ঝড়েই গোবিন্দরাম মিত্রের কুমারটুলির নবরত্ন মন্দির (যেটা শহীদ মিনারের চেয়েও উঁচু ছিল) ভূমিসাৎ হয়েছিল। কিন্তু তাতে কলকাতা শহরে প্লাবিত হয়নি। কেননা, তখনও কলকাতার ছিল গ্রাম্যরূপ। ঘরবাড়ীর সংখ্যা ছিল খুবই কম। চারদিকেই ছিল বন-জঙ্গল, মাঠ, নদী-নালা, পুষ্করিণী ইত্যাদি। অত্যধিক বৃষ্টি হয়ে জল বেরিয়ে গিয়ে পড়ত হয় ভাগীরথীতে, আর তা নয় তো লবণ হ্রদে। তবে লবণ হ্রদের জল যখন উপচে যেত তখন শিয়ালদহ-বৈঠকখানা প্রভৃতি অঞ্চল প্লাবিত হত।

১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দের পর আমরা যে অতিবর্ষণের খবর পাই, তা হচ্ছে সোমবার একুশে জুন ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের। দিনটা হচ্ছে সিরাজ কর্তৃক কলকাতা অবরোধের পরদিন। ওই অবরোধের সময় যে-সকল লোক নিহত হয়েছিল, তাদের ফেলে দেওয়া হয়েছিল শহরের নর্দমা ও একটা গাড্ডার মধ্যে। পরদিন অতিবর্ষণের ফলে ওই সকল মৃতদেহ পচে গিয়ে শহরে এক মহামারীর সৃষ্টি করেছিল। শহরে আবার মহামারী ঘটেছিল ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে। এই মহামারীতে শহরের দেশীয় বাসিন্দাদের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার লোক প্রায় হারিয়েছিল।

এরই আট বছর পরে আসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। এই দুর্ভিক্ষের সঙ্গে দেখা দেয় মহামারী। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ফলে কলকাতা শহরে ছিয়াত্তর হাজার লোক মারা যায়। সেকলে এর যে বর্ণনা দিয়েছেন সেটা খুবই ভয়াবহ—'কলকাতার রাজপথ ও অলি-গলি সমূহ মৃতদেহে পরিপূর্ণ। কোথাও বা মৃতদেহ সৎকারের অভাবে পড়ে আছে—তা শকুনি-গৃধিনীর উদরস্থ হচ্ছে, কোথাও বা মুমূর্ষু ব্যক্তি পথের ধারে পড়ে আর্তনাদ করছে। যারা পারছে তারা গঙ্গার ধারে বালুকার উপর মৃতদেহ ফেলে রেখে যাচ্ছে। সৎকারের লোক নেই—সৎকার করে কে? এই মড়কের সময় জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে পনের শত সাহেবও মারা যায়।'

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় প্রথম ইংরেজি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সংবাদপত্রেরও আবির্ভাব হয়। কিন্তু সেকালের সংবাদপত্রে আমরা বড় রকমের কোন ঝড়-বৃষ্টির সংবাদ পাই না। বড় রকমের ঝড়-বৃষ্টির সংবাদ পাই ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের পাঁচ অক্টোবর তারিখে। কলকাতা আক্রান্ত হয়েছিল এক অতিভীষণ ঝড় ও বর্ষণ দ্বারা।

এই ঝড়ে কলকাতা বন্দরের অনেক জাহাজ বিনষ্ট হয়েছিল, শহরের বহু ঘরবাড়ী পড়ে গিয়েছিল এবং মদনমোহনতলার সামনে অবস্থিত ডাকাতে কালীর জোড়বাংলা মন্দিরটা ভূমিসাৎ হয়েছিল। ঝড়ের বেগ এত প্রবল ছিল যে শ্যামবাজারের খাল থেকে নৌকাগুলো উড়তে উড়তে উল্টাডাঙ্গায় গিয়ে পড়েছিল। এই ঝড়ে কলকাতা শহরের এরূপ ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল যে সেই ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ সম্বন্ধে কয়েকখানা রিপোর্ট ও বই প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও ঝড়ের সঙ্গে অতিবর্ষণ হয়েছিল, তা সত্ত্বেও কলকাতা শহর প্লাবিত হয় নি।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা কেঁপে উঠল এক ভূমিকম্পে। কিন্তু তাতে কলকাতার বাহিরের যত ক্ষতি হয়েছিল, শহরের তত হয়নি।

পরবর্তী নৈসর্গিক দুর্ঘটনা ঘটল ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৫ মে তারিখে। এক ভীষণ ঘূর্ণিবার্তার প্রভাবে ভাগীরথীতে জলোচ্ছ্বাস হল স্ট্রাণ্ড রোডের ওপর বহু ডিঙ্গি বিক্ষিপ্ত হল; 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় লিখিত হল যে আর সামান্য জল বাড়লেই হেয়ার স্ট্রীটে নৌকা চলাচল করবে। এই ঘূর্ণিবার্তার সময় ঘটেছিল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। পুরীতে রথযাত্রা দেখবার জন্য (তখন রেলপথ হয়নি; পুরীর সঙ্গে প্রথম রেল সংযোগ হয় ১৮৯৯-তে) 'স্যার জন লরেন্স' নামক ম্যাকলীন কোম্পানির এক জাহাজে কলকাতা শহরের বিশিষ্ট অভিজাত পরিবারের ৮০০ মহিলা ও মধ্যবিত্ত ঘরের ২০০ মেয়ে ও পুরুষ যাত্রী বালেশ্বরে যাচ্ছিল। জাহাজখানা ডুবে যাওয়ায় সকলেরই সলিল সমাধি হয়। একজনও বাঁচেনি। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় অভিভূত হয়ে কলকাতার কয়েকজন কোমলহৃদয়া ইংরেজ রমণী স্থাপিত করেছিলেন এক প্রস্তর-ফলক বড়বাজারের ছোটুলাল দুর্গাপ্রসাদ ঘাটের দেওয়ালে। তাতে লেখা আছে —'ইং ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৫-এ মে তারিখের ঝটিকাতে 'স্যার জন লরেন্স' বাষ্পীয় জাহাজের সহিত যে সকল তীর্থযাত্রী অধিকাংশই স্ত্রীলোক, জলমগ্ন হইয়াছেন, তাঁহাদিগের স্মরণার্থে কয়েকজন ইংরেজ রমণী কর্তৃক এই প্রস্তর ফলকখানি উৎসর্গীকৃত হল'। এই ঘটনাকেই উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তাঁর 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতা।

তারপর কলকাতা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ১২ জুন ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের ভূমি কম্পে। তাতে কলকাতার বহু ঘরবাড়ি পড়ে যায়। ভূমিকম্পের সময় যাঁরা ঘোড়ায়-টানা ট্রামে করে যাতায়াত করেছিলেন, তাঁরা আহত হন আশপাশের বাড়ি থেকে ছিটকে আসা ভগ্নাংশের দ্বারা।

এরই পদানুসরণে এসেছিল কলকাতায় ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্লেগের মহামারী। আক্রান্ত ব্যক্তিতে হাসপাতালসমূহ পূর্ণ হয়ে গেল। হাসপাতালে স্থানাভাবের জন্য সরকার কলকাতার বড় বড় বাড়ির ছাদের উপর আক্রান্ত রোগীদের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন করলেন। এদিকে সাহেব ডাক্তাররা এসে মেয়েদের ঊরু ও কটির সন্ধিস্থল পরীক্ষা করবে শুনে আতঙ্কিত হয়ে লোক শহর ত্যাগ করতে লাগল। রাতারাতি ছ্যাকড়া গাড়ির ভাড়া পঞ্চাশ গুণ হয়ে গেল। (কলকাতায় শেষ প্লেগের মহামারী ঘটেছিল ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে)
।

কলকাতায় সবচেয়ে বড় রকমের অতিবর্ষণ ঘটেছিল ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। সাতদিন

অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টিপাত হয়েছিল। বাঙলার নদীনালা সব ভেসে গিয়েছিল। কিন্তু কলকাতা শহরে বন্যার জল জমে থাকেনি। এ সময়ের এক ঘটনার কথা উল্লেখ না করে থাকতে পারছি না। বর্ষণের পর যেদিন প্রথম রেল চলাচল শুরু হল, সেদিন একটি ছোট ছেলে রেল লাইনের ধার দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল যে, রেল লাইনের খানিকটা অংশ বন্যার জলে ভেসে বেরিয়ে গেছে। দূরে রেলের বাঁশী বাজছে। ছেলেটির গায়ে ছিল একখানা লাল রঙের চাদর। সে রেল লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে লাল চাদরখানা নাড়তে লাগল। লাল চাদর দেখে ট্রেনখানা দাঁড়িয়ে গেল। সেদিন ওই ছোট ছেলেটির প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য হাজার হাজার যাত্রীর প্রাণরক্ষা হল।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় আবার কয়েক দিন অতিবর্ষণ হল। কিন্তু তাতে কলকাতা শহরে জল জমেনি। তবে গ্রামগঞ্জ বন্যার জলে ভেসে গিয়েছিল। সেই বন্যায় তারকেশ্বর মন্দিরের আধখানা জলের তলায় চলে গিয়েছিল।

ওরই অনুগামী হয়ে ১৯১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দে এসেছিল ইনফ্ল্যুয়েনজা মহামারী। ঘরে ঘরে মৃত্যু। কান্নার রোলে শহর নিনাদিত হয়ে উঠল। শবদাহের জন্য কাশী মিত্তির ও নিমতলাঘাটে আধ মাইলব্যাপী মড়ার খাটের লাইন পড়ে গেল।

আবার ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষাকালে একদিন রাত্রে কলকাতায় হল অতিবর্ষণ। কলকাতার পুরানো বাড়িগুলোর নীচের তলা জলে ভরে গেল। আমরা যে বাড়িতে বাস করতাম সেটা তৈরী হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে। রাত্রে ঘুমের ঘোরে আমরা কিছুই টের পাইনি। সকালে উঠে দেখি, ঘরে খাটের তলায় এক হাঁটু জল। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি, ভিতর বাড়ির দালানে যে সব তক্তাপোষ ছিল, সেগুলো ভাসতে ভাসতে বারবাড়িতে চলে গিয়েছে। রাস্তায় কিন্তু জল জমেনি, যা জমেছিল তা নিষ্কাশিত হয়ে গিয়েছিল রাস্তার পয়ঃপ্রণালী দিয়ে।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের পর আর ইতিহাসের বিষয়বস্তু নয়। এটা পাঠকদের অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু। সেজন্য বিপর্যস্ত কলকাতার ইতিহাসের ছেদ এখানেই টেনে দিতে চাই। তবে এইটুকু বলতে চাই যে, গত পঞ্চাশ বছর কলকাতায় আকচার অতিবর্ষণ ঘটেছে। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের পর সবচেয়ে বড় অতিবর্ষণ ঘটেছিল ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। তারপর ১৯৫৬, ১৯৫৯, ১৯৭০ ও ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু অতিবর্ষণ ঘটলেও বিশেষ বিশেষ জায়গা (যেমন ঠনঠনিয়া কালিবাড়ির সামনে, লায়নস রেঞ্জ ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে ও সেনট্রাল অ্যাভেন্যুতে দমকলের আড্ডার সামনে) ছাড়া কলকাতা জলবন্দী হত না। কলকাতা জলবন্দী হতে আরম্ভ হয়েছে মাত্র দশ-পনের বৎসর। পৌরসংস্থার অ্যাডমিনিসট্রেটর বলেন যে, ইদানীংকালে কলকাতা বছরে দশ বারো-বার জলমগ্ন হয়। কেন? এর উত্তর কলকাতার পয়ঃপ্রণালীর অপ্রতুলতা। কলকাতা যেভাবে বেড়ে গেছে (আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকে) সে অনুপাতে তার পয়ঃপ্রণালী বাড়েনি। খাস কলকাতার ২৯.৪ বর্গমাইল আয়তনের মধ্যে মাত্র ২১.০৮ বর্গমাইলে পয়ঃপ্রণালী আছে। কলকাতার পয়ঃপ্রণালীর নলগুলির ব্যাস ৬ ইঞ্চি থেকে ১৮ ইঞ্চি। কিন্তু নলগুলির একচতুর্থাংশ ময়লাচ্ছন্ন হয়ে বুজে গেছে। এছাড়া কলকাতার মোট আয়তনের ৪৫ শতাংশে কোন পাকা নর্দমা নেই। এ-সব অঞ্চলের (যথা বাঙ্গুর কলোনী, লেক টাউন,

সিঁথি প্রভৃতি) জল বাগজালার খালে গিয়ে পড়ে। খালটা অতিবর্ষণের সময় উপচে গেলে শহরের জলনিকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

সম্প্রতি কলকাতা বিপর্যস্ত হয়েছে আন্ত্রিক ও ভেজাল তেলজনিত ব্যাধির প্রকোপে।

কিন্তু কলকাতাকে সবচেয়ে বিপদে ফেলেছে ডি. ভি. সি-র বাঁধসমূহ। এই বাঁধগুলি থেকে জল ছেড়ে দিলে দামোদরে বন্যা হয়। ষাট বছর পূর্বে 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় (১৯২৭, পৃষ্ঠা ৫৯৩) 'দামোদরের বন্যায় কলকাতার বিপদ' সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। কিন্তু সে প্রবন্ধের সতর্কবাণীতে কেউই কান দেননি। রাজনীতি ও তার পিছনে টাকা পয়সার লেনদেনকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। হরপ্পা, মহেঞ্জোদরো থেকে আরম্ভ করে প্রাচীন ভারতের অনেকগুলি শহরই বিলুপ্ত হয়ে গেছে বন্যা কবলিত হয়ে। জানিনা, কলকাতার কপালে কি লিখন আছে।

তবে ঝড়, ঝাপট, বন্যা মহামারী ইত্যাদি ছাড়াও, কলকাতা আজ নানাভাবে বিপর্যস্ত। পথচারীদের ফুটপাথ দিয়ে হাটবার উপায় নেই, কেননা, কলকাতার অনেক রাস্তারই ফুটপাত আজ বাজারে পরিণত হয়েছে। কলকাতার অধিকাংশ টেলিফোনই আজ অচল। বাড়ীতে কোনরূপ বিপদ ঘটুক, বা আগুন লাগুক, আজ উপায় নেই থানায় টেলিফোন করে পুলিশের সাহায্যে প্রার্থনা করা, বা অ্যাম্বুলেনস্ ও দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া। যেখানে টেলিফোন অচল সেখানে জরুরী প্রয়োজনে ডাক্তার ডাকবারও উপায় নেই। টেলিফোনের পর ইলেকট্রিসিটির কথা ধরুন। কথায় কথায় লোডশেডিং। প্রান্তিক অঞ্চল সমূহে ইলেকট্রিসিটির সঙ্গে কলের জলের ঘনিষ্ঠ আঁতাত। লোডশেডিং হলে পানীয় জল থেকে আরম্ভ করে রান্না, স্নান, পায়খানায় যাওয়া সবই বন্ধ। ছেলেদের লেখাপড়ার তো বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে ঘনঘন লোডশেডিং। লোডশেডিং যে মাত্র মানুষকে তিতিবিরক্ত করে তুলেছে তা নয়। সম্প্রতি কনভেন্ট রোডের পাস্তুর ইনষ্টিটিউটের এক সমীক্ষা থেকে জানতে পারা যায় যে লোডশেডিং জন্তু জানোয়ারকেও বিব্রত করে তুলেছে। লোডশেডিং-এর ফলে শহরে কুকুরে কামড়ানোর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।

যানবাহনের অবস্থা আরও শোচনীয়। মাঝপথে বাসে ট্রামে ওঠা একেবারে অসম্ভব। নিজের গাড়ী থাকলেও নিস্তার নেই। জ্যামে আটকে পড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তেল পোড়াতে হয়। পেট্রল যে একটা দুষ্প্রাপ্য জাতীয় সম্পদ এবং এটা এভাবে নষ্ট হলে জাতির ক্ষতিই হয় এ বোধ কর্তৃপক্ষ মহলের কারোরই মাথায় ঢোকে না।

রাস্তায় সব সময়ই চলেছে মিছিল, নানা রকম শ্লোগান দিতে দিতে। মিছিলের ফলাফল নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি না। আমাদের বক্তব্য মিছিলে আটকে পড়ে জীবনমরণের মুখোমুখী যে সব রোগী বা যারা প্রসব বেদনায় ছটফট করছে, তাদের যথা সময়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না। লোক যথাসময়ে কোর্ট-কাছারী, স্কুল-কলেজ, কর্মস্থল ও পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার হলে যেতে পারছে না।

ট্যাকসীর ভাড়া যত বাড়ছে, ট্যাকসী তত দুষ্প্রাপ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাছাড়া ট্যাকসীওয়ালাদের আছে জুলুম ও মরজি। উত্তরে যেতে চাইলে বলে দক্ষিণে যাব, আর দক্ষিণে যেতে চাইলে বলে উত্তরে যাব। আরোহীর বিনা অনুমতিতে সামনে প্যাসেঞ্জার তোলে। ভারতের আর কোন শহরে এ রকম অনাচার নেই।

হাসপাতালগুলোয় আর সুচিকিৎসা হচ্ছে না। গ্লুকোজের বদলে কেরোসিন দেওয়া হচ্ছে, রোগীর জন্য বরাদ্দ ওষুধের হাত পা গজাচ্ছে এবং সেগুলো বাইরের ডাক্তারখানায় চলে যাচ্ছে। হাসপাতালের যন্ত্রসরঞ্জামও বাইরে পাচার হচ্ছে। সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গের পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী মশায় সরেজমিনে গিয়ে হাসপাতালসমূহের যেসব অনাচার ও দুর্নীতি উদঘাটন করেছিলেন তা যে কোন স্বাধীন ও সভ্য দেশের পক্ষে ল ার বিষয়। এ ছাড়া বিনা নোটিশে অনবরতই হাসপাতালের কাজ বন্ধ হয়ে যাছে।

তারপর আইনশৃ লা সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। লোকে পুলিশের কাছ থেকে ন্যায়সঙ্গত আচরণ পাচ্ছে না। মনে হয় পুলিশের একমাত্র কর্তব্যকর্ম হচ্ছে রাস্তার মোড়ে মোড়ে লরিওয়ালাদের কাছ থেকে পয়সা আদায় করা। যখন লরির ঝাঁক আসে, তখন সব লরিওয়ালাদের কাছ থেকে পয়সা আদায় না হওয়া পর্যন্ত পুলিশের সিগনাল বন্ধ হয়ে থাকে। এটাও জ্যামের একটা কারণ। তা ছাড়া, খুন-জখম, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রাহাজানি ও চুরি-ডাকাতি ক্রমশই বেড়ে চলেছে। এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদন থেকে জানতে পারা যায় যে ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে ডাকাতি ও রাহাজানির সংখ্যা ছিল ৭৭। ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২২০১, ১৯৭৮-তে ২৩৬৮, ১৯৭৯-তে ২৪২৫, ১৯৮০-তে ২৫০৭ ও ১৯৮১-তে ২৫৮৯। এ যেন মনে হয় যে একটা বছর আর একটা বছরের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। আগে ডাকাতদের লক্ষ্যস্থল ছিল ট্রেন, জুয়েলারীর দোকান, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। এখন সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীতেও ডাকাতির সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে।

কলকাতার রাস্তাঘাটের অবস্থাও খুব খারাপ। সাধারণ লোক তো নিজ চোখেই দেখতে পায় রাস্তাঘাট কিভাবে মেরামত হয়। কেবল কর্তৃপক্ষেরই এটা দেখবার মত চোখ নেই ঠিকাদারের বিল পাশ করবার সময়। তারপর সি.এম.ডি.এ. তো রাস্তাঘাটগুলোকে ভেঙে চুরমার করে ফেলছে। পাশের বাড়ীগুলোও দুর্বল হয়ে পড়ছে। শুধু সি.এম.ডি.এ. কেন? কলকাতার টেলিফোন, ইলেকট্রিসিটি, জলকল প্রভৃতির জন্য অনবরতই রাস্তা খোঁড়া হচ্ছে, এবং যেন তেন প্রকারেন সেগুলো ঢাকা দেওয়া হচ্ছে। পূর্বাবস্থায় আর ফিরিয়ে আনা হচ্ছে না। এখন কলকাতার রাস্তায় পর্বতপ্রমাণ জঞ্জাল জমে। নিয়মিত রাস্তা ঝাঁট দেওয়া হয় না। রাস্তায় জল দেওয়ার পাট তো উঠেই গেছে। তা ছাড়া, সামান্য বৃষ্টি হলেই রাস্তা জলে ডুবে যায়।

কলকাতার বন্দরের অবস্থাও খুব খারাপ। বড় জাহাজ আর কলকাতায় আসতে পরে না। ফলে, বড় বন্দর শহর হিসাবে কলকাতা আজ তার অতীত গৌরব হারাচ্ছে।

এক কথায়, কলকাতা আজ নানাভাবে বিপর্যস্ত।

## ৩৩০ কলকাতার কি বিকল্প আছে?

প্রায় দেড়শ বছর আগের কথা। ঈশ্বর গুপ্ত কলকাতার মশামাছির উপদ্রবে বিব্রত হয়ে ব্যঙ্গ করে প্রশ্ন করেছিলেন—কি সুখে আছি কলকাতায়? আজও অনুরূপ প্রশ্ন জাগে শহরবাসীর মনে। মশামাছির উৎপীড়ন, এখনও আছে। সেজন্য মনে হয় কি সুখে আছি কলকাতায়?

কলকাতার মানুষ যে সুখে আছে, তার কারণ অনেক। কলকাতা এক বিরাট কর্মশালা। হাজার হাজার লোকের এটা কর্ম নিযুক্তির কেন্দ্র, রুজি-রোজগারের স্থান। তাছাড়া, কলকাতা আছে নানারূপ আকর্ষণ, যথা রাজভবন, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, জাতীয় গ্রন্থাগার, বিড়লা প্ল্যানেটরিয়াম, থিয়েটার, সিনেমা ও সাস্কৃতিক সংস্থাসমূহ। সর্বোপরি কলকাতায় আছে শহীদ মিনার, যার তলায় কলকাতার জেহাদী লোকরা সমবেত হয় মিটিং করবার জন্য। এসব ছাড়াও, কলকাতায় আছে প্রশস্ত রাজপথ, যেগুলো যখন-তখন ব্যবহৃত হয় মিছিলের জলুসের জন্য।

এক সময় কলকাতার ছিল এক অনন্যসাধারণ আভিজাত্য। কলকাতা ছিল সারা ভারতের রাজধানী। সেই মর্যাদার গুণে কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভের জন্য ছুটে আসত সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও ভারতের নানা প্রদেশের বিদ্যায়তনসমূহ। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানী হিসাবে তার মর্যাদা হারালেও, বর্তমান মহানগরী গড়ে উঠেছে তার পরে। আজ কলকাতায় আছে বিশতলা-পঁচিশতলা বাড়ি। আবার কলকাতারমাটির তলায় আছে দুর্গপল্লী, পাতাল রেল ও আরও কত কি!

কিন্তু এসবকে ম্লান করে দেয়, কলকাতা যখন অতিবর্ষণ হেতু প্লাবিত হয় বন্যার জলে।

কলকাতার বন্যার কারণ, কলকাতা গড়ে উঠেছে কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা ব্যতিরেকে। যখন যা কিছু উদ্ভট 'আইডিয়া' কর্তৃপক্ষের মাথায় আশ্রয় নিয়েছে, তখনই তাঁরা তা রূপায়িত করবার চেষ্টা করেছেন। তার পরিণতি কি, তা একবারও চিন্তা করেননি। এই ধরুন না, লবণ হ্রদ বুজিয়ে লেক টাউন, সল্ট লেক ইত্যাদি উপনগরী তৈরি করা। এর ফলে সমগ্র পূর্ব কলকাতা বৃষ্টিতে জলবন্দী হয়ে পড়ে। তাছাড়া, কলকাতার প্রসার ঘটেছে বিপদসঙ্কুল পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে। হওয়া উচিত ছিল উত্তরদিকে, যাতে বন্যার জল সহজে ভাগীরথীতে গিয়ে পড়তে পারত।

আগে শহর কলকাতার মধ্যে মাত্রা দু-চার জায়গা ছিল, যেখানে অতিবর্ষণ হলে বৃষ্টির জল জমত। সে জায়গাগুলোর মধ্যে ছিল ঠনঠনিয়া, লায়নস রেঞ্জ, সেন্ট্রাল অ্যাভেন্যুতে দমকলের আড্ডার সামনে। আজ সাবেককালের সাহেবপাড়া ক্যামাক ষ্ট্রীটের মতো রাস্তাও বন্যায় নদী বয়ে যায়।

যা পরিস্থিতি ঘটে তাতে সমগ্র কলকাতাই হয় জলবন্দী। জলনিকাশের যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তার ফলাফল অত্যন্ত নিদারুণ। চৌবাগার খালে পাম্প করে ফেলা

কলকাতা শহরের জল নতুন করে ভাসায় তিলজলা ও তপসিয়া এলাকার ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট। কলকাতার জল ভাগীরথীতে ফেললে এ শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে না।

এটা সাধারণ বুদ্ধির ব্যাপার যে কলকাতার আজ যে হাল হয়েছে, তার একমাত্র কারণ, কলকাতায় যথোপযুক্ত পয়ঃপ্রণালীর অভাব। আজকের এ পরিস্থিতি যদি আরও দশ-পনেরো বৎসর স্থায়ী হয়, তাহলে কলকাতা ভিনিস নগরীতে পরিণত হবে। তখন কলকাতার রাস্তায় মোটরগাড়ি বা অন্য যানবাহন আর চলবে না। চলবে মাত্র নৌকা।

কলকাতার যে মূল ও প্রধান পয়ঃপ্রণালী, তা তৈরি হয়েছিল ১৮৬৫-৭১ খ্রীষ্টাব্দ সময়কালে, তৎকালীন কলকাতার ঘরবাড়ি ও জন সংখ্যার পরিপেক্ষিতে। কলকাতায় তখন পাকাবাড়ি ছিল ১৬,০২২, আর জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৩,৫৪,৮৭৪। কালপ্রবাহে তা উর্ধ্বগতি লাভ করে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ৫,৫৬,৪৭৮ বাড়িতে, আর জনসংখ্যা ৩১,৪৮,৭৪৬। তার পরের পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। কিন্তু তা যে অনেক বেড়ে গেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মূল পয়ঃপ্রণালীর পাশে সি, এম, ডি-এ সহচরী পয়ঃপ্রণালীর জন্য নল বসিয়েছে। কিন্তু তা যে কিছুই নয়, তা আজকের বন্যাবিধ্বস্ত কলকাতা প্রমাণ করছে।

কলকাতার গঙ্গায় চড়া পড়ছে। লবণ হ্রদ বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে, কলকাতার আশপাশের খালগুলো মজে গিয়েছে, কলকাতার জলনিকাশের সব পথই আজ রূদ্ধ। কলকাতার আজ যে অবস্থা হয়েছে, মনে হয় কর্তাব্যক্তিরা তিন পুরুষ ধরে চিন্তা করলেও তার কোন সমাধান করতে পারবেন না। এটা একমাত্র তাঁদের দূরদর্শিতার অভাবের জন্যই ঘটেছে।

জন্মসূত্রে কলকাতা গড়ে উঠেছিল বন্দর শহর হিসাবে। আজ কলকাতা তার সে মান আর রাখতে পারেনি। বন্দর শহরের প্রধান প্রয়োজন নদীর নাব্যতা রক্ষা করা। ভাগীরথীর নাব্যতা আমরা ক্রমশই খর্ব করেছি। ইংরেজ আমলে ভাগীরথীতে নিয়মিত পলি উত্তোলন করা হত। আজ আর যথাযথভাবে তা করা হয় না। যার ফলে বাগবাজারের সামনে গঙ্গায় চড়া পড়তে শুরু করেছে।

আমরা কলকাতার নাব্যতা পুনরুদ্ধারের পরিবর্তে বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠেছি হলদিয়ায় বিকল্প বন্দর তৈরির কাজে। কিন্তু হলদিয়া কোনদিনই বন্দর হিসাবে কলকাতা বন্দরের প্রাচীন গৌরব দাবি করতে সক্ষম হবে না।

কলকাতার বিকল্প নেই। বন্দর শহর ছাড়া, বৃহত্তর কলকাতা শিল্পনগরীও বটে। সেজন্য জ্বালানী হিসাবে কয়লার সান্নিধ্যের জন্য আসানসোল অঞ্চলে আমরা বিকল্প কলকাতা নির্মাণের কথাও চিন্তা করেছিলাম। তারই পদক্ষেপে দুর্গাপুর ইস্পাতনগরী গড়ে উঠেছে। কিন্তু সেও কলকাতার বিকল্প হিসাবে কোন বন্দর শহর ও শিল্পনগরী ছাড়া, কলকাতা জনবহুল শহরও বটে। সেজন্য কলকাতার জনবাহুল্য হ্রাস করবার জন্য আমরা কলকাতার আশেপাশে বা সন্নিকটে সহচরী-নগর নির্মাণকার্যও শুরু করেছিলাম। কিন্তু কল্যাণীর বিফলতা ও ব্যর্থতা কর্তৃপক্ষকে নিবৃত্ত করেছে, বেশিদূর অগ্রসর হওয়া থেকে। সল্ট লেক সিটিও আমরা তৈরি করেছি, কিন্তু পূর্ব কলকাতার হাল দেখে মনে হয় যে আগামী দশ-পনেরো বছরের মধ্যে এটাও বন্যা কবলিত হবে।

কলকাতা হচ্ছে কলকাতাই। এর বিকল্প নেই। সেজন্য কলকাতাকেই বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কি করে কলকাতাকে সাময়িক বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা যেতে পারে; সেটাই সরকারের চিন্তা ভাবনা করা উচিত।

একটা প্রস্তাব দেওয়া যেতে পারে। সেটা হচ্ছে কলকাতার প্রতি অঞ্চলে একটা করে পাম্পিং স্টেশন স্থাপন করে ও সঙ্গে সঙ্গে ভাগীরথী ও চিৎপুর-বেলিয়াঘাটা খাল ও বিদ্যাধরী ও কেষ্টপুরের খালের সংস্কার করে কলকাতার জলনিকাশের কোন ব্যবস্থা করা যেতে পারে কিনা, সে বিষয়ে চিন্তা করতে হবে।

---

## স্বীকৃতি

প্রবন্ধগুলি পূর্বে 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'আজকাল', 'বর্তমান সাপ্তাহিকী', 'পূর ', 'কলকাতা', 'নবকল্লোল' ও 'জনমন জনমত' পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হয়েছিল। কয়েকটি অপ্রকাশিত নূতন লেখা।